নদী কথা কয়।

অনেক পুরানো কথা।

সেসব কথা উঁচু দুই পাড়ের গায়ে লেপ্‌টে লেগে থাকে। বিরিনা-পাতায় অনেকদিন পর্যন্ত সেঁটে থাকে। দমকা হাওয়া এসে পুরানো কথাগুলোকে বিরিনা-পাতা থেকে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যায়।

তবু কথার শেষ নেই।

ধনশিরি পাহাড়ের কথা জানে, উপত্যকার কথা জানে, ভরপুর গাঁয়ের কথা জানে। উচ্ছন্ন ভিটের কথা, বর্ষার কথা, খরার কথাও জানে ধনশিরি।

নদীর বুকে অনন্তকালের কথা! দুঃখের, আনন্দের, হাসি-কান্নার, জন্ম-মৃত্যুর।

অনেক সোহাগের কথাও জানে ধনশিরি।

কথারা পুরানো হয়, ধনশিরি নতুন হয়। বর্ষার ঢল খরার বেদনা ধুয়ে নিয়ে যায়। কাহিনীরা তক্‌তকে তাজা হয়ে ওঠে।

ধনশিরির পাড়ে নতুন কাহিনীর কুঁড়ি উন্মেষিত হয়।

ধনশিরি পাড়ের নিঃস্ব জরাজীর্ণ গ্রাম ডালিম। ডালিম গ্রামের যুবক-যুবতীদের গায়ে ডালিমদানার রক্তাভা প্রথমে কে দেখেছিল, ধনশিরি জানে।

আর কেউ জানে না।

কয়েক শো বছরের পুরানো গ্রাম। আদ্দিকালের বুড়ো বটগাছ ক'টা তার সাক্ষী, নদীর পাড়ের থম্‌থমে শ্মশান তার সাক্ষী। গ্রামের বুড়োবুড়ীর মুখে সেকালের রূপকথার শেষ নেই। নদীর ঘাটে হাজার যুবক-যুবতীর মিলিয়ে-যাওয়া পায়ের ছাপের স্মৃতি। অনেক হাজার, অনেক লাখ।

হাঁটার বয়স হলেই শিশু দাঁড়ায়, মাটির সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক তার আলগা হয়ে আসে। মাটি কিন্তু কোনোদিনই তার পা দুটোকে ছেড়ে দেয় না। আজন্ম হাঁটি-হাঁটি পা-পা মাটিতেই। এড়ানো যায় না তাকে। মাটি আর পায়ের পাতা— বন্ধু।

ধনশিরি নেমে এসেছে নাগাপাহাড় থেকে ; কোন্ এক নাগিনী যুবতীর নৃত্যচপল কাঁকালের ছন্দ তার দেহে। ঠোঁটে নাগিনীর হাসি— মিষ্টি, উচ্ছল, নিষ্ঠুর।

ধনশিরি হাসে।

বয়ে চলেছে ব্রহ্মপুত্রে। তারই বাহুবন্ধনে কিসের যেন সোনার কাঠির সন্ধানে। একটু অপেক্ষা করার ফুরসৎ নেই।

একটু কথা বলে যাও—উহুঁ।

একটা কথা শুনে যাও—উহুঁ।

—থামে না।

নর্তকী ধনশিরির কাঁকালে ভাবে-পাওয়া দেওধনি নাচের ছন্দ।

ধনশিরি বয়ে চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে— নাগাপাহাড় থেকে ব্রহ্মপুত্রে। অনেক দিন থেকেই ডালিম গ্রামকে চেনে।

পুবে ধনশিরি, পশ্চিমে ডালিম। ধনশিরির পশ্চিমপাড়ে ডালিম গ্রাম। তিনকুড়ি দশ ঘর মানুষের ছোট্ট প্রাচীন গ্রাম। হিন্দু-মুসলমান, নেপাল-মিকিরের মিশ্রিত গ্রাম। নদীর পাড় ঘেঁষে আঠারো ঘর নেপালী। ওদের গোরু-মোষের বাথান, গোয়ালঘর আর নিজেদের থাকার ঘব। সর্ষে বোনে, ভুট্টা বোনে, লাউ আর লংকার চাষ করে। দুধ বেচে।

ওদের গা ঘেঁষে ছত্রিশ ঘর মুসলমান। দুভাগে দুটো পাড়া— নতুন-ডালিম আর পুরানো-ডালিম। অবশ্য ডালিম গ্রাম একটাই।

ওরা ধান চাষ করে, সর্ষে-মাসকলাই, পাট-ও করে, নদীর ওপারে পামে চাষ করে। বিয়ে করে, ঘটা করে ভোজ খায়, ঝগড়া-ঝাঁটিও করে। চুপচাপ থাকে।

ওপারে বেশির ভাগ হিন্দুদের বাড়ি— কাছারী আর সুত গেরস্ত, একঘর বামুনও আছে। আটঘর মিকির।

ঈশ্বর, আল্লা, পাথর আর গাছ— সকলেই পুজো পায়। দুটো মসজিদ, একটা নামঘর।

গোধূলিবেলায় গ্রামে ঈশ্বর নেমে আসে। হিন্দুর উঠানে কেউ একজন টানা সুরে বরগীতের কলি গায়: পায়ে পড়ি হরি, করোহো কাতরি···

শুক্রবারে মসজিদে আল্লা আসে।

কেউ বা আজান দেয়— আল্লা হো আকবর।

ধনশিরিতে ঢল এলে, বুনো হাতি বেরলে, কারো ঘরে আগুন লাগলে, কলেরা-বসন্ত দেখা দিলে আল্লা-ঈশ্বর একসাথে গ্রামে

আসে। তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বলে, মসজিদে মোমবাতি জ্বলে, বটতলার সিঁদুরে মাথা রেখে বনফুল ঘুমে ঢলে পড়ে।

অন্যসময় আল্লা-ঈশ্বর সকলেরই ছুটি।

পাতলা বসতি।

প্রচুর অনাবাদী জমি প'ড়ে আছে। গ্রামের পশ্চিমে ও দক্ষিণে ঘন জঙ্গল— নামবর অরণ্যের ডালপালা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ, সাপ, বাঘ, হাতি, গণ্ডারের দাপাদাপি, ঠেলাঠেলি। মাঝে মাঝে বাঘ এসে গোয়ালের গোরু নিয়ে যায়, গোচারণ মাঠ থেকে মোষ নিয়ে যায়। হাতি এসে ধানক্ষেত তছনছ করে দেয়, ঘর ভাঙে।

গ্রাম থেকে বেরনোর কোনো নির্ধারিত পথ নেই। গ্রামের মাঝ বরাবর পুবে পশ্চিমে একটা সরু পুরানো পথ— গ্রামের লোকেই তৈরি করে নিয়েছিল। সেটা আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে ভেঙে ভেঙে গিয়েছে। আসা-যাওয়ার জন্য লোকেদের পথের তেমন দরকার হয় না— গোরু-মোষের জন্য থাকলেই হল! যে-কোনো দিক থেকে ধনশিরির পাড়ে গিয়ে উঠতে পারলেই আর অন্য পথের দরকার নেই।

গোলাঘাট শহর বত্রিশ মাইল দূরে। মোকদ্দমা না লাগলে গোলায় যাওয়ার দরকার হয় না কারো। মোকদ্দমাও সব সময় থাকে না।

ডালিমের খেয়াঘাটে ধনশিরি পার হও— আধ মাইল ফাঁকা, তারপর ওপারের গ্রাম। গ্রামের পথ ধরে ছমাইল গেলে বড় রাস্তা —গোলাঘাট-ডিমাপুর সড়ক। বাস চলে, মোটর চলে, গোরুর গাড়িও চলে। রহিম দোকানী আর চন্দ্র সিং এপথেই ওদের দোকানের মাল বাসে চাপিয়ে নিয়ে আসে— একটিন কেরাসিন, দশ

সের লবণ, এক পোঁটলা বিড়ি, পাঁচ পোয়ার মতো তামাক পাতা আর রঙ্‌চঙে কিছু ছিটকাপড়।

ডালিম গ্রামে বাস, মোটর, রেল কিছু নেই— চলে না। গোরুর গাড়ি দুটো বা তিনটে আছে।

ওদের মাথার ওপর দিয়ে এরোপ্লেন যায়, ওরা এরোপ্লেন দেখেছে; কিন্তু অনেকেই রেলগাড়ি দেখেনি, মোটর দেখেনি, বাস দেখেনি, পাকাবাড়িও দেখেনি।

গোলাঘাট থেকে ফিরে এসে কেউ কেউ শহরের আজব গল্প বলে। ছেলেমেয়েরা, বউ-রা কান পেতে শোনে। কী অদ্ভুত, কী আশ্চর্য! অবাক হয়ে এ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে ভাবে একবার নিজে গিয়ে দেখে আসা যেত যদি!

কিন্তু পরমুহূর্তেই ওরা শহরের আকর্ষণের কথা ভুলে যায়। গ্রামের মাটি ডাক দেয়। পরিচিত, দরদী হাতছানি।

পুরানো-ডালিম আর নতুন-ডালিমের মাঝামাঝি পুরানো পাঠশালা স্কুলটা, কোনো এক সময় লোকেল বোর্ড দিয়েছিল। ঘর তুলে দিয়েছিল গ্রামের লোকেই। নামঘরের মতো, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খুঁটির ওপর তৈরী ঘরটা বেশ বড়সড়। মফিজ পণ্ডিত পড়াত আগে। মফিজ শহরে থেকে ইংরেজী-ও দুটো শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিল। গ্রামেরই মানুষ। মফিজের পর এখন জয়রাম পড়ায়। পনেরো-ষোলোটি ছেলেব নাম আছে ইস্কুলের হাজিরা খাতায়, চাটাই আছে বারো-তেরোখানা; কিন্তু ছ-সাত জনের বেশি ছেলে স্কুলে উপস্থিত থাকে না। জয়রামের তেমন খারাপ লাগে না। কোনোরকমে বর্ণ-পরিচয় হলেই হল। ডালিম গ্রামের ছেলে কি আর হাকিম-উকীল হবে?

ইস্কুল দেখতেও আজ পর্যন্ত কেউ আসেনি। একবার হ্যাট-কোট-পাতলুন পরা ডি. আই. নাকি একজন এসেছিল। গ্রামের মানুষ ভয়ে জড়সড় হয়ে গিয়েছিল। মফিজ মাস্টারও নাকি ভয়ে থরহরিকম্প।

তারপর আজ পর্যন্ত আর আসেনি কেউ— রক্ষে!

চারমাস, ছমাস পর পর একবার শহরে গিয়ে এস্. আই. ডি. আই.-কে হাঁস-পায়রা নজরানা দিয়ে আসে জয়রাম। তিন-চারদিন থেকে, মাস মাইনের টাকা ক'টা নিয়ে আসে। তা থেকেও দু-একটাকা কেরানী ধার চেয়ে নেয়। তবু জয়রামের ভালো লাগে। পণ্ডিতি কাজের বেতনের টাকা ক'টা মৌজাদারের খাজনা আদায়ের মতো মনে হয়। বেতনের টাকা নেয়াও হল, একবার শহরটা ঘুরে আসাও হল।

ধনশিরির পারে ফরেস্ট বীট অফিস। ফরেস্টার থাকে। এ অঞ্চলের সবচেয়ে হোমরা চোমরা লোক। খাকি কামিজ পরে, বুট জুতো পায়ে দিয়ে, হাতে বন্দুক নিয়ে ঘোরে।

বন্দুক অবশ্য গাঁয়ে চারটে আছে। বাপুকনের একটা, জয়নূরের একটা, বাহাদুরের একটা, আর-একটা প্রেমকান্তের। জয়নূরেরটাই ভালো— দু' নলা।

গ্রামের ছেলে-বুড়োরা বন্দুকের চাইতে দা-কুড়াল, লাঠি-সড়কির ওপরেই বেশি নির্ভর করে। নেপালী খুক্‌রীর ধার কতখানি অনেক ব্যাঘ্র মহারাজেরও তা জানা আছে। হাতির জন্যই বন্দুকের দরকার। তবুও গ্রামে বন্দুক থাকাটা গর্বের কথা!

কখনো কখনো আবার মাথায় লাল-পাগড়ী বাঁধা, খাকি উর্দি পরা পুলিশও আসে— দু-তিনটে। পুলিশকে গ্রামসুদ্ধ লোক ভয়

পায়। ধরে নিয়ে গেলে করবে কি? বাদী-বিবাদী কেউই গ্রামে পুলিশ আসাটা অবশ্য পছন্দ করে না। দুপক্ষই ঘুষ-টুষ দিয়ে তাড়াতাড়ি ওদের বিদায় করে দেয়।

গ্রামে পুলিশ আসা আর বাঘ বেরনো একই কথা। বাঘকে তাড়ানো যায়; কিন্তু পুলিশ!

পুলিশকে যে গ্রামে ডেকে আনে তাকে সবাই মনে-প্রাণে অভিসম্পাত দেয়। পুলিশ যদি এলোই তবে গ্রামের আর কি বাঁধন রইল? গ্রামের লোকেরা কি আর বিবাদ মেটাতে পারত না? এইভাবেই তো সাত-পুরুষ কাটল।

অন্য কোনো ঝগড়া ঝাঁটি নেই।

পুলিশের বুটের ছাপ ধনশিরির বালুতে কোনো চিহ্ন রেখে যায় না। নদীর পাড়ের শিমুল ফুলগুলো ঝকমকিয়ে ফোটে। পুলিশের মাথার লাল-পাগড়ীর কথা সবাই ভুলে যায়।

শহর থেকে বেশি দূরে নয়, তবু অনেক দূরে। এ যুগেরই, তবু খুব সেকেলে। সূর্যের অকৃপণ আলো রোজ তাকে উদ্ভাসিত করে তোলে; তবু ডালিম গ্রামকে ঢেকে রাখে ঘন অরণ্যের আদিম অন্ধকার।

•

বছরের শেষে বছর আসে, ডালিম গ্রামের এতটুকু পরিবর্তন হয় না, এক বছর বয়েস বাড়ে মাত্র। কালের বিবর্তনের অনেক দূরে নীরবে পরে থাকে ডালিম।

নির্বাচনের সময়েও ডালিমে রাজনীতি আসে না, আসে কোনো প্রার্থীর এজেন্ট; আর পড়তে পারা যায় না এমন সব ছাপা কাগজ। গ্রামের ধুরন্ধর গোটাকয়েক বুড়ো প্রার্থীদের কাছ থেকে পয়সাকড়ি হাতিয়ে ভোটের দিন অন্য গ্রামে বেড়াতে চলে যায়।

ভোটের বাক্স সারাটা দিন পথ চেয়ে থাকে, খালি পেটেই সন্ধেবেলা শহরে ফিরে যায়। ডালিমের ভোট ছাড়াই কেউ জেতে, বড়লোক হয়; কেউ হারে।

হেরে গেলে যে কী হয় কেউ জানে না।

পশ্চিম দিকের জঙ্গলটায় বড়ো বড়ো বিল— বিলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাছ-কাছিম। ডালিম গ্রামে শুধু ভাত কাউকে খেতে হয় না। বরশি ফেললেই এক খালুই কৈ-মাগুর।

কুরি, বাটাও যে ধনশিরিতে পাওয়া যায় না, এমনও নয়।

দুই

কতটা বেলা বোঝা যায় না। মনে হয়, বিকেল। গা ভার ভার ঠেকে। গতরাত থেকে একটানা বৃষ্টি— জোর বৃষ্টি। একবার শুরু হলে ডালিমগ্রামে সহজে বৃষ্টি থামে না। পথ ঘাট পচে যায়, ঘর-উঠোন প্যাঁচ-প্যাঁচ করে, গোরু-মোষের ছুর্দিন আসে, ছেলে-বুড়োরা ঘরের বাইরে যেতে পারে না। শুধু জোয়ান ছেলে-মেয়েদের ঘোরাঘুরি না করলে চলে না।

গুলচ পশ্চিম আকাশের দিকে একবার তাকাল। মেঘে ছেয়ে আছে। অন্ততঃ সাতদিন এরকম চলবে। এই ক'দিনের মধ্যে ঘর ছাওয়ানোর কথা ছিল। ভেতরে হয়তো জল পড়ছে। অনেকদিন

আগেই ছাওয়ানো উচিত ছিল। কিন্তু সময় পেল কই? ওর ঘরটাই শুধু ডালিমে, বাকী কাজকর্ম সবই পামে। সেখানেই তার বেশির ভাগ সময় কাটাতে হয়।

তা ছাড়া সবাই বলে সে নাকি একটু আনমনা। কোথাও বসলে বসেই থাকে— উঠতে ভুলে যায়।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়।

এই কথা বলেই তো ওর মা সব সময় খ্যাচ-খ্যাচ করে।

মার জন্য গুলচের বড়ো একটা দরদও নেই, চিন্তাও নেই। বয়েস বেশি হয়নি, বড়ো জোর আড়াই কুড়ি মতো হবে। ভালো খোরাক পেলে হয়তো আরও কচি দেখাত। কিন্তু সারাটা জীবনই দুঃখ-কষ্টে কাটল।

খোড়ো ঘরের চালটায় খড় পড়েনি অনেকদিন। মা সেখানে একাই থাকে। গ্রামের মধ্যখানে কিসের ভয়? কখনো কখনো মেয়ে এসে থাকে— দু-একদিন। চোর-ডাকাতের ভয় তেমন নেই। ঘরের ভেতরে বলতে গেলে কিছু নেই, পুরানো বেতের বাক্সটায় আগড় বাগর দু-চারটে জিনিস— এই যা।

সম্পত্তির মধ্যে চারটে গাই, ছাগল আর হাঁস-মুর্গী কয়েকটা। শেয়ালে যে কটাকে নিয়েছে, নিয়েছেই। গ্রামের লোকেরটা না খেলে শেয়াল-কুকুর কী খেয়েই বা বেঁচে থাকবে?

কথাগুলো আপন মনে ভাবতে ভাবতে গুলচ বাড়ির দিকে এগোচ্ছিল। পুরানো ছোট্ট মাথালটা বৃষ্টির জল আটকাতে পারেনি। পথে হাঁটু পর্যন্ত পিছল কাদা। কাদার ছিটে ওর মাথায়ও পড়েছিল। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। রোদ-বৃষ্টি, কাদা-জলকে কখনও ভয় করতে শেখে নি। এ নিয়েই সে বড়ো হয়েছে।

জীবনের তেইশটা বছর ডালিমগ্রামের জল-কাদাকে নিয়ে কেটেছে। ওদেরও আপন লাগে।

যেমন ঘরের বাইরে, তেমনই ভেতরে। কিন্তু ভেতরে জল পড়লে খারাপ লাগে। কখনো আবার রাতে শুয়ে থাকার সময় ওর মাথায়, শিথানে জল পড়ে। তখন খুব রাগ হয়। পরদিনই ঘরটা ছাউনি করাবে বলে প্রতিজ্ঞা করে। মেঘকে বকে, যেন গ্রামেরই কোন দুষ্ট লোককে বকছে।

মা ঘুমের ভান করে চুপচাপ শুয়ে থাকে। জানে— কাল গুলচ কিছুই করবে না। গায়ে জল পড়ার কথা কাল একেবারে ভুলে যাবে। তার ঘরের চালে যে খড় নেই, বৃষ্টি থামলে সে কথা আর মনেই পড়বে না।

গুলচ নিজেও সে কথা জানে।

কখনো কখনো গোয়ালের গোরু-বাছুর বাঘে নিয়ে যায়। সে চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে বাঘকে গালাগাল দেয়। পরদিনই জয়নূরের বন্দুক দিয়ে জঙ্গলের সব ক'টা বাঘ মেরে খতম করার সিদ্ধান্ত গলা ফাটিয়ে জাহির করে।

অবশ্য আজ পর্যন্ত সে বন্দুক ছোঁড়েনি।

দিনের বেলা হয়তো গোরু সাবাড়-করা বাঘটার জন্যই দরদ হয়। মাকে বোঝায়, "নিলই না-হয়, আমাদের না খেলে ও আর পাবে কোথায়? হাজার হোক বাঘ তো। বাঘ কি আর ঘাস খেতে পারে?"

মা আপনমনে গজ গজ করে। বনের বাঘকে দিয়ে গোয়ালের গোরু খাওয়ানোর এমন যুক্তির কোনো সার্থকতা মা খুঁজে পায় না।

অনেক বাঘ গুলচ দেখেছে। জঙ্গলে কাঠ আনতে যাওয়ার

সময় শুধু ছোটোখাটোই নয়, প্রকাণ্ড ডোরাকাটা বাঘও দেখে, চিতাবাঘও দেখে। বড়ো সুন্দর লাগে দেখতে।

গা ছুঁয়ে, হাত বুলিয়ে আদর করার ইচ্ছে হয় ওর।

ডোরাকাটা বাঘের গায়ের রঙ এমন চোখ-ধাঁধানো! বাঘ ওকে মোটেও ভয় পায় না, সেও বাঘকে ভয় পায় না। বাঘ তো শুধু গোরু খায়, মানুষ খায় না। বাঘের জন্য গুলচের বড়ো দরদ।

ওপারের গ্রাম থেকে এসেছিল গুলচ। সেখানে বাও ধানের ক্ষেত আছে, শালি ধানেরও আছে। অন্যদের সঙ্গে সে-ও কয়েক কাঠা জমি চাষ করে, তার নিজস্ব জমি। ওদিকটায় ধনশিরির পাড় উঁচু। খুব বড় বন্যা না হলে ভয়ের কোনো কারণ নেই। আর বন্যার জল যদি ওঠেও— পলি ফেলবে, এতে দুঃখের কী আছে? নদী পার হয়ে গুলচ একটু থামল। একবার ঘুরে তার ক্ষেতের দিকে চাইল। দেখা যায় না। বেশ-কিছুটা দূরে। তা ছাড়া বৃষ্টি পড়ছিল। বেলাও পড়ন্ত। বৃষ্টিধারা ভেদ করে ওপারে বেশি দূর দেখা যাচ্ছিল না। জমিগুলোর কথা মনে হওয়ায় ওর আনন্দ হল। বড়ো সরস জমি।

হঠাৎ নদীর দিকে চোখ পড়তেই সে থমকে দাঁড়াল। ঝর ঝর বৃষ্টিধারার সাদা সাদা ফোঁটা নদীর জলে ঝরে পড়ছে— অবিরাম। এত সুন্দর লাগছে। জলের ওপর জলের ফোঁটা পড়লেও ছিটকে ওঠে। সাদা, নরম। নদীর জল পরিষ্কার— প্রায় নীল। তার গায়ে মেঘের বুক থেকে নেমে আসছে বৃষ্টির সাদা সাদা জলকণা।

একটা মিষ্টি আওয়াজ হচ্ছে। গাছের পাতায় বৃষ্টির ফোঁটা'

পড়লে যে শব্দ, তার সঙ্গে নদীতে পড়া বৃষ্টির শব্দের মিল নেই। মিষ্টি নরম শব্দ।

কিছুক্ষণ পাড়ে দাঁড়িয়ে গুলচ জলের খেলা দেখল। ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ— নদীর বুকে তার মিষ্টি প্রতিধ্বনি। ওর খুব ভালো লাগে। রুপালি জলকণাগুলোকে ওর বড়ো আপন লাগে।

সন্ধে হয়ে আসছে, গুলচ বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

নদীর ওপর বৃষ্টি পড়া দেখতে বড়ো ভালো লাগে। কী এক আনন্দে গুলচের মন ভরে উঠল।

কাদার ভেতর থেকে একটা স্যাঁৎসেতে ভিজে গন্ধ আসছে। পথের দুপাশের গাছপাতা থেকেও একটা পরিচিত সজীব গন্ধ পাচ্ছে। বনানীর আদিম গন্ধ।

গুলচ দাঁড়াল না।

বাদলা রাত। বেশি অন্ধকার হলে বাঘের ভয়। গোরুর খোঁজে এসে যদি ওকেই পায়। অবশ্য হাতে আছে দা-টা, খুব একটা ভয় নেই। আর পাকাকলার দুটো ছড়া-ও ওর কাঁধে।

একটা কলা ছিঁড়ে খেল। খেতে তেমন ভালো নয়, স্বাদ নেই বিশেষ। আর একটা কলা খেল।

নিজের বাড়ির প্রতি ওর খুব একটা টান নেই। বাড়ি না গিয়ে যাবেই-বা কোথায়? ভাঙাচোরা হলেও নিজের। তা ছাড়া মা-যে আছে।

কাদায় পা টিপে টিপে এগিয়ে যায়। বাড়ি পর্যন্ত এখনো অনেকটা পথ— প্রায় এক মাইল। বৃষ্টির মধ্যে মাঝে মাঝে মনটা কেমন যেন উতলা হয়ে ওঠে।

মাঝে মাঝে চেনিমাইর কথা মনে পড়ে। মাঠে কোদাল

মারার সময়ে, উঠোনে বসে বাখারি চাঁচার সময়ে, একা এইভাবে পথ চলতে চলতে হঠাৎ কখনো আচম্‌কা চেনিমাইর কথা মনে পড়ে। মনে হলেই ছটফট করতে থাকে।

চেনিমাই পুরানো-ডালিমের মেয়ে। দেখতে শুনতে মেয়েটি বড় রূপসী। একটু খেয়ালী ধাতের মেয়ে।

নানা কারণে গুলচ পুরানো-ডালিমে যায়। এবাড়ি ওবাড়ি ঢুঁ মেরে তাম্বুল খেয়ে আসে। সুযোগ-মতো ঝিউড়ী মেয়েদের মতিগতিও বুঝে আসে।

এমনি করেই গুলচের পরিচয় হয়েছিল চেনিমাইর সঙ্গে। আলাপ করে মেয়েটিকে ভালো লেগেছিল তার। চেনিমাইরও ওকে ভালো লেগেছিল। ক্রমে সে আকর্ষণ নিবিড় হয়।

কিন্তু তখন অবস্থা ভালো ছিল না গুলচের। ওর সঙ্গে চেনিমাইর বিয়ে দেবে, এমন আশাও ছিল না।

সুযোগ-মতো একদিন চেনিমাইকে নিয়ে পালাবে এমন ব্যবস্থা গুলচ করেছিল। চেনিও রাজী ছিল। ডালিমগ্রামে মেয়ে চুরি করা বা নিয়ে পালানো কোন নতুন ঘটনা নয়। মেয়েটার মন পাওয়াই আসল কথা।

দুবছরের বেশি কি, তিনবছর-ই হতে চলল। সেদিনও এমনি বৃষ্টি-কাদার মধ্যে সে চেনিমাইদের বাড়ি গিয়েছিল। ওদের বড়ো ঘরের ডোয়ায় অন্ধকারে লুকিয়ে থাকার সময় তার বুক ঢিপঢিপ করছিল, যদি কেউ দেখে ফেলে।

অবশ্য এই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে চেনিমাই-র মা-বাবা ভর-সন্ধ্যাবেলাতেই শুয়ে পড়েছিল। চেনি একা রান্নাঘরে থালা-বাসনে টুং টাং শব্দ তুলে কাজ করছিল। সে বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি

মেরে দেখল : শুধু চেনিমাই আছে, আর কেউ নেই। বেড়ায় টক্ টক্ করায় চেনিমাই বেরিয়ে এল।

তারপর দুজনে পালাল।

তারপর আর কী।

পরের দিন-ই সারাটা গ্রামে হৈ-চৈ পড়ে গেল। ইন্দ্র নেপালীর গোয়াল ঘরে দুজনকে পাওয়া গেল। ওদের বিচার হল।

গ্রামের লোক বলল, যা হবার হয়েছে, ছেলে-মেয়ে দুজনেরই মন মজেছে যখন, বিয়ে দিয়ে দাও।

গুলচের বাবা রেগে আগুন, "বাড়ি-পালানো মেয়েকে বউ করে ঘরে আনার সাহস কার আছে দেখি—আয়—টুকরো টুকরো করে ফেলব।"

—বুড়ো দা ঘোরাল।

"আমার মেয়েকে ফুসলিয়ে নিয়ে যায়, এত সাহস! আমিও যদি অমুক হই, দেখি কোন্ কুকুর আমার মেয়ের দিকে হাত বাড়ায়।"

চেনিমাইর জ্যাঠা সফিয়ত বুড়ো এমন করে মুখ ঝামটা দিল যে কেউ আর রা-টি করার সাহস পেল না। সফিয়ত সহজে নরম হওয়ার মতো লোক নয়।

বিয়েটা হল না। গুলচ কিছুই করতে পারল না।

কাঁদতে কাঁদতে চেনিমাই ওর বাবার সঙ্গে চলে গেল।

পরের দিনই গুলচকে ওর বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিল। "আমার ছেলে হয়ে তুই নাক-কান কাটলি। এ বাড়িতে তোর ছায়া দেখলেও কেটে টুকরো টুকরো করব। কোথায় মরবি মরগে যা। আমার সম্পত্তির এক কটোও তুই পাবি না।"

ওর মা গুলচের হয়ে ওকালতি করেছিল। ছেলের সঙ্গে মাকেও বাড়ি থেকে বের করে দিল। বুড়ো রইল বড়ছেলে-বউ-এর সঙ্গে। তা ছাড়া ছোটো বিবিও রয়েছে। গুলচ আর তার মা চলে যাওয়ায় কোনো ক্ষতি হল না।

গুলচ কারুর একটা পরিত্যক্ত ঘরের চাল-বেড়াগুলো টেনে এনে একটুখানি জমিতে কোনো মতে একটা ঘর তুলল। বাপকে বলে এল—"মরার সময়ও খোঁজ করিস না, এই যে বেরিয়ে এলাম আর যদি ঢুকি তো আমায় কুত্তা বলিস।"

সেই যে মা-ছেলে ভিন্ন হল। আজও তাই।

দেখতে দেখতে তিনটে বছর পার হয়ে গেল। বাপের সঙ্গে গুলচের দেখা সাক্ষাৎ হলেও আজ পর্যন্ত কথাবার্তা হয়নি।

ওর মাকে কেউ কেউ বোঝায়—"ঝগড়া-ঝাঁটি কার না হয়? বাড়ি ছেড়ে এই আধপাগলা গুলচটার সঙ্গে কি করে থাকবি? ওটাই তো তোর বাড়ি। গুলচকে নিয়ে ওখানে ফিরে যা।"

গুলচের মা গজগজিয়ে ওঠে—"সতীনের সংসারে আর যাচ্ছি না। পাটরাণীকে নিয়ে থাকুক। নিজের ছেলেকে যে মিন্‌সে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়, তার সঙ্গে কোনো মনিষ্যি সংসার করে না, করে কুকুর।"

গুলচের বাপকেও গুলচ আর তার মাকে আবার ফিরিয়ে আনার কথা কেউ কেউ বলেছিল। কিন্তু বুড়োর সিদ্ধান্ত অনড়—"আমি যাব ওদের ডাকতে? মা-বেটা মিলে আমার নাক কাটল, কেউ যদি আসতে চায় আসুক, আস্তাকুঁড়ে ঠাঁই পেয়ে যাবে।"

গুলচ অবশ্য দৃঢ় সংকল্প—বেঁচে থাকতে সে আর বাপের উঠোনে পা দেবে না, যা-ই হোক-না কেন।

অবশ্য ওর মা এখান থেকে বাপের কাছে গেলে খুশী-ই হতো। পুরোপুরি স্বাধীন হতে পারত তা হলে। ওকে আটকে রাখার কেউ থাকত না তখন। কিন্তু মুখ ফুটে এই কথা মাকে কখনও বলেনি। বরং বলে: "ওখানে না গেলে যদি না-খেতে পেয়েও মরিস তবু যাবি না। তোর বেটা-বউ যদি তোকে না চেনে, তবে ওদের কথা ভাবার তোর কিসের গরজ পরেছে রে।"

মা ডালিম গ্রামের মেয়ে। বসে খেতে জানে না। পাঁচ বছর বয়েস থেকে চারাধান রুয়ে, কাঠ চিরে আর ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে খেতে হয়েছে তাকে। কাজ করতে ভয় পায় না। গতর যতদিন আছে মেগে খাব না, খেটে খাব।

মা থাকায় নিজের সংসারের জন্য গুলচের বেশি চিন্তা না করলেও চলে। মা-ই গোরু-গাই-হাঁসমুর্গী সব দিক সামলে সংসার চালায়। তবু পামে বেশিদিন কাটালে গুলচের মার জন্য চিন্তা হয়। হয়তো নুন ফুরিয়ে গেছে। ভানা চাল আছে কি নেই! চোর-ছ্যাচোররা হয়তো ঘুর ঘুর করছে!

বাড়ির কথা বেশি করে মনে হলে সে পাম থেকে চলে আসে। তখন রোদ-বৃষ্টি ভ্রূক্ষেপ করে না। মার জন্য তখন বড়ো মায়া হয়।...

সন্ধ্যা নামল।

বৃষ্টি তখন থামেনি।

আকাশে চাঁদ মেঘে ঢাকা। কিছুটা আন্দাজের ওপর গুলচ

এগিয়ে চলেছিল। শরীরটা ভারী ভারী ঠেকছে। গ্রামে সূর্যাস্ত হতে না হতেই রাত। আন্দাজ করে দেখল, বাড়ি আর বেশি দূরে নয়। বাঁকটা পেরোলেই বাড়ির সামনে এসে পড়বে।

হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে কি একটা ভাবল, তারপর ডান দিকে ঘুরে হাঁটতে শুরু করল। বাড়ির দিকে নয়, ওরাদের বাড়ির দিকে।

তিন

তিনকোঠার একটা নিচু মতো খোড়ো চালাঘর। উঠোনটা ছোটো—কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন আর ভালো করে চাঁছা, জল-টল দাঁড়ায় না। বাড়ির সামনের দিকে গোয়ালঘর, সেখানে তিনটে দুধেল গাই বাঁধা। দুয়ারের মুখে ডোয়ায় শুয়েছিল কালো রঙের কুকুরটা। ঘরের ভেতরে কারুর শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। মেঝের ওপর জ্বলন্ত লণ্ঠনের আলো, দুয়ারের ফুটো দিয়ে তার প্রকাশ একটু একটু বাইরে বেরিয়ে আসছিল। চাল থেকে বৃষ্টির জল তখনো ঝর ঝর করে পড়ছে।

গুলচ খানিকক্ষণ উঠোনেই দাঁড়িয়ে রইল— ভেতরে কে আছে কান খাড়া করে আন্দাজ করল, তারপর ধাক্কা দিয়ে দুয়ার খুলে ঢুকে পড়ল।

—"কে ?" ভেতর থেকে কেউ একজন সাড়া দিল।

—"আমি— বাইটি আছিস ?"

—গুলচ নাকি ? আছি, আসছি— বোস ?"

ভেতর থেকে বেরিয়ে এল তরার মাসী কপাহী, তরা নয়।

—"ভিজে শপ্‌সপে হয়ে এই রাতদুপুরে কোত্থেকে এলি ?" বসবার জন্য পিঁড়িটা এগিয়ে দিয়ে কপাহী বলল।

"পাম থেকে—" সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে সে কপাহীর দিকে তাকাল।

কার্পাসের মতো ধব্‌ধবে ফর্সা বলে ওর নাম দেয়া হয়েছিল কপাহী। এখনো ধবধবে ফর্সা। চোদ্দ-পনেরো বছর হল বিয়ে হয়েছে। কপাহীর বিয়ের সময় গুলচের বয়স ছিল এগারো বারো। তখন থেকে যতবার কপাহীকে দেখেছে একই রকম দেখছে— একটুও বদলায় নি।

চোদ্দ বছর বয়েসে কপাহীর বিয়ে হয়েছিল নাহরের সঙ্গে।

পুরানো-ডালিমের নাহর প্রথম বিয়ে করেছিল কপাহীর দিদি যুতিকে। ওদের একটি মেয়ে হয়েছিল— তরা। কিন্তু তরার পাঁচ মাস হতেই যুতি সূতিকারোগে মারা যায়। মাস ছয়েক নাহরের দিদি মেয়েটাকে কোনোরকমে বড়ো করল। তারপর নাহরের ইচ্ছায় গ্রামের লোকেরাই কপাহীর সাথে তার বিয়েটা লাগিয়ে দিল। কপাহী তরার আপন মাসী, মেয়েটা কষ্ট পাবে না।

কপাহী আসায় তরা যেন নিজের মাকে-ই ফিরে পেল। মায়ের কথা মনে রাখার বয়েস ও শক্তি তরার হয় নি। কথা ফুটলে অন্যরা শিখিয়েছিল বলে সৎমা কপাহীকে মাসী ডাকত কিন্তু জানত মা বলেই। কপাহীও তরাকে নিজের মেয়ের মতো

করে বড়ো করে তুলেছিল। ওদের দেখলে মা আর মেয়ে নয় বলে কারুর বোঝার সাধ্য ছিল না। তরার যে অন্য একজন মা ছিল, তা ওর ভাবার ফুরসৎ ছিল না। কপাহী নিজেও সন্তানহীনা।

নাহর একটু খামখেয়ালী, একটু গোঁয়ার ধরনের লোক। আর কপাহী একটু চঞ্চল।

আশ্বিন-কার্তিক মাসে ধনশিরি উজিয়ে দু-চারজন ব্যাপারী আসে— নৌকোয় অনেক কিছু নিয়ে। বিনে পয়সায় পামে বীজ দিয়ে যায়। আলু, মাষকলাই, সর্ষে ও অন্যান্য শস্যের বীজ। মাঘ-ফাল্গুনে আবার আসে— পাওনা বুঝে নেয়। নৌকো বোঝাই করে মাষকলাই, সর্ষে নিয়ে যায়। কখনো কখনো কোনো ব্যাপারী ডালিম গ্রামের ঝিউড়ী-বউড়ীর মন একটু আনমনা করে দিয়ে যায়। কপাহীর জীবনে একটা ওলট-পালট ঘটে গিয়েছিল। নাহরের সঙ্গে তার সম্পর্ক চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যায়।

নাহর কপাহীকে তাড়িয়ে দিল না, কিন্তু কাউকে না বলে সে একদিন ঘর থেকে নিরুদ্দেশ হল। নেই, নেই, কোথাও নেই। কেউ বলতে পারে না কোথায় গেল। গ্রামের লোক খুব একটা আশ্চর্য হয় নি। কখনো কখনো দু-একটা লোক এভাবে হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। বাঘেও খেতে পারে, আবার কোথাও চলে যেতে পারে। সব মানুষকে কি আর ধরে রাখা যায়।

নাহর ফিরে আসবে এই আশায় কপাহী কিছুদিন তার বাড়িতেই ছিল। শেষে খবর পেল যে অনেক দূরে কোন্ এক গ্রামে সে আছে, এ গাঁয়ে আর ফিরবে না। সে বুঝল পথ চেয়ে থেকে আর লাভ নেই। একদিন বিধবা বড়ো ননদের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া

করে তরাকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে এল। এতে কেউ আপত্তি করল না। ওরা এসে কপাহীর মাসীর সঙ্গে ছিল।

প্রথম প্রথম গ্রামের মানুষ নাহরের এমন ব্যবহারের কারণ বুঝে উঠতে পারে নি। পরে কিন্তু কেউ কেউ ধরতে পারল। গত আশ্বিন মাসে যে বসির ব্যাপারী নৌকো নিয়ে উজিয়ে এসেছিল, পুরানো ডালিমের ঘাটে নৌকো বেঁধে গ্রামের মানুষকে মাষকলাই, আলু, পেঁয়াজের বীজ দিচ্ছিল— তখনই তার হাতে টাকার থলি দেখে কপাহীর কেমন জানি মতিভ্রম হয়েছিল। কয়েকদিন বসির কপাহীদের ঘরে মে'মান ছিল। বসির জোয়ান ছেলে, কপাহীও ছেনাল মেয়ে।

কথাটা পরে নাহর বুঝতে পেরেছিল। মারধরও করল কপাহীকে। তারপর কিসের দুঃখে যেন একদিন সে নিজেই চলে গেল ঘর-বাড়ি ছেড়ে। তুই-ই রাজপাট খা!

তরা এখন চোদ্দ বছরের কিশোরী। দেখতে ওরা দুই বোনের মতো। শুধু তরা একটু বেশি সজীব, কপাহী একটু শান্ত। কিন্তু দুজনেই সমান সুন্দরী— ফর্সা, রূপসী, স্বাস্থ্যবতী।

তিনবছর হল কপাহীর মাসী মারা গেছে। তারপর থেকে তরাকে বুকে আঁকড়ে কপাহী একাই আছে। তেমন ভয়ের কারণ নেই। একমাত্র ভয় তরাকে নিয়ে। তরা চোখে পড়ার মতো মেয়ে; তেমন মেয়ে গাঁয়ে আর দুটি নেই। যেমন রঙ তেমনই রূপ, তেমনই চোখ, তেমনই নাক। একবার দেখলে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। লোকের বাড়িতে ক্ষেতের কাজ করে, তাই বলে রঙ একটুও ময়লা হয়নি। দিন দিন ওর রূপ যেন খুলছে।

কপাহীর ভয় তরাকে নিয়ে।

অবশ্য নির্ভাবনার কারণও ছিল। কিছুদিন একঘরে করে রাখার পর কপাহীকে গ্রামের লোকেরা আবার সমাজে ফিরিয়ে নিয়েছে; তবু কপাহীর সব কথা সবাই জানে। কাজেই তরার আকর্ষণে ওদের সঙ্গে মাখামাখি করে নিন্দা কুড়োতে এগিয়ে আসার মতো ছেলে-ছোকরা আর ক'জন আছে!

মাঝে মাঝে শুধু গুলচ আসে। সে অতশত খবর রাখে না।

সম্পর্কে গুলচ কপাহীর কিছুই হয় না। তবু বয়সে বড়ো বলে ওকে গ্রাম সুবাদে বাইটি (দিদি) বলে ডাকে। কিন্তু তরা ওকে কপাহীর সম্বন্ধ ধরে ডাকে না। ওকে ডাকে ককাইটি (দাদা) বলে— গুলচ ককাইটি। এ ডাকটা গুলচের অপছন্দ নয়।

কিন্তু দাদা বললেও গুলচের সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশা করতে কপাহী তরাকে ছেড়ে দেয় না।

গুলচ জোয়ান ছেলে, তরাও সোমত্ত মেয়ে। তা ছাড়া সারাটা দিন কপাহীর ঘরে থাকলেও চলে না। জোয়ান ছেলেকে কি বিশ্বাস!

দুটো কি তিনটে কলার ফানা মার জন্য রেখে বাকি ক'টা গুলচ কপাহীর দিকে এগিয়ে দিল।

—"নে, কলা ক'টা রাখ। পামের বাগানে হয়েছিল।" একটু চুপ করে থেকে বলল— "একটু চা খাওয়াতে পারিস বাইটি? তেষ্টা পেয়েছে।"

ভেতর থেকে তরা বেরিয়ে এল।

কপাহী বলল, "কলা ক'টা রেখে দে তরা, আর দেখ তো চা-পাতা আছে কিনা? একটু চা করে দে তোর দাদাকে— ভিজে নেয়ে এসেছে।"

এক ঝলক তরার দিকে চেয়ে কপাহীর চোখে চোখ রেখে গুলচ বলল; "তরা-টা দেখতে দেখতে বেশ ডাগর হয়ে উঠল।"

কপাহী কিছু বলল না।

কিছুক্ষণ দুজনে চুপ করে রইল।

তারপর কপাহী বলল, "খবর পেয়েছিস তো?"

—"কি?" গুলচ কপাহীর চোখের দিকে তাকাল। সত্যিই, কপাহীর চোখ দুটো সুন্দর।

—"চেনিমাইর নাকি বিয়ে হচ্ছে— ।"

আচমকা কথাটা শুনে গুলচের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

—"তাই নাকি? কোথায়?" একটু নির্লিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করল।

—"ওপারের গ্রামের মোলোকা, কি যেন নাম, সেই এক মোড়োলের ছেলের সঙ্গে নাকি। অবশ্য লোকের মুখে শুনেছি ছেলেটার হাঁপানি না শ্বাসের কি একটা ব্যারাম আছে। বদনামী মেয়েকে আর কোন্ ভালো ছেলেটা বিয়ে করবে।"

গুলচ মাথা হেঁট করল। চেনিমাইকে সে ভালোবেসেছিল। সে-ও তার সঙ্গে স্বেচ্ছায় পালিয়ে এসেছিল। পালানোর রাতটা ওরা ইন্দ্র নেপালীর গোয়ালঘরে একসঙ্গে শুয়েছিল। আর ওরই জন্য সে আর তার মা আজ বাড়িছাড়া হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে। সেই চেনিমাইর বিয়ে!

একটু পর গুলচ জিজ্ঞেস করল— "বিয়েটা কবে হচ্ছে?"

—"বিয়েটা আবার কিসের? একদিন দু-চারজন লোক এসে মেয়েটাকে নিয়ে যাবে— বাস্। এই অঘ্রাণেই হবে বোধ হয়।

গুলচ কিছু বলল না।

তরা ওর জন্য একবাটি চা নিয়ে এল। আর ছোটো একটা বাটিতে খানিকটা গুড়।

নামেই চা, সামান্য মুগা রঙের ছোঁয়াচ লেগেছে। তাতেই বেশি করে দুধ মিশিয়ে দিয়েছে।

—"তাঁত-টাত কিছু বুনছিস নাকি তরা?" গুলচ জিজ্ঞেস করল।

—"হুঁ, এক প্রস্থ তাঁতেই আছে— মেখেলা বুনছি।"

গুলচ চায়ে চুমুক দিল।

—"এবার নাকি বাওধান খুব ভালো হয়েছে?" তরা শুধালো।

—"এ পর্যন্ত তো ভালোই মনে হয়। গাঁয়ের লোক দু-মুঠো পাবে মনে হচ্ছে।"

—"তুই নাকি ওপারের পামে জঙ্গল পরিষ্কার করে অনেকটা জমি বার করেছিস?" কপাহী জিজ্ঞেস করল।

—"অনেকটা আবার কোথায়? বিঘা তিনেক হবে আর কি। পাড়ের মাটির মাপের আর কি মূল্য। তবে ওদিকটার জমি একটু উঁচু। কোনোরকম দু-পুরা মতো বার করতে পারলে ভাতের চিন্তা থাকবে না মনে হয়। কিন্তু একা হাতে আর কত করা যায়?"

—"ওই জমিগুলোরও নাকি খাজনা দিতে হবে?"

—"এক্ষুণি লাগছে না। নতুন— আবাদী জমিতে চাষ-বাস শুরু করলে দিতে হবে বইকি? একসনা পাট্টা করে নিজের নামে লিখিয়ে নিতে হবে।" গুলচ বলল।

বাটিগুলো নিয়ে তরা ভেতরে চলে গেল।

আশাভরা চাউনি নিয়ে কপাহী গুলচের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল— "আমি আর কত পারি, দুজনেই তাঁত বুনছি, সুতো

কাটছি, পরের মাঠে ধান বুনছি— কাটছি। কিন্তু এই ভাবে আর কতদিন চালাব? কোনোখানে কোনোরকম যদি একটুকরো জমি পেতাম—"

—"নাহয় পেলি, তুই জমি দিয়ে করবিটা কি?" গুলচ জানতে চাইল।

—"কাউকে বর্গা দিলেও এক মুঠো ধান ঘরে আসত। সারাটা বছর পরের মুখ চেয়ে থাকাটা কি একটা জীবন?"

একটু ভেবে গুলচ সায় দিল, "ঠিকই—"

কিছুদিন থেকেই ওর মনে একটা অস্পষ্ট আশা জেগেছে তরাকে যদি ওর হাতে দেয়, তা হলে তরা ও কপাহী দুজনকেই ওর পামের ডেরায় নিয়ে যাবে। সেখানে একটা নতুন ঘর তৈরি করে মাকেও নিয়ে যাবে। সবাই মিলে নিজেদের জমিতে ফসল ফলাবে, নিজেদের গোলার ধান খাবে। জঙ্গল কেটে নতুন জমি বের করে ধনী হবে। গাই-গুলোকে নেপালীর কাছে রেখে বাড়িতে বিয়োনো দামড়া ক'টাকে দিয়েই ক্ষেতের কাজ শুরু করবে। নিজের লাঙ্গল-গোরু, নিজের জমি, নিজের বাড়ির লোক দিয়েই বীজবোনা, ফসল-কাটা— এসব ভাবতেও আনন্দ হয়।

তরা ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে বলল— "ককাইটি, এখানেই ভাত খেয়ে যেয়ো। বাড়িতে জেঠিমা হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে।"

—"উঁহু, তোরা খা-গে যা। আমি বাড়ি গিয়েই খাব। মা এত তাড়াতাড়ি ঘুমোয় না। আর ঘুমালেও আমি গিয়ে জাগাব।"

কিন্তু কপাহীও বলায় সে ভাত খেতে ভেতরে এল।

—"দেখি তরা, এক ঘটি জল দে তো। কাদায় মাখামাখি হয়ে এসেছি।"

—"বৃষ্টিও কি কম পড়ছে"— ঘটিটা হাতে দিয়ে কপাহী বলল।

গুলচ ও কপাহী ভাত খেতে বসল, তরা পরিবেশন করল। মাছ ছিল, ঝোলটার যা স্বাদ হয়েছে না!

মেয়েমানুষের হাতের রান্নার স্বাদই আলাদা। ধনশিরির মাছের খুব স্বাদ। ডালিমের ক্ষেতের চাল অমৃত। পুরানো চালের ভাতও খেতে সুস্বাদু।

—"চেনির যে সম্বন্ধ এসেছে, পাত্রের নাম কী বলতে পারিস বাইটি?" গুলচ জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারল না।

—"নামটা ঠিক জানি না। তুই বলতে পারিস তরা?

তরা বলল—"কি জানি, সরুমইনা বোধ হয়– না কি কলাই—"

—সরুমইনা? ওপারের গ্রামে না তো?"

—"হ্যাঁরে, তোর পামের দিকেই হবে হয়তো।" কপাহী বলল, —"বাপের নাম মোলোকা না কী একটা—"

ভাত খেয়ে একখণ্ড তাম্বুল মুখে পুরে গুলচ একটু ভেবে নিয়ে বলল— "তুই বেশি চিন্তা করিস না বাইটি। আমি যতটা পারি জমি বার করি, যদি বেশি পাই মাকেও ওপারে নিয়ে যাব ভাবছি। দুটো প্রাণীর জন্য দুটো সংসার কেন? আর তোদেরও হয়তো নিয়ে যেতে পারব। আমি হাল বাইব, তোরা বোনাই-কাটাই করবি— সুবিধেই তো হবে।"

তরা কপাহীর দিকে তাকাল। কপাহী একবার গুলচের মুখের দিকে তাকাল। ওর কথায় অন্য কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় কিনা বুঝবার চেষ্টা করল।

তারপর কপাহী বলল— "আমাদের কথা এক্ষুণি ভাবতে হবে না রে। আগে তুই নিজে ঠিকঠাক হয়ে নে। আমাদের তো

কোনো রকমে দিন কেটে যাচ্ছে। গ্রামের লোকদের ছেড়ে অন্যখানে চট করে চলে যাওয়াটাও ঠিক নয়।”

গুলচ বলল—“গ্রামের লোকের মুখের দিকে চেয়ে থাকলেই কি পেট ভরবে? তোদের খবরবার্তা কি কেউ নেয়? নদীর ধারের জমি হলেই বা কি? আমি ভাবছি একটা বাগান শুরু করে চারপাশের পগারে অনেক সুপারি গাছ লাগাব। কলাগাছ লাগিয়েছিলাম, এই তো ফলেছে। পেঁপের চারাও হয়েছে ছুটো। শিমুল আর পানি-হেলেচ গাছও আছে গোটা কয়েক। খুব সরস জমি বুঝলি, কিছু একটা পুঁতলেই হল, লকলকিয়ে বাড়ে। আমার যে ডাঁটা শাক হয়েছে, তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।”

থালা-বাসন নিয়ে তরা ভেতরে চলে গেল। গলা খাটো করে কপাহী বলল—“সব-কিছু একটু ভেবেচিন্তে করা ভালো, বুঝলি? আমরা ছুজনে তোর সঙ্গে থাকতে গেলে লোকে কি আর ছেড়ে কথা কইবে? তরা নাহয় ছোটো মেয়ে, কিন্তু আমি তোর সঙ্গে থাকলে লোকের চোখ কি আর টাটাবে না? আগেই আমার যা অবস্থা করে রেখেছে, যথেষ্ট হয়েছে বাবা।”

গুলচের কান লাল হয়ে উঠল। কোনো মতে বলল, “মা তো থাকবে।”

—“থাকলেই বা কি? আর আমরা ছুজনে গিয়ে তোর সঙ্গে থাকা শুরু করলে তোর মা যে সেখানে থাকবে সে আশা কম। তুই সে সব কথা বুঝবি না—”

কতগুলো না-বোঝা কথা ভাবতে ভাবতে গুলচ কিছুক্ষণ বসে রইল। কপাহী আর তরা ছুজনকে সঙ্গে রাখার একটা সহজ উপায় সে জানে। কিন্তু সে কথা কপাহীকে বলার মতো কোনো ভাষা

খুঁজে পেল না। কপাহী কি আর তরাকে ওর হাতে দেবে? এদিকে কপাহীর হিসেবে তরা এখনো ছোট্ট মেয়েটি রয়ে গেছে। চোদ্দ বছরের সোমত্ত মেয়েও তার কাছে কচি খুকী।

বড়ো কম কথা বলে তরা। হয়তো সব সময় একা থাকতে থাকতে কথা বলার সুযোগই পায় না। কপাহীর সঙ্গেই বা কী আর কথা বলবে? একা থাকলে, অকারণে তরার মন ভারী হয়ে ওঠে। এখন বুদ্ধিসুদ্ধি হয়েছে। এর-ওর কাছ থেকে শুনে বুঝতে পেরেছে, মাসীর চরিত্রে একটা খুঁত আছে। তাই গাঁয়ের মধ্যে থেকেও ওরা একঘরে একপ্রান্তে পড়ে আছে। আরেকটা কথাও সে বোঝে, কপাহীর দোষে ওর গায়েও একটা দাগ লেগে গেছে। ওকে অবশ্য যে দেখে সে-ই ভালোবাসে, কিন্তু তবুও ওর মনে হয় অন্য মেয়েদের মতো ও ঠিক যেন মুক্ত নয়। অবশ্য বেশি চিন্তা করতে পারে না। যুবতী মেয়ে; চৌপাশের জীবন্ত জগতে আনন্দের মেলা বসে। সেই মেলায় ওর অলিখিত নিমন্ত্রণ। সে হাসি-আনন্দ মনের বিষণ্ণতা দূর করে দেয়। একা একা হাসে, সুর করে গান গায়, ওর শরীর-মন অকারণ পুলকে ভরে ওঠে। হাওয়ায় হাওয়ায় উড়ে বেড়ানো কার্পাস তুলোর মতো গা ছেড়ে দিয়ে ভেসে যেতে ইচ্ছে করে।

ভেতরে অস্থির, আনন্দ-চঞ্চল মন, বাইরে তার প্রকাশ নেই, শান্ত ও স্থির। অচঞ্চল হয়তো আলোর তপস্যা করে; বাগানের পেছনের শালগাছটার ওধারে রোজ চোখে পড়ে বড়ো একটা তারা— তার কাছে প্রাণের কিছু গোপন কথা গচ্ছিত রাখতে চায়।

এমনিতে মাথা নিচু করে থাকে কিন্তু তরার মনটা ঊর্ধ্বমুখী। ওর মনের ভেতরের নারী সূর্যমুখী— ওর যেন দরকার একটা

প্রশস্ত নীল আকাশের, দরকার বহু ভাস্বর সূর্যের— শরতের চাঁদের বুক থেকে উপচে পড়া অমৃতের।

গোপন এই সূর্য-বন্দনা কবে সার্থক হয়ে উঠবে তা নিয়ে ভাবনা নেই। কখনো কখনো শুয়ে শুয়ে একটা রঙিন ভবিষ্যতের অস্পষ্ট ছবি আঁকে— প্রিয়া হওয়ার, পত্নী হওয়ার, মা হওয়ার, গৃহিণী হওয়ার। ওর প্রাণ কারো বুকের নিঃশঙ্ক উত্তাপ চায়। অনেক সোহাগ চায়।

কিন্তু ওর ঘরে, ওর মনের আঙিনায় কেউ আসে না; কখনো আসে গুলচ, কখনো আসে চন্দ্র। কাছে পেলে গুলচকে ওর সহজ মনে হয়। তাকে সব কথা যেন বলা যায়। কিন্তু গুলচ যখন কাছে থাকে না তখন তরার মনে হয়— এই গুলচ-ই ওর সব অব্যক্ত প্রার্থনার ওপারের মেঘে-ঢাকা সূর্য। একদিন সে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরবে। সূর্যের সমস্ত উত্তাপ বুকের মাঝখানে নিয়ে হঠাৎ সে যক্ষের ধনের মালিক হবে।

কিন্তু মনের কথা সে মুখ ফুটে কাউকে বলে না, এমন-কি নিজেকেও নয়। কারবালার হাজার শহীদের আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিয়ে সে ফোরাত নদীর পারে, শুকনো বালির মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

চন্দ্রকে বোঝা কঠিন। সে একটা আধপাগল। কখন কী বলে, কখন কী করে বসবে, বলা মুশকিল। কারো অন্যায় সে করে না, কিন্তু ধনশিরির বন্যা কি কখনো ঘর-বাড়ি ভাঙে না? পলি তো পড়ে। না, না, চন্দ্রকে কিছু বলা যায় না, বলতে পারা যায় না। ঝড়ের কাছে মনের কথা বলে লাভ কি?

তরা চুপচাপ থাকে। চুপ করে থেকে তরা অন্তরের গান শোনে। জীবনের গভীর, কোমল উচ্ছল গান।

ছেলেবেলায় তরা শালিখ পাখির বাচ্চা পুষতো। মায়ের মতো

আধার খাইয়ে তরা পাখির বাচ্চাগুলোকে পোষে, চান করিয়ে দেয়, কথা বলা শেখায়। কিন্তু পোষা পাখি একদিন উড়ে চলে যায়। বেড়ালে খায়; এমনি-ও মরে যায়। তরা কাঁদে, একবেলা ভাত খায় না। বেড়ালটাকে মেরে ফেলার প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু মারবে কি করে? সব চাইতে ভালোবাসে সাদা বেড়ালটাকে। ওকে কোলে করে বেড়ায়, ওর সঙ্গে কথা বলে, ওকে বুকে করে রাতে ঘুমোয়। কতদিন ওটার জন্য কপাহীর গালাগাল শুনতে হয়েছে। এই দুটোকে নিয়েই সে পাগল। আর বেড়ালটাও কি কম— তাকে না দেখে একমুহূর্ত থাকতে পারে না। ম্যাওঁ, ম্যাওঁ করে সবজায়গায় খুঁজে বেড়ায়। তরার পাতের ভাতটুকু, মাছটুকু খেতে না পারলে পেট যেন ভরে না ওর। কখনো পায়ের কাছে ঘুর ঘুর করতে থাকলে বিরক্ত হয়ে কপাহী বেড়ালটাকে বলে— "আঃ জ্বালাস না, যা তোর মার কাছে যা। এক ঘায়ে মেরে ফেলব।"

শুনে তরা গজগজিয়ে ওঠে। তবু কপাহী বোঝে খালি বাড়িতে তরার বয়সের একটি মেয়ের পক্ষে দিন-রাত একা কাটানো মুখের কথা নয়। বেড়াল, শালিখের সঙ্গে খেলা-ধুলো করেই কাটাক।

কপাহী আর গুলচ কথাবার্তা বলছিল। তরা সাদা বেড়ালটাকে বুকে করে বেড়ার ওপাশে আড়িপেতে বসে রইল। সে আবার ওদের সঙ্গে কী কথা বলবে?

গুলচদের কথাও ফুরিয়ে এসেছিল। মাঝে-মাঝেই ওরা নীরব হয়ে পড়ছিল।

রাত হয়ে আসছে। বৃষ্টি তখনো থামেনি। কপাহীর কেমন যেন লাগছে, কেরাসিনটুকু খামোকা পুড়ছে। গুলচকে চুপচাপ থাকতে দেখে কপাহী বলল— 'অনেক রাত হলো। তুই এখন চলে যা,

যা। এত সব কথা এখনই ভাবার সময় হয় নি। সময়মতো যা হবার হবে। জমি বার করছিস, তা ভালোই করছিস। জমি-জমা বার করগে—যতখানি পারিস—"

—"ঠিকই", গুলচ বলল, তরা আর কপাহীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বৃষ্টির মধ্যেই সে বাড়িমুখো চলল। হাতে পিদিমটা নিয়ে দোরগোড়ায় খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কপাহী ওকে পথ দেখাল। ও রাস্তায় নেমে যাবার পর দরজাটা বন্ধ করে ভেতরে এল।

শুতে গিয়ে তরা বলল—"জমি বার করে আমাদেরও যদি দু-বিঘা মতো দেয়, ক্ষতি কি?"

—"জমি নাহয় বার করল, আমাদের এমনি দেবে কেন—" কপাহী বলল।

—"এমনি নেব কেন? ককাইটি জমি বার করবে, আর আমরা বোনাই-কাটাই করব। আধি বন্দোবস্তের মতো হবে।"

—"বীজ-বোনা, ফসল-কাটা এক কথা, আর ওর ঘরে থাকা আরেক কথা। তুই এ সব কথা বুঝবি না, ঘুমো এখন।"

তরা বলল—"আচ্ছা মাসী, আমার যে ধান-রোয়া আর কাপড়-বিক্রির টাকা ক'টা ছিল—"

—"কত আছে রে?"

—"সতেরো টাকা ছ' আনা—"

—"হুঁ, এই টাকা দিয়ে তোর জন্য একটা গয়না গড়াতে হবে। তোর হাতে টাকা আছে কাউকে যেন বলিস না।"

—"কেন, সেই টাকায় গুলচ ককাইটির কাছ থেকে খানিকটা নদীর পারের জমি কেনা যায় না?"

—"আচ্ছা এখন অনেক রাত হল, শুয়ে পড়—" বলে কপাহী তরার গা-মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

চার

মার তৈরি বাঁশের চুবড়িটার কানাগুলো বাঁধছিল গুলচ। মা এক গড়া ধানে ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছিল। বৃষ্টি থেমেছে। ঝকঝকে রোদে সকলেরই শরীর ও মন হাল্কা।

গুলচের মনে অনেক আনন্দের ঢেউ। বাড়ি এসেছে আজ তিনদিন। কাল-পরশুর মধ্যে আবার গামে চলে যাবে। আজ সুন্দর রোদ উঠেছে। রোদ উঠলে গুলচের মন নেচে ওঠে। যৌবনের সঙ্গে শ্রাবণের উজ্জ্বল রোদের একটা যেন গভীর সম্পর্ক।

এখন আর গোরু-ছাগলগুলোকে ছাড়া যায় না, অন্যের ধানক্ষেতে চলে যায়। ওরা বকাবকি করে। বকবে না কেন? গোরু ছাগলকে খাওয়াবার জন্য কি কেউ চাষ করে? কিন্তু গোরু-গাইগুলো কি কম? নিজেদের বাগানের ঘাস চোখে পড়ে না; অন্যলোকের বাগানের বেড়া ভেঙে ঘাস-পাতা না চিবোনো পর্যন্ত যেন ওদের শান্তি নেই। গৃহস্থকে পাগল করে তবে ওদের শান্তি।

আর এই দামড়া দুটোই বেশি উৎপাত করে। ওরা বেড়া-টেড়া কিছু মানে না। এক ধার থেকে সব মাড়িয়ে তছনছ করে ছাড়ে।

—"এই দামড়া জোড়াটা আমায় অস্থির করে ছাড়ল। তুই পারলে এদের নিয়ে যা। ওদের আমি আর কত পাহারা দেব? ছাড়া পেলেই কারো না কারো ধানক্ষেতে চলে যায়, না-হয় জঙ্গলের দিকে ছুট দেয়। সারাটা দিন ওদের পেছন পেছন দৌড়ে বেড়ানো আমার যেন একটা কাজ হয়েছে—" বেঁধে রাখা দামড়া দুটোর পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে মা বলল।

গুলচ দামড়া দুটোর দিকে একবার সস্নেহে তাকাল। সামনের বছর এদের কাজে লাগানো যাবে। আড়াই বছর বয়সে, দুটোর-ই গা মসৃণ, তেলতেলে।

কালো দামড়াটার কপালটা চুলকিয়ে দিয়ে মা বলল—"এই গোঁয়ারটাই বেশি জালাতন করে। ডাকলেও আসে না।"

তারপর লাল দামড়াটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল—"এটা ভালো, কথা শোনে, ডাক দিলেই ফিরে আসে। এটা—মানিকটা—"

সর্বদা হাত বুলিয়ে বুলিয়ে আদর করা হয় বলেই হয়তো ওরা সন্তানের মতোই; গুলচের মাকে একটুও ভয় পায় না। গুলচ বুঝতে পারে ছেলেপেলেহীন এই বাড়িটাতে গোরু-ছাগল ক'টাই মার সঙ্গী। ওদের গ্রামে নিয়ে গেলে মা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে। মাকে এভাবে শাস্তি দিতে চায় না।

সম্পত্তি বলতে অন্য আর কিছু নেই। হবে কোত্থেকে? বাপের সম্পত্তির কানাকড়িও পায়নি। চায়-ও নি। দিলে যে নেবে না তা-ও নয়। কিন্তু বাপের বেটা যদি হই সম্পত্তির ভাগ একদিন-না একদিন পাবই। কতদিন না দিয়ে থাকে দেখা যাক।

সম্পত্তি বলতে গোরু-ছাগল ক'টাই যা।

—"আজই কি চলে যাচ্ছিস?" মা শুধোল।

—"হুঁ—"

—"কাল গেলে হয় না?"

গুলচ মাথা তুলে চাইল।

—"কেন?"

—"তোর বাবার নাকি খুব জ্বর—" একটু ভয়ে একটু যেন গলা কেঁপে উঠল মার।

গুলচ ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল।

—"জ্বর? মরুক গে। আমি কি করব?"

—"একটা খবর করে আসতে দোষ কি?"

"তুই-ই যা, কার খবর নিস, নে গে যা। আমি যাব ও-বাড়িতে! আমি কুত্তা না, মানুষ।"

মা চুপ করে রইল। জোয়ান গুলচটাকে সে ভয় পায়। আজ সে-ই তার আশ্রয়। মা আর কিছু বলল না। বাপকা বেটা—এক কথার লোক।

দুপুরে ভাত খাওয়ার পর গোরুগুলোকে নিয়ে গুলচ বেরিয়ে গেল— পশ্চিমের জঙ্গলটার দিকে, একটু চরিয়ে আনতে। সারাক্ষণ দড়িতে বাঁধা থাকতে থাকতে গোরু ক'টার যেন দফারফা।

ধলা বকনাটা সভ্য গাভীন হয়েছে মনে হয়, অঘ্রাণ-পৌষ নাগাদ বিয়োবে। আহা, দুধটুকু আর নতুন ধানের চাল— কথাটা ভাবতেই যেন আনন্দ। নিজের বড়ো একটা জমি-জমা নেই। তা বলে, গাঁয়ের লোক হয়ে নতুন ধানের একমুঠো ভাত তৃপ্তি করে খাবে না?

নতুন ধান, নতুন দুধ— আর একটি নতুন ক'নে।

ঘাসের অভাব নেই! গোরুগুলো আপনমনে কচ্ কচ্ করে ঘাস চিবোচ্ছে। পেট ভরে খেতে পেলে ওরা অন্যের অনিষ্ট করবে কেন? আধ-পেটা থাকলে মানুষই স্থির থাকতে পারে না। গোরুগুলো আর মাথা তোলেনি। কড়া রোদ উঠেছিল। বৃষ্টির পরের রোদ। বটগাছটার শিকড়ের ওপরে বসে গুলচ একবার আকাশের দিকে অকারণে তাকায়। ফ্যাঁকড়া বার হওয়া বটগাছটার ছড়ানো ডাল-পালা আকাশটাকে ঢেকে রেখেছে। মাঝে মাঝে রোদের সাদা আলো ফসকে নিচে এসে পড়েছে! ছায়াটুকু মিষ্টি, রোদও মিষ্টি।

এই বটগাছটার সঙ্গে গুলচের আশৈশব পরিচয়। এরই আশ্রয় ছায়ায় বসে পাঁচ বছর বয়স থেকে গোরু চরাচ্ছে। এখন বড়ো হয়েছে, জোয়ান হয়েছে কিন্তু বটগাছটা ঠিক আগের মতোই আছে। শুধু আগের চাইতে গুঁড়িটা যেন একটু মোটা মনে হয়। ডাল-পালাগুলো আগের মতোই।

লালচে রঙের কচিপাতাগুলো ওর খুব ভালো লাগে। ছুঁচোল, ক্রমে সরু হয়ে আসা কচিপাতাগুলো। পাশে আর কয়েকটা বটগাছের চারা হয়েছে। নাগেশ্বরের চারাও। লকলকে চারাগুলো।

ঘন বটপাতাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে আকাশটাকে দেখা যাচ্ছে, গুলচের বড়ো ভালো লাগছে। বটের মোটা শিকড়টার ওপর চিত হয়ে শুয়ে চেয়ে রইল। বেলা একটু যেন পড়ে এল, কিন্তু রোদের ঝা-ঝাঁ এখনো কমে নি।

একা থাকা সত্ত্বেও ওর নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে না। নিজের সঙ্গেই কত কথা বলে গেল, অর্থহীন সব কথা।

গোরুগুলো আপন মনে চরে বেড়াচ্ছে। বনের ভেতর কি জানি কি একটা পাখি একটানা স্ুরে ডাকছিল। এই ডাকের সঙ্গেও ওর অনেকদিনের পরিচয়। গুলচেরও পাখিটাকে ডাকতে ইচ্ছে করল। পাখিটা কোথায়— সে এদিক ওদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। অন্য কোথাও, দূরে, দেখা যায় না।

একটু বাদে আচমকা একটু দূরে নাগেশ্বর গাছটার দিকে নজর পড়ল। ওটা মৌচাক না? —তাই তো! ওর মনটা নেচে উঠল। মাটি থেকে প্রায় বারো হাত ওপরে নাগেশ্বরের দুটো ডালের ফাঁকে একটা বড়ো মৌচাক। হাত দুয়েক লম্বা, ঝুলে আছে। কেউ বোধ হয় দেখেনি। নইলে এতদিনে কেটে নিয়ে যেত। বড়ো মৌচাক। ঠিকমতো কাটতে পারলে সাত-আট সের মধু পাওয়া যাবে।

আর ক'দিন পর পূর্ণিমা! গতরাতটা খুব অন্ধকার ছিল। এক নাগাড়ে বেশ কিছুক্ষণ সে মৌচাকটার দিকে চেয়ে রইল। একা কাটতে পারা যাবে না। গাছে ওঠায়, চাক কাটায় নেপালী পাড়ার ভীম উপযুক্ত লোক। ওর ভয়-ডর নেই। যা সরু, লম্বা গাছগুলোতে চড়ে ডাল কাটে!

ভীমের সঙ্গে দেখা করতে হবে। দুজনে মিলে পাড়বে। গুলচ থাকবে নিচে, আর ভীম ওপরে উঠে চাক কাটবে। এর মধ্যে কথাটা জানাজানি না হলেই রক্ষে। আজ সন্ধেবেলা ভীমের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। ওটা আবার একটা গাঁজাখোর— কোথায় যে কি করে বেড়ায় কে জানে?

গোরু গাইগুলোকে গুলচ জড়ো করল। বেলা পড়ে আসছে। চারদিকে মিষ্টি, নরম রোদ। আজ সন্ধেবেলা ভীমের সঙ্গে একটা ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে।

হঠাৎ পশ্চিমের আকাশের দিকে গুলচের নজর পড়ল। জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যাস্তের সোনালি দিগন্ত। কোন্ অদৃশ্য হাত যেন গলানো সোনায় আবির মেখে গাছপালায় চতুর্দিকে মুঠোয় মুঠোয় ছিটিয়ে দিয়েছে। বৃষ্টিস্নাত সবুজ গাছের পাতাগুলো চকচকে উজ্জ্বল। আকাশের বুকে ভাসমান মেঘগুলো হাজার রঙের ছোঁয়ায় বিচিত্র। গোরুগুলোর চোখগুলোও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গুলচ স্তব্ধ, অভিভূত হয়ে পড়ল, সবকিছু যেন ভুলে গেল।

বনের মধ্যে কোনোখানে জংলী ফুল ফুটেছে। দূর থেকে নাকে ভেসে আসছে তার গন্ধ। কিন্তু অপলক দৃষ্টিতে সে আকাশের দিকেই চেয়ে রইল— একদৃষ্টে। সন্ধেবেলার এই বর্ণালীর মহিমা ওর শৈশব, যৌবন, অতীত-ভবিষ্যৎকে একাকার করে ফেলল। ওর অন্তর ভরে উঠল। সুন্দরের মোহ ওর সব দীনতা মুছে দিয়ে গেল।

সজীব, প্রাচীন বনানী, তাজা নতুন আকাশ। নিজকে গুলচ এদেরই একটা অঙ্গ বলে ভাবে। এই আকাশ ও এই বনানীর উত্তাপ পেয়ে বড়ো হয়েছে। ওর রক্তবিন্দুতে এই প্রকৃতির নিবিড় নিশ্বাসের স্পন্দন।

সব-ই ওর আপন, প্রাণের জিনিস।

একটি আনন্দ-অধীর মন নিয়ে গোরু ক'টাকে তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ির দিকে সে পা বাড়াল। ভিজে মাটির ওপর ওর পদক্ষেপ চঞ্চল হয়ে উঠছিল।

হাতের লাঠিটা দিয়ে দু-ধারের গাছপাতাগুলোকে পেটাতে পেটাতে সে এগিয়ে যাচ্ছিল। মনটা ওর তাজা হয়ে উঠছে। একটা সোনালি আকাশ ওর বুকের ভেতরে বাসা করে নিয়েছে যেন।

ওদিক থেকে আসছিল কার্তিক। মুখোমুখি হল।

"গাম থেকে কবে এলি রে গুলচ ?"

কার্তিকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই বলল, "এই কার্তিক !"

"কী রে ?"

—"তুই গাছে উঠতে পারিস ? খুব উঁচু গাছ কিন্তু।"

কার্তিক পারে না।

"আচ্ছা যা তা হলে—"

কার্তিক চলে গেল।

একটু বাদে পজিরের সঙ্গে গুলচের দেখা। অন্যদিক থেকে আসছে। কাঁধে লাঙ্গল তৈরি করার প্রকাণ্ড এক টুকরো কাঠ।

—"লাঙ্গল ?"

—"হ্যাঁ-রে। ভদ্রেশ্বরের বনকাঠাল গাছটা কেটেছে। সেখানেই এটা পেলাম। দু-আনা পয়সা নিল।"

"গুলচ লাঙ্গলের কাঠটা ভালো করে দেখে বলল—"পূর্ণিমা কবে জানিস ?"

—"পূর্ণিমা! কি জানি, ছ-সাতদিন পরে হবে হয়তো। এ ক'দিন যা বৃষ্টি— জ্যোৎস্নারাত কি অন্ধকার রাত বোঝা যায় না।"

—"তাই তো, আচ্ছা যা—"

কিছুদূর গিয়ে পজির গুলচের দিকে ফিরে তাকিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল—"অনেকটা জমি নাকি বার করেছিস ?"

—"অনেকটা আর কই ? এই দু-এক টুকরো মতো আর কি।"

পজির চলে গেল।

এবার দেখা হল চন্দ্রর সঙ্গে।

চন্দ্রকে নতুন-ডালিম, পুরানো-ডালিম আর ওপারের-গ্রামের

সবাই চেনে। ওর ঠাকুরদা ছিল মোড়ল, নাম ছিল তার জীউরাম গাওঁবুড়া (মোড়ল)। অনেকে চন্দ্রকে গাওঁবুড়ার নাতি বলেই ডাকে।

চন্দ্রর বাবার একটু খরচের হাত। বাপের সম্পত্তি বেশিদিন রাখতে পারেনি। দিন দিন অবস্থা পড়ে আসছিল। তবু পাঠশালা পাস করার পর শহরে বাপের আমলের পরিচিত এক উকিলের বাড়ি চন্দ্রকে রেখে আসে। বাড়ির কাজকর্ম করবে আর হাইস্কুলে পড়বে। লেখাপড়ায় চন্দ্র নেহাত খারাপ ছিল না। কিন্তু ক্লাস সিক্সে ওঠার পর ওর বাবা আমাশায় মারা যায়। তারপর থেকে লেখাপড়া আর হল না। গ্রামের বাড়িতে ফিরে এসে চাষ-বাস শুরু করল।

লেখা-পড়া যদিও এই পর্যন্তই, ডালিমগ্রামের সে একজন বিদ্বান, হোমরা-চোমরা লোক বলে গণ্য। গ্রামের লোক তাকে নানা কথা জিজ্ঞেস করে, শলা-পরামর্শ নেয়, উপদেশ চায়। ছেলেটা সাহসী আর প্রাণ-খোলা। কাউকে ভয় পায় না, আপন-পর জ্ঞান নেই— সমস্ত গ্রামটাকে নিজের বাড়ি মনে করে।

অবশ্য মুখ চেয়ে কাউকে খাতির করার পাত্র সে নয়। যেটা উচিত মনে করে, ন্যায় বলে ভাবে, তার-ই সপক্ষে রায় দেয়। এইজন্য গ্রামের অনেকে তাকে ভয় পায়। তা বলে ওর শত্রু নেই। আজ পর্যন্ত কারুর অপকার করেনি।

চন্দ্র এখন জোয়ান, সুন্দর স্বাস্থ্যবান পুরুষ। বাড়িতে চাষ-বাস নিজের হাতে করে। মা ও বোন ধান বোনে, পাকা ধান কাটে। সে নিজে লাঙ্গল বায়, কোদাল চালায়। গ্রামের লোকেরা প্রয়োজনে তাকে সাহায্য করে, সে-ও করে। মুখে যেমন শলা-পরামর্শ দেয়, ট্যাঁকে পয়সাকড়ি থাকলে তা-ও

দরাজ হাতেই দেয়। গাঁয়ের মধ্যে এ কি আর খোয়া যাবে? চন্দ্রকে গাঁয়ের সবাই একটু ভয় পায়। মাঝে মাঝে শহরে যায়। কখনো কখনো নাকি হাকিমের মুখের দিকে তাকিয়েও কথা বলে। গাঁয়ের আশা-ভরসা। তবে ঝগড়া-ঝাঁটিও যে করে না এমন নয়। খুব কথা বলে। যদিও, ইংরিজি বেশি পড়েনি, মুখে ইংরিজি বুলি লেগেই আছে। গাঁয়ের ইংরিজি না-জানা ছেলে-মেয়েরা অবাক হয়। জুতো পড়ে না, কিন্তু প্যাণ্ট পড়ে— সস্তা মোটা কাপড়ের, আর পড়ে রঙচঙে ছবি-অলা হাওয়াই সার্ট। সমবয়েসীদের সঙ্গে কথা বলার সময় বাহাদুরি দেখিয়ে সমানে ইংরিজি ও অসমীয়া শব্দ ব্যবহার করে। বয়েস বছর কুড়ি। গাঁয়ের অনেক মেয়েকে ধমক দিয়ে নিজেও গালি-গালাজ খেয়েছে। এখনো বিয়ে-থা করেনি।

নানা উপায়ে চন্দ্র পয়সা রোজগার করে। বিপদে-আপদে ও প্রয়োজনে ও দু-চার টাকা ধারেও দেয়।

তবে, তার বদান্যতায় এমন একটা জিনিস আছে যা অযাচিতভাবে সবাইকে দেয়— সেটা ওর উপদেশ। যে-কোনো বিষয়ে ও সবাইকে সুন্দরভাবে উপদেশ দিতে পারে, দেয়ও। পয়সাকড়ি তেমন না থাকলেও মনটা ওর খুব বড়ো। কারো বেলায় কাজে লাগে, কারো বেলায় লাগে না।

এ ছাড়া আর তিনটে জিনিস সর্বদা ওর যেন হাতের কাছে। বিড়ি, নিকেলের ক্লিপ-আঁটা ছ-আনা দামের একটা ফাউনটেন পেন, আর ক্লিপ লাগানো একটা প্ল্যাস্টিকের চিরুনি। অসমীয়া ও ইংরেজিতে ও নিজের নাম সই করতে পারে— সুন্দর ক'রে।

ঘরমুখো গোরু আপনা থেকেই রাস্তা চিনে ফিরছিল।

চন্দ্রকে দেখে গুলচ দাঁড়াল। —"কোন্‌দিকে যাচ্ছিস রে চন্দ্র ?"

—"সোভান বরপাইর বাড়ির দিকে যাচ্ছি—"

"এই ভর সন্ধেবেলা বেরিয়েছিস যে বড়ো, দেখি একটা বিড়ি হবে ?"

—"হোয়াট ! ক'টা বিড়ি খাবি ! দেশলাই আছে ?"

—"দে দেখি, ও-বাড়ি থেকে জ্বালিয়ে আনি।"

বিড়ি একটা বের করে চন্দ্র গুলচকে দিল।

—"কোথায় গিয়েছিলি ?"

—"গোরুগুলোকে একটু চরিয়ে আনলাম। বিড়িটা জ্বালিয়ে আনছি, বোস।"

পাশেই একজনের বাড়ি থেকে গুলচ বিড়িটা জ্বালিয়ে আনল। ইতিমধ্যে পকেট থেকে চিরুনিটা বের করে চন্দ্র চুল আঁচড়ানোয় মন দিল।

গুলচের বিড়ি থেকে নিজেরটাও ধরাল। —"নিউজ্‌টা পেয়েছিস ?"

মাথা তুলে গুলচ চন্দ্রর দিকে চাইল।

—"কি ?"

—"চেনিমাইর বিয়ে ঠিক হয়েছে জানিস না ? ওপারের গ্রামে নাকি একজন কেণ্ডিডেট বেরিয়েছে। ব্যাটার সাহস দেখেছিস ?"

চন্দ্রর কথা ঠিকমতো বুঝতে না পেরে গুলচ শুধোল, "কি করে জানলি ?"

"আই নো এভরিথিং। কি ভাবিস ? তুই একবার বললে আমি ওকে ঠিক বানাতে পারি। চেনিমাইর বাবা কি তোকে কম ইনসাল্ট করেছে ?"

—"ও-সব কিছু করিস না কেমন ? যার যাকে খুশি বিয়ে করুক। একবার মেয়েটাকে এনে যা হবার হয়ে গেছে।"

—"তুই একটা বুজরুক। আমি হলে ওকে ছেড়ে দিতাম নাকি? হোয়াট-এভার রেজাল্ট আমি সবাইকে সমান করে ছাড়তাম। তোদের বুড়োটাও কি কম বজ্জাত।"

বাপের নামে এভাবে বলাটা গুলচ পছন্দ করল না। সে চুপ করে রইল।

—"তুই কি ম্যারেজ করবি না?" চন্দ্র জিজ্ঞেস করল।

—"এক্ষুণি আর করি কি করে? বাড়ি-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি তো কিছু নেই।"

—"মার গুলি বাড়ি-ঘর! বিউটিফুল দেখে মেয়ে একটা পছন্দ কর দেখি। তারপর আমায় পয়েন্ট-আউট করে দে। সব ঠিক করে দেব—ইউ সী…"

—একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে গুলচ বলল— "আচ্ছা, তরাকে তুই কেমন দেখিস?"

—"তরা, কোথাকার তরা? কপাহী পিসির মেয়ে? বিউটিফুল! তা এদ্দিন চুপ করে ছিলি কেন? আরে, মাসীটাই তো বিউটিফুল হয়ে আছে। একেবারে ইয়ং গার্লের মতো।"

একটু মিনতিভরা সুরে গুলচ বলল—"কথাটা ভাই কাউকে যেন বলিস না, তোকে বলেই বললাম। আমিও মনে মনে ভেবে রেখেছি। তা ছাড়া কিছু ব্যবস্থা না করে—"

—"মার গুলি। এভরিথিং হয়ে যাবে। আই [illegible] হেল্প ইউ। নে, আরেকটা বিড়ি খা। আমি এবার চলি। নো টাইম। সব ঠিক করে দেব—যা।"

উল্লসিত হয়ে চন্দ্র চলে গেল। গুলচও পা বাড়াল। ওরও মনে আনন্দ। হাতের মুঠোয় বিড়িটা নিয়ে সে বাড়ি এসে পৌঁছল।

পর পর দুটো বিড়ি পেয়েছে বলেই সে একসঙ্গে খেয়ে শেষ করবে এটা ঠিক নয়। অন্য বিড়িটা রাতে খাওয়ার পর খাবে।

আকাশে মেঘ হাল্কা হয়ে এসেছিল। জ্যোৎস্না উঠেছে। আর দু-একদিনের মধ্যেই পূর্ণিমা। পামে দুটো দিন পরে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই। মৌচাকটা ফেলে যাওয়া যায় না।

ভাত খেয়ে সে-রাত্রেই গুলচ ভীমের বাড়ি গেল। হিসেব করে ভীম বলল— "আর তিনদিন পরে পূর্ণিমা। তবে পরশু গেলেও মধু পাওয়া যাবে। কোথায় আছে?"

—"গেলেই দেখবি। বড়ো জাতের মৌমাছি, বুঝলি ভীম? তা হলে চ' পরশুই যাই।"

ভীমের সঙ্গে ব্যবস্থা পাকা করে ফেলল। আর কাউকে সঙ্গে নেবে না। রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে দুজনে যাবে। সাথে দুটো মাটির কলস নেবে, মই না নিলেও চলবে। দুজনের হাতে থাকবে দুটো দা। বাঘ-টাঘ বেরুতে পারে, তা ছাড়া রাত-বিরেতের কথা।

নেপালীপাড়া থেকে গুলচ সোজা বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ ওর তরাকে একবার দেখার বড়ো ইচ্ছে হল। গেলে কপাহীটা আবার ঘুরঘুর করবে। গুলচের কাছ থেকে সে তরাকে আগলে রাখে। ওর মনের ভাব কপাহী হয়তো আঁচ করতে পেরেছে।

—"বাইটি, শুয়ে পড়লি নাকি?" দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ও একটু চাপা স্বরে ডাকল।

—"হুঁ, কে রে?" আধো-আধো ঘুম থেকে জেগে কপাহী উত্তর দিল।

—"আমি। ঘুমোচ্ছিস যদি ঘুমিয়ে থাক্, আর উঠতে হবে না। অনেক রাত হয়েছে।"

কপাহী দরজা খুলে দিল। ঘুমোচ্ছিল।

—"আয়, ভেতরে আয়—কোত্থেকে এলি এত রাত করে?"

—"এই একটু এদিকে গিয়েছিলাম।" গুলচ বলল।

কপাহী দরজাটা ঠেকা দিয়ে বন্ধ করে দিল।

—"আমি আবার ভাবলাম চলেই গেলি বুঝি। এই ক'দিনের মধ্যে তো একটি বারের জন্যেও এলি না।"

কুপিটায় একটু ঝাঁকা দিয়ে কপাহী বলল—"তেল একটুও নেই বোধ হয়।"

গুলচ শুধোল—"ওরা কোথায়? ঘুমোচ্ছে বুঝি?"

—"কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেমানুষ, বিছানায় পড়লেই ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। আমাদের মতো কি আর— সংসারের হাজারটা চিন্তা, ঘুম আসতেই চায় না।"

কুপিটার আলো কমে আসছিল। গুলচ একবার কপাহীর দিকে চেয়ে বলল—"এমনি ঢুকলাম, শো গিয়ে বাইটি, আমি চলি—"

—"এক্ষুণি যাবি? বস না একটু, তাম্বুল খাবি না?"

—"এখন থাক্, খাব না—"

গুলচ উঠে দাঁড়াল।

—"তা হলে যা। গামে কবে যাচ্ছিস?"

—"তরশু নাগাদ যেতে পারি। কেন?"

—"পরশু অবধি তা হলে আছিস।"

—"হ্যাঁ—"

—"পারলে পরশু রাতে একবার আসিস। তোর সঙ্গে একটু কথা আছে।"

—"পারলে আসব। তবে তাড়াতাড়ি বোধ হয় আসা হবে না।"

—কোথাও যাচ্ছিস ?”

মৌচাকের গোপন ব্যবস্থার কথাটা কপাহীকে না বলাই ঠিক মনে করল।

একটু ভেবে বলল, “আমাদের ওপর সকলেরই চোখ— জানিস-ই তো। ঘন ঘন আসতে দেখলে কে কী বলে ঠিক নেই।”

দরজার কাছে এসে কপাহী বলল - “পরশু তরাকে ওর মামা ডেকেছে। আমি একা থাকব। আসিস কিন্তু। একলা থাকতে আমার ভয় করে—”

—“আচ্ছা বাইটি আসব। এখন যাই।”

গুলচ ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কপাহী দরজাটা বন্ধ করে ভেতরে এল।

পথে এসে গুলচ চাঁদের দিকে তাকাল। পরশু ত্রয়োদশীর না চতুর্দশীর পূর্ণিমা ? বড়ো সুন্দর চাঁদটা। মনটা হাল্কা হয়ে যায়।

পরশু আবার মৌচাক ভেঙে সবকিছু গুছিয়ে কপাহীর বাড়ি আসতে হবে। কত রাত হবে কে জানে ?

তরা আবার সেদিন বাড়ি থাকবে না। তরাটা না থাকলে আসতে ভালো লাগে না। বড়ো সুন্দর হয়েছে মেয়েটা। চেনিমাইর চেয়ে তরা বেশি সুন্দরী। গাঁয়ের কেউ এখন চুরি করে নিয়ে না গেলেই হয়েছে। মা-মরা মেয়ে—সে যদি নিজেই পালিয়ে যায়, কপাহী বাইটিই বা কি করতে পারবে ? চন্দ্রকে দিয়ে কথাটা তাড়াতাড়ি পাড়তে হবে। লজ্জা করার কি আছে। সুযোগ পেলে আমিই সরাসরি কথাটা তুলব। দুজনকেই গামে নিয়ে যাব। মাকেও নেব। জল কেটে আর একটু বেশি জমি বের করতে পারলে, আর একজোড়া বলদ পেলে, তিনজন রোয়নী

চার-ছ পুরা জমির ধান সহজে বোনা-কাটা করতে পারবে। হয়তো তরার কপাল-জোরে আমার আর মা-র ভাগ্য খুলবে।

চন্দ্রর আর বলতে হবে না, আমি নিজেই বলব। চেনিমাইকে বিয়ে দিক, আমিও তরাকে বিয়ে করব। তরার কাছে চেনিমাই কি? তরাকে ছেলের বউ করে আনতে পেলে মা-ও সুখী হবে। এখন তরা অমত না করলেই হয়।

পাঁচ

"কে?" ক্যাঁচ করে দরজা খোলার শব্দ শুনে গুলচের মা সাড়া দিল।

—"আমি, মা ঘুমিয়ে পড়লি নাকি। দেখি পিদিমটা একটু জ্বালা তো।"

মা বিছানা থেকে উঠে এল।

—"এই রাত দুপুর পর্যন্ত কোথায় ছিলি? আবার রাত-বেড়ানোতে পেয়েছে নাকি?"

প্রদীপটা জ্বেলে মা বেরিয়ে এল।

—"বেড়াতে যাইনি। ভীমের কাছে গিয়েছিলাম।"

তারপর সে মাকে মৌচাক ভাঙার পুরো ব্যবস্থাটার কথা বলল। শুনে মা খুশি।

—"আমি আবার ভাবলাম বাপের খবর নিতে গিয়েছিলি বুঝি।"

গুলচ গজগজিয়ে উঠল। —"ওসব কথা আমায় বলিস না। যে মরতে বসেছে মরুক। তোর যদি এতই দেখার ইচ্ছে, যা একবার দেখে আয় গিয়ে। তোদের কি লজ্জাশরম আছে?"

মা-ও কিচিমিচি করে উঠল। —"আমার যেন ভারি গরজ। পাটরাণী আছে, ছেলের বউ আছে। তোলা-তোলা করে ওরাই দেখাশোনা করুক। মরার সময় কে একফোঁটা জল মুখে দেয়, দেখে নেব।"

মায়ের কথা শুনে গুলচের ভালো লাগল। ওর মতো মা-ও এককথার লোক।

—"আচ্ছা অনেক রাত হল, এখন শুয়ে পড়-গে যা। চেঁচা-মেচি করতে হবে না।" গুলচ বলল।

—"তুই বললেই হল? একবার রাতে বেরিয়ে একটিকে এনে মজা পাসনি। লজ্জাশরম নেই। ভীমের বাড়ি যাস আর যেখানেই যাস, বেলা থাকতে থাকতে যাস। গাঁয়ের লোকের আর কাজ কি? কে কোথায় গেল, কে কার দিকে তাকাল—এসব খবর রাখাই একমাত্র কাজ। শত্রুর মুখে ছাই দিতে হয়।"

—"আমি পামেই চলে যাব ঠিক করেছি। আগে বাড়িটা করে নিই, তোকেও সেখানে নিয়ে যাব—"

মা ওর মুখের দিকে তাকাল। —"মস্করা করিস না বাবা। জয়-জননী গ্রাম ছেড়ে তোর ওপারের পামে না গেলেই হয়েছে আর কি। মরলে এখানেই মরব। গ্রামের বাইরে যাব কেন?" মা জোর দিয়ে বলল।

—"ওখানে কি আর কেউ নেই? একটু বেশি করে জমি বের করতে পারলে, এখান থেকে ওখানেই বেশি সুখে দুটো খেতে-পরতে পারব।"

—"সুখটা রেখে দে। স্থান ছাড়লে মান ছাড়তে হয়। নিজের গাঁয়ে কুঁড়ে ঘরে থেকে ভিক্ষে করে খাব। তা বলে এখান থেকে চলেই যাব? তুই যা করিস করতে থাক গে। আমায় ওসব কথা আর শোনাস না।"

মার কথা শুনে গুলচ একটু ভয় পেল। মার একটা কথাও মিছে নয়। সোজা কথায় মাকে ভোলানো যাবে না।

বাটা থেকে তাম্বুল একটা নিয়ে মুখে পুরে সে জামার পকেট হাতড়ে পাওয়া আধপোড়া বিড়িটা জ্বালাল।

মা বলল— "পামে বাড়ি-ঘর করতে হবে না। পারিস যদি এখানেই ভালো দেখে একটুকরো জায়গা-জমি নিয়ে ভালো করে একটা বাড়ি তৈরি কর। জল-পড়া ঘরে আর কদিন থাকব?"

গুলচ চুপ করে রইল। জোয়ান হলেও অন্যদের মতো একনাগাড়ে ও কাজ করতে পারে না। ওর মনটা বড়ো নরম। সুন্দর জংলী পাতা একটা দেখলেও সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কাজকর্ম ভুলে যায়। আকাশের একটুকরো মেঘের দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে খাওয়া-দাওয়া ভুলে যায়, বন-জঙ্গলে পাখির ডাক শুনে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। একাগ্রভাবে কোনো কাজে লেগে থাকতে পারে না। মা যা-ই বলুক, পামেই একটা ভালো দেখে বাড়ি করতে হবে —নদীর পাড়ে সুন্দর ছিমছাম একটা বাড়ি। তরার জন্য। ছেলের বউয়ের সেবা-যত্ন পেলে মার রাগ পড়বে। এখন তরা একটু খাতির করতে জানলেই হয়।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে মা একটু নিচু সুরে বলল, যেন নিজেকেই বলছে— "সমবয়েসীরা সবাই বিয়ে-থা করে ছেলের বাপ হল।

গা ভাসিয়ে বেড়ালে সংসার হবে কি করে? মন স্থির করলে তবে তো হবে। তুই হলি পাড়া-বেড়ানো বংশের ছেলে। আস্ত একটা জোয়ান ছেলে, ঘর-বাড়ির দিকে নজর নেই। টই-টই করে ঘুরে বেড়ালে কি বাড়ি হবে, ঘর হবে, ভাত-কাপড় হবে!"

বিড়িটাতে শেষ টান দিয়ে গুলচ বলল— "ঘুরে না বেড়িয়ে ঘরে বসে তোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে কি পেট ভরবে? তুই না গেলি, আমি পামেই বাড়ি-ঘর করব। যা হয় হবে।"

মা আর কিছু বলল না। কিছুক্ষণ বাদে মা ঘুমিয়ে পড়ল।

পাটি-টা মেঝেতে বিছিয়ে তেলছিটে ছোট বালিশটায় মাথা রেখে গুলচ সটান হয়ে শুয়ে পড়ল। চোখের দুপাতা লাগেনি। ওপরে ঝুল-ভরা চালটার দিকে তাকিয়ে ভাবল, এইভাবে আর বেশিদিন কাটানো যাবে না। কপাহী যদি তরাকে দেবনা-থোবনা করে, তরাকে চুরি করেই নিয়ে আসতে হবে। চন্দ্রর কাছে একটু শলা-পরামর্শ নিতে হবে। কপাহীর এত বদনাম, তরার কি আর নিজের মা আছে? অন্য কে আছে যে তরাকে বিয়ে করবে? পামের বাড়িটা ভালো করে তৈরি করে নি। পালিয়ে যেতে হলে পামেই নেব। সেখানে চট করে কেউ খুঁজেও পাবে না। তা ছাড়া নিয়ে যাওয়ার পর তরাকে আর কে খুঁজে বেড়াবে?

তেল না-থাকা প্রদীপটার আলো ক্ষীণ হতে হতে একসময়ে নিবে গেল। ঘরের চালের ফুটো দিয়ে ফসকে আসা জ্যোৎস্নার একটা সাদা রেখা ওর বালিশের ওপর পড়ছিল। কিছুক্ষণ ও সেদিকে চেয়ে রইল। একটুও না-কেঁপে জ্যোৎস্নার আলোটুকু ভেতরে ঢুকে এসেছে। ও হাত বাড়িয়ে দিল। ওর হাতের তেলো ভরে পড়ল সাদা জোছ্না…।

ছয়

ডালিম গ্রামের সফিয়ত বেশ অবস্থাপন্ন লোক। রোপা ধানের জমিই এগারোপুরা। ওপারের-গ্রামে সাতপুরা মতো রবিশস্যের জমি আছে। আঠারো বছর বয়সে বিয়ে করেছিল, এখন আটষট্টি। এখনো অটুট স্বাস্থ্য।

সফি বুড়োর পাঁচ মেয়ে, অনেকদিন আগেই সকলের বিয়ে-থা হয়ে গেছে, নাতি-নাতনীও হয়েছে। ছেলে দুটো— মেয়েদের চাইতে ছোটো। বড়ো ছেলে রফিয়ত। রফিয়তের-ও বছর কয়েক আগে বিয়ে হয়েছে। দুটি মেয়েও হয়েছে। ছোটো ছেলের এখনো বিয়ে হয় নি। বত্রিশ পার হয়েছে।

বিয়ে না হওয়ার কারণ অনেক।

ওর নাম বফি। বফি বামন, সারে তিন ফুটের মতো লম্বা। একটা চোখ জন্মাবধি কানা। বাঁ হাতের দুটো আঙুলে একটা করে গাঁট নেই। তা ছাড়া ওর মুখটাও একটু কদাকার, ওপর পাটির সবগুলো দাঁত এমনভাবে বেরিয়ে এসেছে দেখলে মনে হয় সর্বক্ষণ বুঝি হাসছে।

বফি একটু বোকা-ও। বুদ্ধি অল্প-স্বল্প যা ছিল, গাঁয়ের সবাই মিলে, ‘হাবা’ বলে ক্ষ্যাপাতে ক্ষ্যাপাতে সত্যিসত্যিই হাবাগোবা করে ফেলেছে।

বফির জন্য সফি বুড়োর মনে বিশেষ দুঃখ না থাকলেও, চিন্তা অনেক। ওর বিয়ের চিন্তাই প্রধান। গ্রামে খোঁড়া, কানা, ল্যাংড়া কেউ বিয়ে না করে থাকে না। বিয়ে করাটা সুন্নত, অবশ্য-পালনীয় ধর্ম। বিয়ের পরিণাম যাই হোক-না কেন, বিয়ে না করাটা গুণাহের কথা, পাপের কথা।

সফি বুড়োর ধারণা, ছোটো ছেলেটার বিয়ে না দিতে পারলে পিতার কর্তব্য অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যেখান-সেখান থেকে হোক মেয়ে একটা আনতেই হবে।

তবে মুখে যেখান-সেখান থেকে বললেও, যেখান-সেখান থেকে আনলেই চলবে না। সফিয়তের পুত্রবধূ রূপে-গুণে দশজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, তবে না! হাবাগোবা হলেও, বফি তো সফির-ই ছেলে!

সেই মেয়ে হল কপাহীর বোন-ঝি তরা।

কপাহীর বদনামের কাহিনী অনেক পুরানো হয়ে গেছে। তা ছাড়া সফিয়তের ছেলের বউয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে দু-কথা বলবে এমন লোক গাঁয়ে বড়ো বেশি নেই। আছে একমাত্র সেই হাড়-নচ্ছাড় চন্দ্রটা। ওকে নিয়ে একটু যা ভয়। ওর আবার হিন্দু-মুসলমান, ঠাকুর-দেবতা নেই।

কপাহী আর তরা সফির জমিতেই চারাধান বোনে, ফসল কাটে। কপাহী ধান ভানে, জলও এনে দেয়। বফি তরাকে দেখেছে, তরা ওকে ককাইটি বলেই ডাকে। বফি দেখতে 'তেমন সুন্দর' নয়। তা বলে সে কি আর পুরুষমানুষ না?

বছর দশেক আগে কপাহীকে দেখে সফিরই লোভ হয়েছিল। ওর মনের ভাব কপাহী যাতে বুঝতে পারে অমন করে দরদ

দেখাত। নিজে ওর বাড়ি গিয়ে খোঁজ-খবর করে আসত। কিন্তু একদিন সন্ধেবেলা কপাহীর বাড়ি গিয়ে দেখে তার ছেলে রফি কপাহীর সঙ্গে বসে আড্ডা মারছে। সেদিন থেকে কপাহীর সঙ্গে নিজের মনোভাব পালটে ফেলল। নিজের মান-ইজ্জত কি করে বাঁচাতে হয় সফিয়ত জানে।

পরের দিনই রফিকে সাবধান করে দেয়— রাত-বিরেতে কপাহীর বাড়ি আড্ডা মারতে দেখলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। রফি বাপকে সাক্ষাৎ বাঘের মতো ভয় করে। কপাহীকে আর পিসির সম্মান হারাতে হল না।

বফির জন্য বুড়ো দু-এক জায়গায় পাত্রী দেখছিল, কেউ নাম-ই শুনতে চায় না। দু-একজন আবার গালি-গালাজ দিয়ে শক্ত কথাই শুনিয়ে দিয়েছে। এই কানাটার সঙ্গে বিয়ে দেবার চেয়ে বরং কেটে চাঙারিতে বেঁধে ধনশিরিতে ভাসিয়ে দেব। সফিয়তের ছেলের সঙ্গে বিয়ে না হলে আমাদের মেয়ে যদি না খেতে পেয়ে মরে তো মরুক।

সফিয়তের চৈতন্য হল: ছেলে দেখে মেয়ে আনতে হয়। এই বুদ্ধুটার জন্য যদি ভালো ঘরের মেয়ে আনা সম্ভবও হয় তো সেই মেয়ের হাতে এটাকে নাকানি-চোবানি খেতে হবে। আজ কিছুদিন হয় বুড়োর চোখ পড়েছে তরার ওপর। তরা সফিয়তের ছেলের বউ হবারই যোগ্য মেয়ে। না দেবার কোনো কারণ নেই। কপাহীর মতো হা-ঘরের মেয়ে সফির কথা অগ্রাহ্য করার সাহস পাবে না। হয়তো সৌভাগ্য বলেই মনে করবে। কপাহীর কেচ্ছার কথা কে না জানে?

গাঁয়ে অবশ্য সফিয়তের বিষয়ে নানা কথা রটেছে। সফিয়ত

হাড়-কিপটে, সুদখোর আর এই রকম নানা অপযশ, নানা অপবাদ। কয়েকটা কথা প্রায় কিংবদন্তির মতো হয়ে গেছে।

নিজের বিয়েতে সফিয়ত দুটাকা বারো আনায় 'গোলা'র কোম্পানি থেকে চামড়ার একজোড়া কালো জুতো কিনেছিল। সে প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা। জুতো-জোড়া এখনো ঠিক আগের মতোই রয়েছে। ন্যাকড়ায় জড়িয়ে তাকের ওপর তুলে রেখেছে। গাঁয়ে কারো বিয়েতে আর ঈদ-বকরিদের সময় এক-আধ ঘণ্টা পায়ে দেয়। ফিরে এসে মুছে-টুছে আবার তাকে তুলে রাখে। রফি নাকি ওর বিয়েতে একজোড়া নতুন জুতো কিনতে চেয়েছিল। বুড়ো মুখ ঝামটা দিয়ে বলেছিল— "বাড়িতে একজোড়া জুতো আছে, সেটা দিয়েই চলবে। জোড়ায় জোড়ায় জুতো যে কিনবি, বলি সিন্দুক ভরে কি টাকা রেখেছিস ?"

বাপের জুতো পায়ে দিয়ে হাতির পিঠে বসে রফি বর সেজে গিয়েছিল বিয়ে করতে।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ, সফিয়তের কোট : পনেরো বছর আগে জমি সংক্রান্ত কি এক মোকদ্দমা বেধেছিল। সেই মোকদ্দমায় জিতে একটাকা ছ'আনায় নীলামে একটা লাল রঙের গরম কোট কিনেছিল। গায়ে ঠিকই হয়, সামান্য ঢিলে। বাড়ি থেকে বেরলেই কুর্তা বা গেঞ্জীর ওপর সফিয়ত এই কোটটা পরে— পৌষেও— জ্যৈষ্ঠেও। জামা তো পরার জন্যই কেনা। শীত-গ্রীষ্মের সঙ্গে জামার কি সম্পর্ক ?

লাল রঙের কোটটা পরলে বুড়োকে সুন্দর মানায়।

বুড়োর দাঁত পড়ে নি, মুখটাও ভরাট। বুক অবধি লম্বা পাকা দাড়ি ক'গাছা নিয়ে বুড়ো এখনো সাতজনের মধ্যে

দর্শনীয়। গরমের দিনে এই জামাটা পরলে একটু ঘেমে যায় ঠিকই, কিন্তু জামাটার জন্যই যে ঘামছে তার কি কোনো মানে আছে।

তৃতীয় প্রসঙ্গ, সফিয়ত বুড়োর কুকুরের পাল : গ্রামের লোকেরা যতদূর মনে করতে পারে সেই কবে থেকে সফিয়তের বাড়িতে এক পাল কুকুর। খুব তেজী কুকুরগুলো। বাচ্চা হলে কাউকে দেয় না— পাছে বিছন চলে যায়। চোর-ছেঁচড়রা কখনো এমুখো হতে সাহস পায় না। কুকুর তো নয়, যেন বাঘ। কুকুরগুলোকে বুড়ো খুব আদর করে। নিজের পাত থেকে দুটো ভাত কুকুরদের না দিলে যেন পেট-ই ভরে না। কুকুরগুলোও বুড়োকে মানে। কোনোখানে গেলে দুটো কুকুর সঙ্গে যাবেই। বুড়ো কিন্তু হাত দিয়ে কুকুরকে ছোঁয় না। কুকুর নাপাক— অপবিত্র। কুকুরকে ছুঁলে ওজু ভেঙে যায়, নমাজ পড়া যায় না। কিন্তু গাঁয়ে ভোজ বা বিয়ে-থা হলে গৃহস্থের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে পুঁটুলী বেঁধে কুকুরের জন্য ভাত মাংস নিয়ে এসে নিজ হাতে খাওয়ায়। নাতি-নাতনীদেরও বুড়ো এত আদর করে না!

চতুর্থ প্রসঙ্গ, সফিয়তের বাগানের মিষ্টি আম : কয়েকটা গাছ সফির বাবার পোঁতা। কয়েকটা বুড়ো নিজহাতে পুঁতেছিল। ভালো আম রসালো, বালি বালি স্বাদ। কাঁচামিঠেও আছে, পাকাও। বুড়োর বাগানের মতো এত ভালো আম ডালিম-গ্রামে আর মাত্র দু-এক ঘরে হয়।

আমের মরশুমে বাড়িতে কেউ এলে বুড়ো অবশ্য গাছের আম খেতে দেয়, কিন্তু খাওয়ার সময়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে— আঁটিটা যেন আবার কেউ নিয়ে না যায়। আঁটি গেলে বিছন যাবে। ভাত

খেতে দেয়া যায়, তা বলে আঙুল কি দেয়া যায়? বীজ দিয়ো না, বীজ যাওয়া মানে লক্ষ্মী যাওয়া।

অবশ্য আর কারো বাড়িতে ভালো কোনো গাছের চারা বা বিচি পেলে যে-কোনো উপায়ে বুড়ো সেটা নিয়ে আসবেই। তা আম, কাঁঠাল, ডালিম বা পানীয়াল-ই হোক। এনে মাটিতে কোনোরকমে গুঁজে রাখে। আর বুড়োর হাতটাও লক্ষ্মী, শক্ত মাটিতে পুঁতে রাখলেও সেখান থেকে লকলকে চারাগাছ গজায়।

বিয়ের আগে দাড়ি রাখবে না বলে রফি নাকি বাপের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছিল। কিন্তু সফি বুড়োর এক ধমকে ওর মুখ দাড়িতে ভরে গেল।

রোজ রোজ দাড়ি কামিয়ে মাকুন্দ চোপা হতে লজ্জা করে না? তা ছাড়া রোজগার করিস কত টাকা? ক্ষুরের দামই দুটাকা, চলবে ক' বছর? রোজ দাড়ি কামালে দু'টাকা দামের ক্ষুরটা বড়জোর তিনবছর চলবে। তারপর যা 'গোলা'য়— শান দিতে, লাগুক দু-আনা, অত খরচ করা চলবে না বাপু। দাড়ি রাখ— আল্লার নূর।"

বর সেজে যাওয়ার সময় রফি কাঁচি দিয়ে দাড়ি ছেঁটে গিয়েছিল, ক্ষুর লাগায় নি।

ডালিমগ্রামে অবশ্য নাপিত নেই। সারাটা গ্রামে মাত্র পাঁচটা কাঁচি। এর মধ্যে কনবাপ দর্জিরটাই ভালো, ধারালো। তবে সেটা দিয়ে কাপড় কাটে, চুল কাটতে দেয় না। কালেভদ্রে কখনো চুরি করে এনে দু-চারজনে চুল ছাঁটে। গাঁয়ের প্রায় প্রত্যেকটি জোয়ান ছেলে চুল ছাঁটতে জানে। এদের মধ্যে দু-একটির বেশ নাম-ডাক। বড়ো সুন্দর ছাঁট দেয়।

এক বাড়ির কাঁচি, এক বাড়ির চিরুনি, আর এক বাড়ির ক্ষুর ; অন্য এক বাড়ির উঠোন অথবা বেড়া-হীন মাড়ল ঘরের মণ্ডপ। যে ছেলেরা ভালো চুল ছাঁটতে জানে তাদের গাঁয়ে কদর। অবশ্য দাড়ি-চুল কাটে শুধু মাঘ-ফাগুন-চৈত্র আর আশ্বিন-কার্তিকে। সাধারণত চাষের মরশুমে দেড়-দুমাস দাড়ি-চুল না কাটা কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। জোয়ান ছেলের মুখে দাড়ি, অবাক হবার মতো এমন কিছু নয়।

কপাহী যে তরার জন্য গাঁয়ের দু-চারটে ছেলের ওপর নজর রাখে নি তা নয়। দু-চারজন লুকিয়ে লুকিয়ে কপাহীর বাড়িতে তাম্বুল বা চা-জলখাবার যে খেয়ে যায় না, তা-ও নয়। কিন্তু কপাহী চালাক। কাউকে প্রশ্রয় দেয় নি, কথাও দেয় নি।

তরার মন সে বুঝতে পারে নি। যুবতী মেয়ের মন সহজে বোঝা ভার। সফিয়তকে কপাহী ভালো করেই জানে। আগে সফি ওকে দরদ দেখাত, ভালোবাসতে চেয়েছিল কপাহীকে। এখন ভালোবাসে তরাকে। নিজের জন্য যে নয়, কপাহী তাও বোঝে। কোনো ভালো ছেলেকে পাকড়াও করতে না পারলে অগত্যা যদি বফিকেই মেয়ে দিতে হয়— কপাহী খুশি না হলেও বেশি আক্ষেপ করবে না। সফিয়তের বাড়িতে তরা সুখে থাকবে। অবশ্য বফিকে তরার সঙ্গে যে মানায় না, এ-কথা কপাহীও বোঝে। কিন্তু গরিবের কি আর অত-শত চিন্তা করলে চলে ? ছেলে হলে আনে, মেয়ে হলে দেয়।

মাঝে মাঝে এটা-সেটা নিয়ে বা এটা-ওটা চেয়ে কপাহীদের বাড়িতে বফিকে ওর বাবা পাঠায়। বফিকে দেখলেই তরা পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যায়। তাম্বুল-পান দিয়ে কপাহী

ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ দরকারী-অদরকারী কথা বলে। ও চলে গেলে গজর গজর করে তরা বলে, "ওটাকে দুচক্ষে দেখতে পারি না। কেমন করে দাঁত বের করে হাসতে থাকে।"

কপাহী কিছু বলে না।

মেয়ের ভাগ্য আর গভীর জলে বড়শি ফেলা এক-ই কথা। কী জুটবে বলা যায় না।

অবশ্য তরা বোঝে যে ওকে দেখতেই মাঝে মাঝে বফি এ-বাড়িতে আসে। ওর ভীষণ রাগ হয়। কিন্তু গুলচ এলে তো ওর রাগ হয় না। বরং ভালোই লাগে। গুলচ বেশি কথা বলে না, বেশিক্ষণ বসে না, বেশি মাখামাখি করে না, সে-ই তো মানুষ। গরিব—তবে গাঁয়ে ধনী আর ক' ঘর? সবাই তো গরিব। জোয়ান ছেলে ওপারের জঙ্গল কেটে জমি বের করছে, বাড়ি-ঘর করবে। সারাটা জীবন কি আর গরিব হয়ে থাকবে? একদিন গুলচও ধনী হবে।

—এই এটাকে, এই উজবুকটাকে, দুচক্ষে দেখতে পারি না।

কপাহীর মনের কথা তরাও বোঝে না। তবে কপাহীকে দেখলে মনে হয় সব সময় কি যেন চিন্তা করছে। যেন কাউকে কিছু করার জন্য সুযোগ নিয়ে আছে।

হয়তো কপাহী তার নিজের মনের কথা নিজেই ভালো করে বুঝে উঠতে পারে না। বেশি ভাবতেও জানে না। ভাত-কাপড়ের সঙ্গে তরার কথাও চিন্তা করে—এই পর্যন্তই যা।

কখনো বা চন্দ্র কপাহীদের বাড়িতে আসে। কপাহী ওকে ভালোও বাসে, ভয়ও পায়, বড্ড বে-পরোয়া স্বভাবের লোক—সত্যি বলতে কি, স্বাস্থ্যে, চেহারায় একটা পুরুষমানুষই বটে।

ও আবার তরার কাছে চেয়ে চা-টাও খায়। কখনো কখনো তরাকে দিয়ে পিঠের ঘামাচি গালায়। কেমন জানি আধ-পাগলা— আপন-পর নেই। সে আবার তরার সঙ্গে ইংরিজিতেই শুধু কথা বলে। কি জানি কি বলে। খারাপ কথা বলে কিনা বোঝা ভার। তরা কিন্তু ভালোভাবেই উত্তর দেয়। ভয় করে চললেও, কপাহী চন্দ্রকে অপছন্দ করে না। ছেলেটা কখনো সখনো বড়ো সাহায্য করে।

তরা আবার চন্দ্রকে 'চন্দ্র কাইটি' বলে ডাকে। দুজনার খুব ভাব।

একদিন কপাহীর সামনেই সে তরাকে জিজ্ঞেস করে ফেলল— "এই তরা, একটা ভালো ছেলে খুঁজে দেব, বিয়ে করবি?"

লজ্জায় লাল হয়ে তরা বলল— "যাঃ অসভ্য কোথাকার! কী নির্লজ্জের মতো কথা বলার ছিরি। তোর সঙ্গে আর কথাই বলব না।"

চন্দ্র হা-হা করে হেসে উঠল।

—"এমন কী লজ্জার কথাটা বললাম। এর যেন আর ম্যারেজ হবেই না। কারোর সঙ্গে পালানোর ফন্দি আঁটছিস, না? পালিয়ে গেলে জানে মারব। তোর বিয়ে দেব— বিয়েতে তোকে কি দেব জানিস? একজোড়া সেণ্ডেল প্রেজেণ্ট করব বুঝলি? সেণ্ডেল পড়েছিস কখনো?"

তরার মুখটা লজ্জায় আরক্তিম হল। সেণ্ডেল পরে কনে সাজা কি কম লজ্জার কথা? সেণ্ডেল পায়ে দিয়ে চলতে কেমন লাগে কে জানে?

কপাহী বলল— "মুখে আর ফরফর করতে হবে না। বোনটার জন্য ভালো দেখে একটা ছেলে দেখ্ দিকিনি—"

কথাগুলো তরার সামনেই হচ্ছিল। তরা হাঁ-করে আশা-ভরা চোখে চন্দ্রর দিকে তাকাল।

চন্দ্র স্থির আশ্বাস দেয়—"সিওরলি বলছিস পিসি? পরে কিন্তু 'নো' বলা চলবে না। বিউটিফুল ইয়ং-ম্যান বুঝলি? একটু ওয়েট করতে হবে তোদের। কি ভাবছিস, হোয়াট ইজ ইউ থিংক চন্দ্র?"

চন্দ্র চলে গেল।

তরার মনে আশা দেখা দিল।

অনিশ্চিতভাবে কপাহী আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল। হয়তো চন্দ্র কিছু একটা করতেও পারে। রাত দুপুরে এক মাইল দূর থেকে কেরাসিন তেল এনে দেয়া লোক সে। ওর সাহায্যেই হয়তো তরাকে কোনো ভালো ছেলের হাতে দিতে পারব। বলা তো যায় না।

সাত

পূর্ণিমার জ্যোৎস্না— চতুর্দশীর পূর্ণিমা। ধব্‌ধবে সাদা জ্যোৎস্নায় চার দিক ভরে গেছে। ধনশিরির জলে রুপোলি জোছনার ঝিকিমিকি।

বনানীর মাঝ থেকে উত্তর-মুখী হাওয়া বইছে। নেপালীদের বাথান থেকে বাসি দুধের গন্ধ হাওয়ায় ভেসে আসছে

গামছায় পোঁটলা বেঁধে আনা তিনসেরী মাটির কলসীটা ও লম্বা বাট-অলা জঙ্গলকাটা দা'খানা কাঁধে। হাতে একটা মশাল, জ্বালানোর অপেক্ষায়। গুলচের মুখে একটা জ্বলন্ত বিড়ি।

নদীর পাড়ের লিকলিকে সরু পথটা ধরে গুলচ যাচ্ছিল—মৌচাক ভাঙতে যাবে। বেলা থাকতে থাকতে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল, সন্ধের অপেক্ষায় একটু অধীরই হয়ে পড়েছিল—অবশেষে সন্ধ্যা নামল; সে-ও বাইরে পা বাড়াল। ভীমকে ওর বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যাবে।

ওর মন ছটফট করছিল। কম করেও দশ সের মধু। বেচলেও কিছু টাকা পাওয়া যাবে। তা না হলে খাওয়া যাবে। চাক-ভাঙা মধুর স্বাদই আলাদা।

নদীর পারে পারে ভীমের বাড়ি যাওয়ার পথ। ওদের বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে। অবশ্য গাঁয়ের মধ্যে এক মাইল পথকে কেউ দূরই মনে করে না। কখনো-সখনো একগুছি পানের জন্য কেউ কেউ গাঁয়ের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত হাঁটা দেয়—দু মাইলেরও বেশি পথ।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চাকটা ভেঙে আনতে পারলেই হয়। পরিপক্ক অবস্থায় মৌমাছিরা কামড়ায় না। বাড়িতে মধুটা রেখে, রাতের খাবার খেয়ে সে কপাহী বাইটির বাড়ি যাবে। কিন্তু তরাটা বাড়িতে থাকলে ভালো হত। মধুটা ওর হাতে দিতে পারলে মনটা খুশি হত।

তরা নাই-বা থাকল, আজ কপাহী বাইটি বাড়িতে একা। লজ্জা-শরম বিসর্জন দিয়ে আজ ওর মনের কথা কপাহীকে বলবে।

সোজা কথা—তরাকে সে বিয়ে করবেই। এখন যদি না হয়,

মাঘ-ফাল্গুনেই হোক। তবে কথাটা পাকা করে রাখা দরকার। নইলে কপাহীদের বাড়ির সঙ্গে ওর কিসের সম্পর্ক?

গুলচের মনে নিশ্চিত আশা দেখা দিল— ওকে জামাই করতে কপাহী অস্বীকার করবে না। টাকা-পয়সা না থাকতে পারে, কিন্তু ওর চাইতে ভালো পাত্র আর কোথায় পাবে?

মনটা ওর খুশিতে ভরে উঠল। আজ আর লজ্জা করব না। সরাসরি বলে ফেলব।

হঠাৎ সে সামনের দিকে তাকাল। সারাটা পৃথিবী চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল। গাছপালার সবুজ পাতায় রুপোলি জ্যোৎস্না ঝলমল করে উঠছে। নদীর কাঁপা জলে ঝিকিমিকি রূপোলি আলোর ঢেউ।

গুলচ অন্য সব-কিছু ভুলে গেল। হাওয়ার বুকে অনেক মিষ্টি কথার গুন-গুন সুর। ঝির-ঝির, সির-সির— গাছের সরু সরু পাতা-গুলো কাঁপছে। নদীর পাড়ের বিরিনা-পাতায় মিহি আওয়াজ, মিটমিট, সিরসির। চাঁদের মিষ্টি আলো, হাওয়ার মিষ্টি কাঁপুনি।

অনির্বচনীয় এক আনন্দে গুলচের মন নেচে উঠল। বিরিনা-পাতাগুলোর সঙ্গে ওরও মন নাচতে চাইছে। সে শিস দিল।

চিৎকার করে সে কাউকে কিছু বলতে চাইল। কোনো একটা গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কোনো গান অথবা কারো নাম মনে পড়ছে না। নেচে নেচে এগিয়ে গেল, বিরিনার গোড়া-গুলো যেন ওর বন্ধু। শিস দিতে দিতে এগিয়ে চলল। শুনতে পেল নদীর পাড়ে বসে কে একজন বাঁশি বাজাচ্ছে। বেসুরো। রাতের জ্যোৎস্নায় তাও যেন মিষ্টি।— 'আর কাজ নেই! নদীর পাড়ে বসে বাঁশি বাজানো।' নিজের মনেই বলল।

এর আগে ডালিমগ্রামে এত সুন্দর জ্যোৎস্না দেখেছে বলে আজ গুলচ মনে করতে পারছে না। দেখে নি, কখ্খনো দেখে নি।

মুঠো মুঠো সাদা জ্যোৎস্না ওর মনের ভেতরেও ঢুকে পড়ল। এসে ভীমের উঠোনে দাঁড়াল।

—"ভীম!"

—"গুলচ নাকি? আয়—"

ভীম বেরিয়ে এল।

—"আমি সন্ধেবেলাই তৈরি হয়ে বসে আছি। এত দেরি করলি যে?"

—"বড়ো সুন্দর জ্যোৎস্না রে"—গুলচ বলল।

—"হুঁ।"

কিছুক্ষণ বাদে ভীম ও গুলচ দুজনে জঙ্গলের দিকে চলল। বার বার চোখ বড়ো করে গুলচ চার দিকে তাকায়— কি জানি যদি জ্যোৎস্নাগুলো হারিয়ে যায়।

—"আজ পূর্ণিমা না রে?" ভীম তখন অন্য কিছু ভাবছিল।

—"আজ চারদিন হয় মোষ তিনটে নেই, বুঝলি? খুঁজতে যাওয়ারও সময় পাই নি। ভয় নেই, তবে শ্রাবণ প্রায় শেষ হয়ে এল। ভাদ্রের বান এসে যেতে পারে বলেই ভয়—" ভীম বলল।

—"এক্ষুণি বান আসছে না, যাঃ," ফস করে গুলচ বলে ফেলল।

—বন্যার ধনশিরি। যেন অন্য কোনো নদী। ধনশিরি তখন উন্মাদিনী, ঠাকুর-দেবতা মানে না, কোনো বাধা মানে না। হুড়মুড় করে আসে, পাড় ভাঙে, ধস নামায়, গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ধুয়ে নেয়, নদীর পাড়ে কৃষকের বাড়ি-ঘর ভেঙে তছনছ্ করে দেয়। ধনশিরির বানকে কে না ভয় পায়?

তা বলে কি ধনশিরিকে কেউ ভালোবাসে না? ধনশিরি মা, মায়ের-ও তো কখনো কখনো রাগ হয়। মা কখনো মাটি থেকে তুলে কোলে নেয়, কখনো আবার কোল থেকে নামিয়ে মাটিতে ঠেলে দিয়ে বসিয়ে রাখে।

ধনশিরিতে বড়ো বান এলে মানুষ ভয়ে দূরে পালিয়ে যায়, বন্যাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই।

শুধু এই পাগল চন্দ্রটা অবাক করার মতো কথাবার্তা বলে —"কে বলেছে নদীকে বাধা দেয়া যায় না? বড়ো বড়ো নদীতে বাঁধ দিয়ে কোথাকার জল কোথায় বইয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আজকাল জলের দেব-দেবীরা অন্য কোথাও পালিয়ে গেছে। বড়ো বড়ো উন্মত্ত নদীকেও নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানো হচ্ছে। একদিন আমরা ধনশিরিকেও শিক্ষা দেব। বছর বছর ক্ষেত-খামার ডুবিয়ে দেয়, বড্ড বাড় বেড়ে গেছে।"

চন্দ্রটা নিশ্চয় একদিন পাগল হবে। বানের জলকে আবার বাধা দেয় কেউ! জলকন্যা এখন ছেলেটার কোনো অমঙ্গল না করলেই হয়।

বটগাছটার নিচে আলো-আঁধারির মিষ্টি সমন্বয়— নিবিড় রহস্য।

—"কোথায়?" কানের কাছে মুখটা এনে ফিসফিস করে ভীম শুধোল। যেন মৌমাছি ওর কথাগুলো বুঝতে পারবে।

—"মশালটা জ্বেলে নিই দাঁড়া—"

পাকা মৌচাকটা ঝুলে রয়েছে।

ভীমের চোখ দুটো চকচক করে উঠল।

—"মস্ত বড়ো চাক—"

—"চেঁচাস না—"

গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক চাঁদের আলো এসে চাকটার ওপর পড়েছিল। কিন্তু মশালটা জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে চাঁদের আলো আর নেই।

—"ওঠ্—" গুলচ বলল।

ওরা দুজনে মশালটা দিয়ে একবার গাছের তলাটা দেখে নিল। বাঘ-টাঘ না থাকলে হয়।

—"কিছু নেই—যা—"

হাতে জ্বলন্ত মশালটা নিয়ে ভীম বেয়ে বেয়ে গাছে উঠে গেল। অন্য মশালটা হাতে নিয়ে গুলচ অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল।

—'বাঁদরের বংশধর'— নিজের মনেই সে বলল। দুটো ডালের মাঝখানে বসে ভীম বলল, "গুলচ—বড়ো জাতের মৌমাছি—"

—"হুঁ—"

একদৃষ্টে গুলচ ভীমের দিকে চেয়ে রইল।

ভীম মশালের আগুন মৌচাকটার নিচে ধরল। ধোঁয়া ও আগুনের আঁচে মৌমাছিগুলো সব সরে গেল। কোমরে বেঁধে রাখা মাটির কলসীটা পেতে ভীম মৌচাকটা কাটল। মধুকোষগুলো বড়ো বড়ো। ডালটা চেঁচে-চেঁচে সে কোষগুলো তুলে আনল। অসহায়ভাবে বেচারী মৌমাছিগুলো দূরে সরে রইল।

—"কাটছিস ভীম—?" নিচে থেকে গুলচ জিজ্ঞেস করল।

—"হুঁ—"

ফোঁটা দুয়েক মধু নিচে টপ করে পড়ল। হাঁড়িটা গুলচ নিচে পেতে ধরার চেষ্টা করল, পারল না। মশালটা, আর কলসীটাও, হাতে নিয়ে ভীম নেমে এল। একটাও মৌমাছি তাকে কামড়াল না।

এক কলসী ঘন মধু— এর ওপর মধুকোষ, মোম আর চাকের খোলসটা।

—“অনেকটা মধু ছিল।” উৎফুল্ল কণ্ঠে ভীম বলল।

দুজনেই গাছ-পাতার ওপর থাবড়ি খেয়ে বসে মধু খেল। ভীমের হাত বেয়ে মধু পড়ছিল, সে চেটেচেটে খেয়ে নিল।

—“আজ না ভাঙলে কাল পোকা পড়ত—”

—“হুঁ—”

মধুটা দুভাগ করে ওরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল।

ভীম বলল— “তুই না দেখলে এটি নষ্ট হয়ে যেত। জঙ্গলের ওদিকটায় বোধকরি আরো অনেক আছে। কিন্তু ওখানে যেতে ভয় করে।”

বেশ রাত হয়েছিল। গাঁয়ের প্রায় সবাই তখন ঘুমে আচ্ছন্ন। শুধু মানুষের ঘরে ঘরে দোরগোড়া শুঁকে বেড়ানো গোটাকয়েক চ্যাংড়া ছেলে তখনো চাঁদের আলোয় বসে আছে।

মধুর হাঁড়ি নিয়ে ভীম বাড়ি চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল— “একটু নজর রাখিস। আবার কোথাও দেখতে পেলে আমায় ডাকিস। আর কাউকে বলিস না কিন্তু।”

গুলচ তারিফ করল।

বাড়ির কাছে এসে গুলচের খেয়াল হল : এখন বাসায় গেলে কপাহী বাইটির কাছে আর যাওয়া হবে না। এত রাতে কোথাও যাওয়ার নাম করলে মা খ্যাং খ্যাং করে উঠবে। এখন আর ঢুকব না। বাইরে বাইরে কপাহী বাইটির বাড়ি হয়ে আসি। ওখান থেকে ফিরে এসে বাড়ি ঢুকব। তা না হলে মা বকাবকি করবে।

কপাহীদের উঠোনে পা দেয়ার পর গুলচের একটু ভয় হল। এত রাতে যদি কেউ এখানে আসতে দেখে— কী ভাববে।

সে চার দিকে তাকিয়ে দেখল। কেউ নেই, সবাই ঘুমাচ্ছে। কপাহীদের বাড়ি গাঁয়ের এক প্রান্তে। ধারে-কাছে আর কারো বাড়ি নেই। কলাগাছে-আখগাছে মিলে মানুষের বাগানগুলো যেন এক-একটা ঝোপ-জঙ্গল। মাঝখানে ঘরবাড়িগুলো। উঠোনে না এলে ঘর দেখা যায় না।

এদিকটায় পথেও কেউ নেই। এখন বোধহয় রাতদুপুর।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চাপা স্বরে গুলচ বলল—"বাইটি, ও বাইটি!"

ভেতরে বিছানাটা ক্যাচ্ করে উঠল।

—"বাইটি, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?"

—"কে? গুলচ নাকি? দাঁড়া, আসছি—"

পিদিমটা জ্বালিয়ে, দরজা খুলে কপাহী বলল— "আয়, ভেতরে আয়। এত রাত করে এলি যে?"

দা'খানা আর মধুর হাঁড়িটা নিয়ে গুলচ ভেতরে এল।

—"ওগুলো আবার কী?"

দরজায় হুড়কোটা লাগিয়ে কপাহী শুধোল।

—"মৌচাক ভাঙতে গিয়েছিলাম। ওখানেই এত দেরি। বাইরে বাইরে এসেছি।"

—"মধু! কোথায় পেলি?" একটু চুপ করে থেকে কপাহী বলল— "ভাত খেয়েছিস?"

—"ভাত আর কোথায় খেলাম? সেই সন্ধেবেলা বেরিয়েছি। তবে মধু খেয়েই পেট ভরেছে।"

এক ঘটি জল এনে দিয়ে কপাহী বলল—"মধুতে কি আর পেট ভরে? পা-হাত ধুয়ে আয় যা। আমি ভাত বাড়ি। তোর জন্যও রান্না করেছিলাম।"

খেতে খেতে গুলচ জিজ্ঞেস করল— "তরা চলে গেছে?"

—"হুঁ, সকালবেলাই গেছে। আমি একা। তুই আসবি আসবি করে অনেকক্ষণ বসে রইলাম। এখন একটু বিছানায় শুয়েছিলাম। ঘুমাই নি। একা একা থাকতে বড্ড ভয় করে।"

গুলচ সংক্ষেপে বলল—"সে তো ঠিকই।"

গুলচ সামান্য অস্বস্তি বোধ করছিল। তরা নেই। কপাহী একেবারে একা। মেয়েলোকটার কথাবার্তা তেমন সুবিধের নয় বলে সে শুনেছে। অবশ্য ওর চাইতে কপাহী বছর তিন-চারেকের বড়ো।

ভাত খেয়ে ওরা মাঝের কোঠায় এল।

কপাহী তাম্বুল কেটে কেটে বাটায় রাখছিল। গুলচের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল— "পামে কতটা জমি বের করতে পারলি?"

—"করেছি সামান্য— একা হাতে আর কত পারা যায়?"

—"বাড়ি করছিস না?"

—"না—। এই কার্তিকে খড়টড় কেটে ক্ষেতের কাজ শেষ করার পর করব ভাবছি।"

—"চরের বাড়িতে তোর মা কি আর যাবে?"

—"মা রাজী নয়।"

—"তা হলে বাড়ি আর কেন করতে চাইছিস?"

কথাটা শুনে গুলচের লজ্জা হল। কী বলবে ঠিক করার

আগেই কপাহী হেসে বলল—"লজ্জা কিসের? জোয়ান ছেলে, ঘরে একটা মেয়ে আনবি আর কি—"

একটা তাম্বুল মুখে পুরে নিয়ে গুলচ কপাহীর মুখের দিকে তাকাল। ওর দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে আছে কপাহী। প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় বড়ো সুন্দরী ঠেকছে। কপাহীকে এখনো মনে হয় যুবতী। ওর দেহের ভাঁজগুলোতে গুলচের দৃষ্টি আটকে যাচ্ছিল।

কপাহী হেসে বলল—"আমার গায়ের দিকে তাকিয়ে কী দেখছিস? মেয়েমানুষ দেখিস নি বুঝি?"

গুলচ আর কথা বলতে পারল না। ওর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। ইচ্ছে করছিল তরার কথা জিজ্ঞেস করে, কিন্তু তখন ওর গলা শুকিয়ে আসছে।

আশ্বাস ও সান্ত্বনা দেবার সুরে কপাহী হেসে বলল—"ঠিক আছে, বাড়ি-ঘর তৈরি কর, বাগান কর, একটু জোগাড়যন্ত্র কর—খরা পর্যন্ত আর ক'টা দিন?"

তারপর ওর চিবুকটা তুলে ধরে বলল—"তোর ভয় পেতে হবে না। চিন্তা করিস না, তোর ওপর আমার চোখ অনেক দিন ধরে। তোকে ছেড়ে দিচ্ছি না বুঝলি—"

গুলচের মন আনন্দে ভরে উঠল। বাইটি তা হলে আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছে। তরার জন্য আমাকেই ঠিক করে রেখেছে। মাথা নিচু করে সে বসেই রইল।

উঠে দাঁড়িয়ে দরজার হুড়কোটা দেখে নিয়ে কপাহী বলল "—চেনিমাইর কথা বেশি ভাবিস না। আমার মতো এতখানি তোকে কে ভালোবাসবে বল?"

তাই তো, আজ পর্যন্ত এমন দরদ-ভরা কথাবার্তা আর তো কেউ ওর সঙ্গে বলে নি। কপাহীকেও ওর ভালো লাগল।

অল্পক্ষণ চুপচাপ থেকে সে ঢোঁক গিলে কোনোরকমে বলল—"মধুটা কোথাও রেখে দে— অনেক রাত হল, এবার আমি যাই।"

—"যাচ্ছিস? তুই গেলে আমি একা কি করে থাকব? যাবি-ই যদি তো এলি কেন—"

গুলচ কিছু বলল না। ঠিকই তো বলেছে, তরা বাড়ি নেই। সে চলে গেলে কপাহীর ভয় করবে।

যেন বলতে হয় তাই— বলল, "আচ্ছা, থেকেই যাই, তবে ভোর হতে না হতে যেতে হবে। গ্রামের লোকেরা দেখলে—"

—"দেখুক গে। তুই একটা বেটাছেলে, তোর এত ভয় কিসের?"

বলে কপাহী ওর শোবার ঘরে চলে গেল। প্রদীপটা হাতে নিয়ে গেল। বিছানাটা একটু ঝেড়ে ঝুড়ে পেতে গুলচকে ডাকল—"আয় শুয়ে থাক্, অনেক রাত হল।"

বিছানায় শুয়ে গুলচ বলল— "আর বিছানা নেই? বাইটি, তুই কোথায় শুবি?"

রিহাটা গা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রদীপটা নিবিয়ে কপাহী বলল— "বিছানা আর কোথায় আছে? যা— একটু ওদিকে যা দেখি।"

গুলচ এক ধারে চুপচাপ করে পড়ে রইল। কপাহী ওর গা ঘেঁষে শুয়ে মুখের কাছে মুখটা নিয়ে বলল— "তুই কিছু ভাবিস না। আজ থেকে আমায় বাইটি বাইটি করিস না। আমি কি তোর বাইটি?"

গুলচ-ও বুঝল যে কপাহী কোনোদিন ওর দিদি ছিল না।

রাত নিঝুম হয়ে আসছিল। বেড়ার ফুটো দিয়ে চাঁদের হলুদ আলো ভেতরে এসে পড়েছে। গুলচের মনে হল এতদিন সে ভরাকে চায় নি, কপাহীকেই চেয়েছিল।

আট

গুলচের বাবার শক্ত অসুখ। পামে খবর পাঠানো হয়েছিল। গুলচ কিন্তু এল না। লোভ দেখানোও হয়েছিল : বুড়োর কবে কী হয় ঠিক নেই, কোনো অঘটন হওয়ার আগে সম্পত্তি ভাগ করে দেবে, তোকে এই জন্যই ডাকা।

তবু সে গেল না। বাপের বেটা যদি হই তো না গেলেও সম্পত্তি পাব, আর না পেলেও কোনো ক্ষতি নেই। আর আছেই বা কি— ছাই ভস্ম শুধু। না দিলে নেই। হাত দুটো আছে তো, নিজেই করে নেব।

মায়ের সঙ্গেও গুলচের এই নিয়ে মতান্তর হল। বুড়োর শক্ত অসুখ শুনে, অন্যেরা বলায় মা স্বামীকে দেখতে চলে গেল। গুলচ একদিন বাড়ি এসে মাকে পেল না। খবর নিয়ে যখন জানতে পারল মা বাবার কাছে গেছে, রাগে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। গাঁয়ের লোকদের বলে গেল— "আমি আর

আসব না, পামেই থাকব। মাকে বলে দিস এখানে যেন আর ফিরে না আসে। ওখানেই থাকুক। বড়ো ছেলে আছে—খাওয়াবে। গোরুগুলো আমি নেপালীর কাছে রেখে দেব।”

দু-চারজন লোক ওকে উপদেশ দিল—“কারো ওপর রাগ করে থাকতে নেই। মা-বাপের নিজের ছেলেমেয়ের ওপর রাগ হবে না তো কার ওপর হবে, বল্? তুই-ও যা একটিবার বুড়োর খবর নিয়ে আয়—”

গুলচ কিন্তু গেল না।

শয্যাশায়ী বাপকে দেখার ইচ্ছে অবশ্য হয়েছিল, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভাঙবে না। ওকে কি কেউ আর মনিষ্যি বলবে তখন? মরদ কা বাত।

মা বাড়ি ফিরে যাওয়ায় একটু যেন খুশি-ই হল। ওর চিন্তা কমল। বাড়িটা পড়ে থাকবে— ওখানে আর আছে কি? গোরু-গুলোর জন্য ওর মার চাইতে ওর চিন্তাই বেশি। সে ব্যবস্থাও করে ফেলেছে। নেপালী গাঁয়ের চক্রবাহাদুর গোরুগুলো রাখবে। এর বদলে সে কলাই-ক্ষেতে চাষ দিয়ে নেবে। হালে জোতার লায়েক হয়েছে, টানবেই।

তরা আর কপাহীর কথা বেশি না ভাবলেও চলবে। একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কপাহীটাই একটু ওলটপালট করে ফেলল। তবে ও গুলচকে সত্যিই ভালোবাসে। কপালে যা আছে হবে।

কার্তিকের মাঝামাঝি। ধনশিরির জল দিন দিন কমে আসছে। নদীর বুকে পলি-পড়া বড়ো বড়ো বালুচর দেখা যায়। এসব জমিতে আলু, সর্ষে, লংকা ও বেগুনের চাষ খুব ভালো হয়। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে নদীর জলে ডুবে-থাকা, পাড়ের অনেকখানি

জমি বেরিয়ে পড়েছে। গুলচের বের করা জমিগুলোর পাশেও তেমন একটুকরো বেরিয়েছে—তিন পূরা মতো হবে। একটু নিচু মতো। তবে নদীর পাড়ের ঢালু দিকটায় একটু মাটি ফেলতে পারলে বর্ষার সময়েও উঁচু হয়ে থাকবে। এখন খরার ফসল বোনা চলবে। যদি বড়ো রকমের বন্যা না হয় তবে বর্ষাকালে বাওধান, শালিধানও রোয়া যাবে।

বড়ো বান এলে— সব ডুবে যায়, সে কথা আলাদা।

নতুন উদ্যম ও আশা নিয়ে গুলচ জঙ্গল পরিষ্কার করে জমি উদ্ধারে মন দেয়। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ওর আর কোনো চিন্তা নেই। নিজের জন্য তিন পূরা মতো বের করে, একসনা পাট্টা করিয়ে নিতে পারলে ওর আর চিন্তা থাকে না। তখন বাপের জমির আশা না করলেও চলবে। কুড়াল, কোদাল ও জঙ্গলকাটা দা'খানা নিয়ে যতটা পারে বন-জঙ্গল কেটে কেটে জমি বের করতে লাগল। এক হাত জমি বের করার পর ওর যে কী আনন্দ হয়। নিজের জমির দিকে তাকিয়ে আপন মনে হাসে। নদী ওকে ভালোবেসে ওর সীমানায় পলি-পড়া চরটা রেখে গেল। ধনশিরিকে ওর বড়ো ভালো লাগে। বন্যা ডোবাতে পারে না এমন ভাবে যদি উঁচু করে দিয়ে যেত।

রোদে ঘেমে ক্লান্ত হয়ে শিমূল গাছটার নিচে বসে পড়ল। কুড়াল কোদাল চালাতে চালাতে ওর হাতের তেলোগুলো শক্ত হয়ে গেছে। তেলোটা চোখের সামনে এনে দেখল। হাতের তেলোতে নাকি মানুষের ভাগ্য লেখা থাকে। ও অতশত বোঝে না। তেলোতে গোটা কয়েক এলোপাথারি রেখা। কে জানে এর অর্থ কি ?

আকাশের দিকে তাকাল। কার্তিক মাসের নির্মল আকাশ। মনটা হাল্কা। একটু দূর থেকে তার পাশের বাসাটার দিকে তাকাল। ঠিক ওখানে ঘরটা বানাতে হবে। বাগান করা সে শুরু করেই দিয়েছে। বিচেকলা, জাতিকলাগুলো ফলছে। কালো সিমগাছটা সারা মাচাটা ছেয়ে ফেলেছে। এবার সর্ষেগাছগুলোও লকলক করে বাড়ছে। দু মুঠো পাওয়া যাবে।

নিজের হাত দুখানা উলটেপালটে দেখল। রঙটা ময়লা হয়ে গেছে। তাই তো, এই কার্তিক মাসের রোদে সারাটা দিন কাটানো, কালো হব না কেন?

উঠে দাঁড়িয়ে ধনশিরির জলে নেমে গেল। এই সময় জল স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ। হাত মুখ ভালো করে ধুয়ে নদীর জলে নিজের মুখটা একবার দেখল। অনেক দিন আয়নায় নিজের মুখটা দেখে নি। দেখল— রঙ তেমন ময়লা হয় নি, তবে খাটুনি বেশি হওয়ায় অল্প রোগা হয়েছে। গালের ওপর হাত বুলিয়ে দেখল। তাই তো, চোখের নিচে গাল দুটো বসে গেছে। খাওয়া-দাওয়ার অনিয়ম। সারাটা দিন কাজ, রাতে আর জুত করে রান্নাবান্না করার শক্তি থাকে না। যা খায় তাই সুস্বাদু মনে হয়। তা বলে মাঝে মাঝে মাছটা মুর্গীটা না খেলে শরীর চলে না।

কার্তিকের দিন কটা যাক।

ঘর একটা হলে তো চলবে না, কমপক্ষেও দুটো চাই। রান্না-ঘরটা আলাদা করে তৈরি করতে হবে। একটা মাড়ল ঘর, একটা বাইরের ঘর।

অনেক কাজ— আর বেশি দিন নেই। অঘ্রাণমাস পড়লেই হাতে কাস্তে নিতে হবে। দুখানা হাতে একটা লোক আর কত

করবে ? গুলচ চোখ তুলে শিমূল গাছটার দিকে তাকাল। পাতা-গুলো প্রায় সব বুড়ো হয়ে ঝরে পড়েছে— শুধু দু-চারটে হলুদ পাতা ডালে লেগে আছে। একটা ডালে বাবুই পাখি বাসা করেছে। খড়কুটো দিয়ে তৈরি বাসাগুলো ডাল থেকে ঝুলে রয়েছে। গোটা দুয়েক বাসা পুরানো— এবার বোশেখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বানিয়েছিল বোধ হয়। দু-একটা মনে হল নতুন। একটা একটা করে কুটো এনে বাবুইরা সুন্দর ছিমছাম বাসা বানায়।

গুলচও বানাবে।

কিন্তু ঘর বানানোর আগে যে ভাবেই হোক দুখণ্ড নদীর পাড়ের জমি ওর বের করতেই হবে। মাটি-ই জীবন। একটি মেয়ে কী আশায় ওর কাছে এসে থাকবে ?

ডালিম গ্রামে গিয়ে সে একদিন চন্দ্রর সঙ্গে দেখা করল। চন্দ্র ওকে অভয় দিল—"তুই একটা আস্ত বুর্বক ! তুই এলোন্-লী দুনিয়ার সব-কিছু করতে পারবি নাকি ? মানী আছে ? টাকা ? দশ-বিশ টাকা খরচ করতে হবে! লেবার লাগা। আমি এনে দেব। মিকির গ্রামের তরু আর যদু পয়সা নিয়ে হাজিরা খাটে। খুব কাজ করতে পারে। ওদের কাজে লাগিয়ে দিয়ে তুই সুপারভাইজ করবি। সম্ভব হলে আমিও যাবো'খন। সব হয়ে যাবে— ডু নট এফরেড্।"

চন্দ্রর ইংরাজী বুঝতে না পারলেও ওর উপদেশের মর্ম গুলচ বুঝল। ওর হাতে গোটা সাতাশ টাকা ছিল— কলা-আখ ইত্যাদি বেচে পাওয়া। তাই তো, টাকা আর কিসের জন্য ? মিকির মজুর দিয়ে জঙ্গল কাটিয়ে জমি বের করতে পারলে— বাস্।

কথাটা কপাহীকেও বলল।

কপাহী অবশ্য বলল—"জমানো টাকা সব খরচ করে হাত খালি করা বোধহয় ঠিক হবে না।"

তরা কিন্তু বলল—"আমার কাছেও ক'টা টাকা আছে, বৌটি! ককাইটিকে দিয়ে দিই। দরকার হলে এর বদলে আমাদের না হয় এক কাঠা মতো জমি-ই দেবে—"

—"তোদের টাকার আমার দরকার হবে না।" বলে যদিও প্রথম দিকে প্রতিবাদ করেছিল, পরে কপাহী ও তরা দুজনে মিলে বোঝানোতো পনেরোটা টাকা নিল। বলল— "আচ্ছা, এই টাকায় যতটা জমি বের হয় তোদের দেব।"

কপাহী হেসে বলল— "আমার তোর করছিস কেন? আমরা দুটি মেয়েমানুষে মিলে জমিটা কি চিবিয়ে খাব? সবটাই আমাদের জমি হবে।"

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে গুলচ মুচকি হাসল। তরাও ইঙ্গিতটার তাৎপর্য বুঝতে পেরে লজ্জায় লাল হয়ে মাথা নিচু করল।

'আমার জমি' বলাটা গুলচের ঠিক হবে না। সেগুলো হবে 'আমাদের জমি!'

কপাহীর কাছে জানতে পারল, গুলচের বাবার অবস্থা একটু উন্নতির দিকে। ওর মা ওখানেই আছে। মায়ের সেবা-যত্নে বুড়ো পুনর্জীবন পেয়েছে। মাকে আর কেউ পাঠিয়ে দেবে না।

গুলচের মুখে বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করে কপাহী বলল— "ভালোই হল, নিজের মানুষটাকে ফেলে আর কতদিন থাকবে? ভাতার মাগের ঝগড়া-ঝাঁটি তো লেগেই থাকে।"

গুলচ শুধু বলল— "আবার না লাগলেই হয়।"

কপাহী হেসে বলল—"আরেকটা চেনিমাইকে নিয়ে পালালে তবে তো হবে। এবার কিন্তু মা অন্য দলে!"

কপাহী গুলচের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। কপাহীর কথা শুনে গুলচের আনন্দ হল। 'মেয়েটা' কথা বললে মনটা গলে যায়।

তরা আবার মনে মনে ভাবল—গুলচ আমায় নিয়ে পালিয়ে গেলেও আপত্তি নেই। মাসী আর কি কথাবার্তা পাকা করবে? আমাদের মতো গরিবের কি আর সামিয়ানা খাটিয়ে বিয়ে হবে? খরার দিন আসুক, কিছু জমি বের করুক, ধান কাটা হয়ে যাক, গুলচের মনটা বুঝতে পারলে নাহয় আমি-ই পালিয়ে যাব। এমন কি আর বাড়াবাড়ি হবে?

চন্দ্রর উপদেশে কাজ হল।

মিকির গ্রামের তুরু আর যদুকে লাগাল, নেপালী গাঁয়ের কলা নামের নেপালীটাকেও লাগাল, গুলচ নিজেও লেগে গেল। সাতটা দিন দিন-ভর কাজ করে বন-জঙ্গল কাটাল— ছয় হালিচার-ও বেশি জমি বের করা গেল।

গুলচের মনটা কঠিন হয়ে উঠল। জমিগুলোর দিকে তাকিয়ে গর্বে বুকটা ভরে ওঠে। নতুন করে বের করা দু-পূরারও বেশি জমি, আগেও কিছুটা আছে। আজ ও জমির মালিক। আর কিছু চায় না। নদীর পাড়ের উর্বর, পলি-পড়া জমি— বড়ো রকমের বান না এলে একটা সম্পত্তি বটে!

ধনশিরির দিকে তাকিয়ে বলল, 'নদীটা ওদিক ঘেঁষে বইতে শুরু করলেই তো হয়। তা হলে এদিকটায়, আমার জমির পাশে নতুন চর পড়বে। জল তা হলে আর আমার উদ্ধার-করা জমি ছুঁতে পারবে না।'

সে যেন চোখের সামনে দেখতে পেল ধনশিরি ওর জমির কাছ থেকে সরে গিয়ে দূরে বইছে। ওর জমি দিন দিন উঁচু হয়ে উঠছে। বাও, শালি আর আশু ধানে ওর ক্ষেত ভরে গেছে। লকলকে সবুজ শস্যে ওর ক্ষেত উপচে পড়ছে। তরা ধান কাটছে, কপাহী ধান কাটছে—ও বড়ো বড়ো আঁটি বাঁধছে— বাঁকে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বড়ো বড়ো ভারী আঁটিগুলো। নতুন জহা ধানের গন্ধে ঘর-বাড়ি যেন ভরপুর হয়ে যায়।

চারদিকে জমজমাট শস্য ক্ষেতের মাঝখানে ওর ছোট্ট ছিমছাম বাড়িটা— ভাত খেতে পারা যায়, এমন একফালি উঠোন। পুকুরের প্রয়োজন নেই। যতদিন ধনশিরি আছে জলের অভাব নেই।

উঠোনের সামনের দিকে ও কিন্তু দু-চারটে ফুলগাছ বুনবে।

জমি বের করতে ওর তিরিশ টাকা খরচ হল। এর অর্ধেক টাকা তরার। তরাকে কিন্তু জমি দেব না। ওর আবার জমির কি দরকার? নিজে হাল বেয়ে কি আর চাষ করবে। আর যদি করেও, দরকার হলে পনেরোর জায়গায় কুড়ি টাকা দেব, জমি দেব না। জমির প্রতি ওর টান বেড়ে গেল।

সরস, পলি-পড়া নরম জমিটা। শরীরের এক টুকরো মাংস দিতে পারা যায়, কিন্তু জমি নয়।

অবশ্য টাকা বা জমির কথা তরারা কখনো বলে নি। তরা শুধু জিজ্ঞেস করেছিল—"সেখানে আর কেউ কি জমি বের করছে?"

—"উঁহু, আর কে করবে? গোটা জায়গাটাই আমাদের। অন্য কেউ দেখতেই পায় নি।" গুলচের কণ্ঠে দিগ্‌বিজয়ী সম্রাটের গর্বিত সুর।

তরা কিছু বলল না। গুলচের জমিই তরার জমি। টাকা

থাকে না, জমি থাকে। সঞ্চিত টাকা ক'টা খরচ করে জমিটা বের করতে পারায় ওর আনন্দের সীমা নেই।

দেখতে দেখতে অঘ্রান এসে গেল। ধান পাকতে শুরু করছে। ধনশিরির পাড়ে ভোরের কুয়াশা গাঢ় হয়ে আসে, দুপুরের রোদটুকু মিষ্টি লাগে, রাতে কাঁথার ওম মধুর মনে হয়।

এখন রবি শস্য বোনার সময় নেই। তবু গুলচ ওর নতুন জমিটা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে নরম করে কয়েক মুঠো সর্ষে ও লাইশাকের বিচি ছিটিয়ে দিল। গজিয়ে উঠবে। পলি-পড়া সরস জমি।

গুলচের একটুও ক্লান্তি নেই। কাজ করে আনন্দ পায়। যেন রাতেও কাজ করবে, ঘুমোবে না। যাবার আগে বসে বসে নতুন বাড়িটা বানানোর জন্য চালের বাখারি, দেয়ালের ছ্যাচা-বেড়া তৈরি করে। কাঠের অভাব নেই, বাঁশ-বেতের ছড়াছড়ি। ধনশিরির পাড়ে বনে-জঙ্গলে কাঠ-বাঁশ বুড়ো হয়ে পচে যাচ্ছে। বর্ষাকালে নদীতে এক-একটা যা বড়ো বড়ো কাঠ ভেসে আসে!

মাঝে মাঝে ডালিমগ্রামে গিয়েও থাম, কড়িকাঠ কেটে আনে। ডালিমের পশ্চিমের ঘন জঙ্গলটায় ভালো কাঠ পাওয়া যায়। বন-কাঁঠাল, নাগেশ্বর, হোলক, শাল, সোনারু ইত্যাদি। জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে বেছে বেছে ভালো কাঠ-ই কাটে। বাড়ি যখন তৈরি করবই, মজবুত করেই করব।

ধান রোয়ার সময়ে যেমন তাড়াহুড়ো পড়ে, কাটার সময়ে তত তাড়া নেই। ধান পেকে ঝরে যাওয়ার আগে আনতে পারলেই হ'ল। টুনটুনি-দোয়েলরা ক্ষেতের ধান খেয়ে কি আর শেষ করতে পারবে? হরিণ, বুনো শুয়োর বা হাতির উৎপাত না হলেই হয়।

হাতিই সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক। একদিক থেকে দুমড়েমুচড়ে শেষ করে ফেলে।

তবে এপারে হাতি হঠাৎ এসে হাজির হয়। ডালিমগ্রামে হাতির খুব ভয়। বন-জঙ্গলটা গাঁয়ের গা ঘেঁষে রয়েছে কিনা, তাই।

গুলচের নিজের জমি তো বড়ো বেশি নেই। মাত্র দু-টুকরো মতো জমিতে ধান বুনেছে। অন্যের জমিতেও চাষ-বাস করে। ভাগ্য ভালো হলে সামনের বছর থেকে পরের জমিতে আর চাষ না করলেও চলবে। একজন মানুষের পক্ষে তিন পূরা জমি, যথেষ্ট। এবার মা নেই, রোয়া-কাটার কষ্ট হবে। তবে তার আগেই ধান রোয়ার লোক ঘরে আসবে। চিন্তা নেই।

চিন্তা নেই— জমি হল, এবার রোয়নী-ও আসবে।

আরো দুটো জিনিসের অভাব গুলচের— একখানা ধুতি আর একটা জামা। এতদিন ধরে সে মায়ের হাতে বোনা মোটা সূতোর খাটো ধুতি-ই পরেছে, টেনে-টুনে কোনোরকম হাঁটুর নিচ পর্যন্ত ঢাকা যায়। জামাটাও পুরানো— তিনবছর হল। ফেঁসে গেছে। অবশ্য জামা বড়ো একটা পরে না, শুধু কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সময়ে পরে। কাঁধে গামছাটা হলেই হ'ল।

এবার কিন্তু মধু বিক্রি করতে পারলে একখানা চওড়া ধুতি আর একটা জামা কিনবেই।

নয়

বড়জঙ্গলে কেটে ফেলে রাখা সোনারুর খুঁটিগুলো চাঁচার জন্য কাঁধে কুড়ালটা নিয়ে গুলচ আসছিল। অঘ্রানের মাঝামাঝি।

সরুধান প্রায় কাটা হয়ে গেছে। নিচু জমির মোটা ধান-গুলো ভালো করে পাকে নি। এই ফাঁকে বাড়ি তৈরির কিছু কাজ করে রাখতে হবে। জঙ্গলেই চেঁচে-ছুলে খুঁটি-খাম্বাগুলো লোক লাগিয়ে অথবা গোরুরগাড়ি করে নদীর পাড় পর্যন্ত আনাতে হবে। একবার সেখানে পৌঁছাতে পারলে আর চিন্তা নেই।

নেপালী গাঁয়ে ঢুকে সে গোরুগুলোর খবর করে এল। ভালোই আছে, দেখতে বেশ সুন্দর হয়েছে। ধনশিরির পারে ঘাসের অভাব নেই; বাঘের মুখে না পড়লেই রক্ষে। সামনের বছর থেকে গোরুগুলোকে আর নেপালীর কাছে রাখবে না, নিয়ে আসবে।

গুলচের তেষ্টা পেয়েছিল। আজ ডালিমগ্রামে ওর আর নিজের বাড়ি নেই। ভেঙে ধসে-পড়া ঘরটা এখনো আছে। তবে, মা যেখানে নেই সেই বাড়িতে ঢোকার কোনো অর্থ হয় না।

গ্রামের সবাই এখন ধানক্ষেতে। গাঁয়ে সাড়াশব্দ নেই। সকালবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে বাড়ির ঝিউড়ী-বউড়ী, ছেলে-বুড়ো সবাই মিলে ক্ষেতে চলে আসে। সবাই একসঙ্গে কাজ করলে তবে তো হবে।

কপাহীদের দরজাটা একটু খোলা দেখে গুলচ ঢুকে পড়ল।

—"বাইটি—"

ভেতর থেকে বেরিয়ে এল— তরা।

গুলচকে দেখে একটু হকচকিয়ে গেল।

নিচু স্বরে বলল—"ও, ককাইটি—"

—"হুঁ, তোর মাসী ঘরে নেই?"

—"নেই, ধানক্ষেতে গেছে।"

—"কোন্ ধানক্ষেতে?" মোড়ায় বসে তরার মুখের দিকে তাকিয়ে গুলচ বলল।

—"সফিয়ত বুড়োর। কোত্থেকে এলে ককাইটি?"

—"পাম থেকে। বড়ো জঙ্গলে খুঁটি-কড়িকাঠগুলো কেটে রেখে দিচ্ছি। দেখি, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। এক বাটি জল দে তো। তোর মাসী কখন ফিরবে?"

—"এক্ষুনি কি আর ফিরছে? সন্ধেবেলা বাড়ি আসবে।"

—"তুই যে গেলি না?"

জলের বাটিটা এগিয়ে দিয়ে তরা বলল, "হুঁ—"

—"কেন?"

—"আমি যাই না।"

—"কেন যাস না?"

—"তুমি তো জান।"

—"আমি আবার কি জানি? দেখি আরেক বাটি জল দে।"

—"আমি চা করি। তুমি বসো কেমন, ককাইটি। এই শীতে আর ঠাণ্ডা জল খেতে হবে না।" বলেই ওর মুখের দিকে চাইল। সে-ও তরার দিকে তাকাল। তরার সৌন্দর্য দিন দিন খুলছে।

গাল দুটো ওর গোলাপফুলের মতো। শরীরটাও বেশ গোলগাল। গামছা দিয়ে আর গা ঢাকতে পারছে না।

অল্পক্ষণ দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইল। তারপর গুলচ শুধোল—"তুই ধান কাটতে কেন গেলি না তরা?"

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তরা একবার মাথাটা বের করে বাইরের দিকে তাকাল। উঠোনে দুপুরের নরম রোদ। কেউ ধারে কাছে নেই। ধান ক্ষেত থেকে মৃদু হাওয়া বইছে, হাওয়ায় পাকাধানের পরিচিত ঘ্রাণ।

তরা গুলচের কাছে এল। ওর পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে একটু ঝুঁকে বলল—"আমি আর কাকে বলব বলো। কখনো তুমি এলে মাসী থাকে। আমায় সফিয়ত বুড়োর হাবাটার সঙ্গে বিয়ে দেয়ার কথা ওরা বলছে।"

—"কার সঙ্গে?" গুলচ চিৎকার করে উঠল।

—"বেশি চেঁচিয়ো না। কেউ শুনে ফেলবে। এই হাবাটার কাছে যাওয়ার চাইতে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরব।"

গুলচ তরার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিল আর মুখে বলল—"হুঁ, চুপি চুপি এই করা হচ্ছে! তুই আমায় আগে বললি না কেন?"

অবুঝ চোখ দুটো তুলে তরা গুলচের দিকে তাকিয়ে বলল—"কি করে বলি, মাসী সব সময় সামনে থাকে। তা ছাড়া তুমি কি ভাব—"

—"বেশ করেছিস, ওদের মাঠে ধান কাটতে যাস নি। বড্ড সাহস বেড়েছে। তোর মাসী কি আমায় একবার বলতে পারে না? মাসী কী বলে?"

—"মাসী আর কি বলবে? সফিয়তের জমিতে কাজ করে খাই। নিজের বলতে না আছে মাটি, না আছে ভিটে। তা ছাড়া আমাদের জন্য চিন্তা করার কি কেউ আছে?"

—"আমি! আমি কি তোদের কেউ নই? আমার কাছ থেকেও এত বড়ো কথাটা লুকিয়ে রেখেছিস, আমি তোদের পর, তাই না?"

গুলচের কণ্ঠে অভিযোগের সুর স্পষ্ট হয়ে এল।

তরা বলল—"তোমাকে পর ভাবলে কি আর আমি বলতাম? শুধু তুমি-ই কিছু একটা করতে পারো। অন্য আর কে আমাদের জন্য করবে? মাসী মেয়েমানুষ। চেপে ধরলে যদি রাজী হয়ে যায়!"

—"চেপে ধরবে? কে চেপে ধরবে? এই কুড়ালটা দেখেছিস, কুপিয়ে দু-টুকরো করব, আমাকে চেনে না! সেই হাড়-কিপটেটার দুটো পয়সা আছে বলেই কি হাবাটার জন্য তোকে চাইবে। আমরা কি নেই? আমরা কি মরে গেছি?"

তরার মুখে হাসি ফুটল। ওর মনে আশা দেখা দিল। গুলচ ওকে আশ্রয় দেবে, ওকে রক্ষা করবে। গুলচ পাশে থাকলে ও কাউকে ভয় পায় না।

ও উঠে দাঁড়িয়ে বলল—"তুমি মনে কিছু কোরো না ককাইটি। রোজ ভাবি বলব, কিন্তু তোমায় একা পাই না। মাসীর সামনে কথাটা তোমায় কি করে বলি! তুমি বোসো, আমি চা করে আনি। ভাত খেয়েছ?"

তরা রান্নাঘরে চলে গেল।

এটা সেটা ভাবতে ভাবতে গুলচ বসে রইল। বুঝলাম,

তরা না হয় সুযোগ পায় নি বলে বলে নি কিন্তু কপাহী কথাটা জানাল না কেন? পয়সা নিয়ে তরাকে হাবাটার কাছে বিক্রি করার মতলব করছে না তো? মেয়েমানুষের মন বোঝা ভার, ধন দেখলেই অন্ধ।

—"তরা—" গুলচ ডাকল।

—"কি হয়েছে?"

—"তুই একটুও ভয় করিস না। বাইটি যদি টাকা নিয়ে সফিয়তের হাবাটার কাছে তোকে বেচে তো তোর মাসীকেও কাটব—যা হবার হবে—"

তরা কিছু বলল না।

এই মুহূর্তে তরার চেয়ে সুখী আর কেউ নেই। আজ ও একা পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে—ও আর হেরে যাবে না। সঙ্গে রয়েছে গুলচ।

তরা একবাটি নতুন ধানের চিঁড়ে এনে দিল, দুধ আর গুড়-ও। আর একবাটি চা। গুলচের সামনে আজ খুব সহজ হতে পেরেছে। ওর ভয়-ডর নেই। মনের কথা আজ গুলচকে খুলে বলেছে।

খেতে খেতে গুলচ বলল—"তুই একটুও চিন্তা করিস না। বুঝলি তবা, আমার বাড়িটা শেষ হোক, তোদের আমার কাছে নিয়ে রাখব। এখানে আর অন্যের কথা শুনে থাকতে হবে না জমিও খানিকটা বের করেছি। আমার আর কে আছে বল?"

গুলচের প্রতি আজ তরার যেন দরদ উথলে উঠছে। তাই তো, ওর সব থেকেও কেউ নেই। আজ ও একা। আর তরা নিজেও একা। মাসী শুধু সঙ্গে থাকে, শক্তি সামর্থ্য বলতে কিছু আছে নাকি?

কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে তরা বলল—"আর দুটো চিঁড়ে দেব?"

—"থাক্ আর লাগবে না। তাম্বুল থাকলে দে।"

বাটা থেকে একটা তাম্বুল নিয়ে তরা ওর হাতে দিল। তাম্বুলটা মুখে দিয়ে তরার দিকে তাকিয়ে গুলচ বলল—"তোকে আমি স্নেহ করি, বুঝলি তরা? গাঁয়ে আর কারো বাড়ি আমি যাই না। তোদের এখানেই শুধু আসি—"

এর চেয়ে সুন্দর করে গুলচ ভালোবাসার কথা বলতে শেখে নি। মমতায় ভরা চোখ দুটো মেলে ধরল তরা।

—"আমারও তোমাকে খুব ভালো লাগে—" তরা বলল।

নিঝুম দুপুর সাক্ষী রইল। গুলচ ও তরা মিছে কথা বলে নি।

—"আমি তবে এবার চলি, তুই কিছু ভাবিস না। বাড়ির কাজ শেষ হলেই তোদের নিয়ে যাব—"

একটু সময় তরা কি জানি কি ভাবল, তারপর বলল—"আমার হাতে আরো ছ'টা টাকা আছে।"

—"হুঁ, আছে তো রেখে দে। কোথায় পেলি?"

—"তাঁতে বোনা কাপড় বিক্রি করেছিলাম, দুধ বেচেও দু টাকা কি এক টাকা পেয়েছিলাম—"

—"ভালো করে রেখে দে, বিপদ-আপদে কাজে লাগবে।"

—"আমার লাগবে না। তুমি নিয়ে যাও—"

—"আমি? আমি কি করতে নেব? আমি সবসময় ঘুরে বেড়াই। পয়সা কোথায় রাখব?"

"রাখতে হবে না। তুমি একা কত কাজ করবে? ধান তুলবে, জমি বের করবে, না ঘর বানাবে? টাকা কটা নিয়ে যাও, কাউকে

খুঁটি-টুটি গুলো চাঁচতে দিয়ো। সব কাজ কি একটা মানুষ একা হাতে করতে পারে?"

তরা টাকা ক'টা আনতে যেতে চাইল।

—"তরা—" কঠিন স্বরে গুলচ ডাকল। ও ফিরে তাকাল।

—"পাগলামি করিস না। আমি যদি একা না পারি তো—অন্য লোক লাগাব। পয়সাও কোনোখান থেকে জোগাড় করে নেব। তোর পয়সা কটা থাক, রেখে দে। হাত শূন্য করে দিতে নেই।"

তরা বলল— "তোমার কষ্ট হচ্ছে বলেই আমি দিচ্ছিলাম। না নাও তো কি করতে পারি? পারলে কাজে একটু সাহায্য করতাম। কিন্তু তুমি আবার থাকতে গেলে ধনশিরির ওপারে।"

তরার গালে আলতো করে একটা চড় বসিয়ে দিয়ে গুলচ বলল— "ওরে আমার সাহায্যকরুনী রে, কী করে দিবি? খুঁটিগুলো চাঁচতে পারবি?"

তরা হেসে ফেলল।

গুলচ বলল— "আজ আর কাঠ কাটা হল না। তোর সঙ্গে গল্প করেই সময় কাটালাম। এবার যাই—"

—"কাজের ক্ষতি করে আস কেন! এসো না।" তরা বলল।

"না এসে যে পারি না—" গুলচ এক গাল হেসে বলল।

বিদায় দেয়ার সময় তরা বলল— "ককাইটি, তুমি কিন্তু আসা-যাওয়া রেখো। সক্ষিয়ত বুড়ো কী করে বলা যায় না। তা ছাড়া মাসীর মনটা আমি তেমন বুঝতে পারছি না। কোনোরকমে আমাকে গছিয়ে ঝাড়া-হাত-পা হতে চাইছে মনে হয়।"

"সবাইকে কেটে টুকরো টুকরো করব। তুই ভয় করিস না।

আমি আসা-যাওয়া রাখব। হাবাটার অন্য চোখটাও খোঁচা দিয়ে গালিয়ে দিলে তবে ঠেলা বুঝবে। যাই কেমন— থাক্।"

—"আ····· চ্ছা······" তরা টেনে উত্তর দিল।

গুলচকে আরও কিছুক্ষণ বসতে বলতে ইচ্ছে হয়েছিল ওর। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলল না। আড্ডা মেরে লাভ কি? জঙ্গলে গেলে তবু একটা খুঁটি অন্তত চাঁচতে পারবে।

নিঃসঙ্গ গুলচটার জন্য তরা আবার দরদে উথলে উঠল।

দশ

অঘ্রানের আটাশ তারিখে ওপারের গ্রামের মোলোকা মোড়লের ছেলে কলাই-এর সঙ্গে চেনিমাইর বিয়ে হয়ে গেল। চেনিমাই সফিয়তের ভাইয়ের মেয়ে। গুলচের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার পর অনেক চেষ্টা করেও এপর্যন্ত ডালিমগ্রামের কোনো ছেলের সঙ্গে চেনিমাইর বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারা যায় নি। বদনামী মেয়েকে বিয়ে করে কে সারাটা জীবন দুর্নাম কুড়োবে? তবু দু-চারটে সম্বন্ধ এসেছিল, কেউ বউ-মরা, কেউ আধা-বয়েসী। চেনিমাইর বাবার কাউকে পছন্দ হয় নি। পালিয়ে গিয়েছিল তো এমন কি হয়েছে? রাত্রে গেছে, ভোর বেলা ধরে নিয়ে এসেছি। জারজ তো আর বিয়োয় নি? গুলচের সঙ্গে গিয়েছিল বলে কি আর আমাদের মেয়ে ফেল্না?

সফিয়তের চাইতে চেনিমাইর বাবা দিদারতের ভাবনাই বেশি হয়েছিল। মেয়েটারও চিন্তা-ভাবনায় গায়ের রঙটা একটু ময়লা হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য ক্ষেতের কাজ-কর্ম বাদ দিয়ে বাড়িতে হাত গুটিয়ে বসে ছিল না। তা ছাড়া গাঁয়ের বেশির ভাগ বউ বা বুড়ীরা চেনিমাইর মতোই পালিয়ে আসা। চেনিমাইকে কথা শোনানোর তেমন সুযোগ নেই।

দিদারত কখনো কখনো নিজের মনেই আফসোস করে। গুলচের সঙ্গে গিয়েছিল—ওর সঙ্গে বিয়ে দিলেই ভালো হত। মিছিমিছি ছেলেটার মনটা ভাঙল আর মেয়েটারও দুর্গতি হ'ল। এখন আমার গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অবশেষে অনেক বুদ্ধি খরচ করে সফিয়ত বুড়ো চেনিমাইর সঙ্গে মোলোকার ছেলের বিয়ে পাকা করে ফেলল। পরিবারটা অবশ্য গরিব। কলাই-এর বয়েস তিরিশের মতো। অনেকদিন থেকেই কাশির রোগে ভুগছে— কেউ বলে শ্বাসের রোগ, কেউ বলে হাঁপানী। একবার গোলাঘাটে দেখানো হয়েছিল, ডাক্তার বলেছে টি.বি. নয়।

ডাক্তারী চিকিৎসা করার মতো সামর্থ্য ছিল না। তা ছাড়া গাঁয়ের কেউ এধরনের চিকিৎসা বিশেষ একটা করায় না। একবার ডালিমে টিকাদার টিকে দিতে এসে কোনোরকমে মার খেতে খেতে বেঁচে গিয়েছিল।

গাঁয়ের বৈদ্যকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে এপর্যন্ত কলাই কোনোরকম বেঁচে আছে। অসুখটা দাবিয়ে রাখার জন্য কলাই গাঁজা খায়, খেলে কাশিটা একটু কম থাকে। কলাই-এর মা নেই, বাবা মোলোকা। আর আছে একটি ভাই। পুরুষ মানুষের সংসার।

কলাই-এর গায়ের রঙ তেমন কালো নয়, শ্যামবর্ণ। তবে অসুখে অসুখে শাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মানুষটা এমনিতে লম্বা— তার ওপর রোগে ভুগে রোগা হতে হতে অস্থি-চর্মসার, দেখতে তাই আরো লম্বা লাগে।

ফ্যাকাশে ঠোঁট, নিস্তেজ চোখ, সরু-সরু হাত পা— কথা বলার শক্তি নেই। মুখ খুললেই কাশি ওঠে, কথা বলবার আর শক্তি থাকে না। প্রায় প্রতিটা রাত বসে কাটায়— শুলেই কাশি ওঠে। সর্ষের তেল ঘসে ঘসে গায়ে ময়লার আস্তরণ পড়েছে। বছরে তিন-চার দিন মোটে স্নান করে, স্নান করলেই কাশি বাড়ে।

রোগে ভুগে ভুগে দুর্বল হওয়ায় কলাই কথাবার্তায় বড়ো নম্র, কখনো কেউ ওর রাগ দেখে নি। এমন-কি গাঁজা খেলেও বড়ো একটা নেশা হয় না। বলতে গেলে সে অকেজো, মাঠে যেতে পারে না, বাড়ির ভেতরে-বাইরে কোনো শক্ত কাজ করতে পারে না। ওর কাজ আগুনের ধারে বসে রান্না-বান্না করা, রোদ থাকলে উঠোনে বসে ঝুড়ি-টুকরি বানানো, গোরুগুলোর দেখাশোনা করা ইত্যাদি। তবে এসব কাজ করতে পারে ব'লে শুয়ে থাকতে হয় না। পূর্ণিমা অমাবস্যায় কাশি বাড়ে, তখন গরম ছাইয়ের সেঁক নিয়ে শুয়ে থাকা ছাড়া অন্য কিছু করার ক্ষমতা থাকে না।

গুলচ কলাইকে ভালো করে চেনে। ওপারের গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে গুলচের পামের জমিটা। ওর বাসা থেকে কলাইদের বাড়ি একমাইলের বেশি না। মোলোকারও পাম আছে। মাঝে মাঝে মাঠে পথে মোলোকার সঙ্গে গুলচের দেখা হয়; গোরু চরাতে এলে কখনো কলাই-এর সঙ্গেও দেখা হয়। দুটো চালকুমড়ো

দিয়ে ও একবার কলাই-এর কাছ থেকে মাছ ধরার জন্য একটা চাই এনেছিল। বাঁশের কাঠির কাজে কলাই-এর হাত ভালো।

তবে কলাইকে দেখলে গুলচের মনে হয় ওর মরণ-দশা ঘনিয়ে এসেছে— এত রোগা আর এত দুর্বল। ওর গায়ের গাঁজা ও সর্ষের তেলের মিশ্রিত গন্ধ গুলচের অসহ্য লাগে। জোয়ান ছেলে, একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কি থাকতে পারে না?

এ হেন কলাই-এর সঙ্গে চেনিমাইর বিয়ের খবরটা চন্দ্র ও কপাহীর কাছে গুলচ জানতে পেরেছিল। খবরটা পেয়ে মনে যেন আঘাত পেল, দমে গেল।

ওর মনের অবস্থা অনুমান করেই হয়তো একদিন কপাহী হেসে হেসে বলল— "চেনিমাইর বিয়ের কথা শুনে তোর বুকটা বোধ হয় হু-হু করছে। সোমত্ত মেয়ে, বিয়ে না বসে কি ঘরেই আইবুড়ো হয়ে থাকবে? ইচ্ছে থাকলে একটু চেষ্টা-চরিত্র করলেই পারিস—"

বিরক্তি ও আক্ষেপের সুরে গুলচ বলল— "চেনিমাইর বিয়ে দিচ্ছে দিক, তাতে আমি দুঃখিত হই নি। কিন্তু কলাইটার শ্বাসের ব্যামো। ওর সঙ্গে কি করে ঘর করবে? ওকে দেখলেই মনে হয় এখন-তখন অবস্থা।"

কপাহী আর মস্করা করল না। এভাবে চোখের সামনে একটি যুবতী মেয়েকে দুর্ভাগ্যের মধ্যে ঠেলে দিয়ে পরিহাস করা বড়ো নিষ্ঠুরতা। চেনিমাইর জন্য কপাহীর মনে মমতা জাগল।

তখন আর কিছু করার উপায় ছিল না; বিয়েটা অন্য একজনের, দিচ্ছেও অন্যে, এর মধ্যে গুলচের কথার মূল্য নেই, কপাহীরও নেই।

মুখ ফুটে না বললেও একটা কথা গুলচকে তীব্রভাবে দংশন করতে থাকল: চেনিমাইর এই দুর্দশার জন্য আমি-ই দায়ী। ওকে

নিয়ে পালিয়ে না গেলে, ওর কোনো বদনাম হত না, আর সেক্ষেত্রে যে-কোনো পাত্রের সঙ্গে ওর বিয়েটা হতে পারত!

কিন্তু অনেক ভেবে নিজেকে আশ্বস্ত করল: দায়ী হলেও আমি পুরো দায়ী নই। বিয়ে করব বলেই আমরা পালিয়ে এসেছিলাম। আমাদের বুড়ো আর ওর বাবা দুজনে মিলে আমাদের আলাদা করে দিল। আমার কী দোষ?

তবু চেনিমাইর জন্য ওর কষ্ট হল। বেচারী মেয়েটাকে এই গাঁজা-খোর অসুস্থ লোকটার সঙ্গে মরণ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।

নিজেকে গুলচের অপরাধী বলে মনে হল, চেনিমাইর জন্য এক অব্যক্ত অন্তর্বেদনা অনুভব করল।

সঙ্গে সঙ্গে কলাই-এর জন্যও ওর কষ্ট হল। বেচারী জোয়ান ছেলেটাকে এই রোগে ধরল-ই বা কেন? ছেলেটা বড়ো শান্ত, নম্র। ওর ফ্যাকাশে মুখটার কথা মনে পড়তেই গুলচের কষ্ট হল।

বিয়ে হয়ে গেলে যা-হোক চেনিমাইর একটু সেবা-যত্ন পাবে।

নিজের মনের অবস্থাটা কপাহীকে বোঝাতে ও বলল— "চেনি কি আমায় অভিশাপ দেবে? আমি কিন্তু নিজে ওকে ছেড়ে দিই নি, ওর বাবাই ওকে কেড়ে নিয়ে গেল।"

কপাহী বলল— "যা হবার হয়ে গেছে, অন্যের কথা ভেবে লাভ নেই। অঘ্রান শেষ হতে চলল, মাঘেই নিজের সংসার পাতার ব্যবস্থা কর এখন। বাড়ি তৈরির আর কত বাকি?"

গুলচ তখনো চেনিমাইর কথাই ভাবছিল। বলল— "মনে হয়, কলাইরা আমার ব্যাপারটা জানে না। তা হলে বিয়েটা হয়তো হত না।"

—"ও-সব কথা ক'জন জানে? কে আর ও-সব কথা খুঁচিয়ে বার

করবে ? ডালিমের লোকের কাজকর্ম নেই বলে এর ওর কথা খুঁজে বেড়ায়। ওপারের লোকের এমন কী ঠেকা পড়েছে ?"

সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক কপাহীর কথায় গুলচ কিছুটা সান্ত্বনা পেল। চেনিমাইর বদনামের কাহিনী মোলোকারা না জানতে পারলেই হয়, শ্বশুরবাড়িতে খোঁটা-গঞ্জনার হাত থেকে রক্ষে পাবে। তা না হলে ওই ঘাটের মড়াটাও ওর সঙ্গে খ্যাচ্ খ্যাচ্ করবে।

কেউ কিছু জানতে না পারলে মাঝে মাঝে গুলচ গিয়ে চেনির খোঁজ-খবর করেও আসতে পারবে। ওর বাসা থেকে চেনিদের বাড়ি বেশি দূরে নয়। একই গাঁয়ের লোক বলে কখনো-সখনো যেতে পারবে, ওর সঙ্গে দেখা হলে হয়তো চেনির কষ্ট কিছুটা লাঘব হবে।

চেনিমাইর বিয়ে হওয়ার বেশ কিছু দিন পরেও গুলচের মনটা ভারী হয়ে রইল। এমন-কি পাকা ধানক্ষেতে ধান কাটার সময়ে চেনির কথা ভুলতে পারল না। বেচারীর জীবন ব্যর্থ হয়েছে, ব্যর্থ হয়ে যাবে। রোগীর সেবা-শুশ্রূষা ছাড়া বিবাহিত জীবনের কোনো আনন্দ, কোনো আস্বাদ পাবে না। কলাই না মরা পর্যন্ত এইভাবে আধ-মরা লোকটার সঙ্গে ওর জীবন কাটাতে হবে।

আমাকে ও ক্ষমা করবে না। চেনির সঙ্গে দেখা করতে গেলে, ও যদি আমায় অপমান করে তাড়িয়ে দেয় তো তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আমি-ই দায়ী, গুলচ ভাবল।

"দোষী আমি-ই"—গুলচ বলল।

এগারো

পৌষের শেষে প্রায় সকলেরই ধান তোলা শেষ হল। পৌষ-সংক্রান্তির বিহু পরবের আর বেশিদিন বাকি নেই। গুলচের ক্ষেত ছোটো, তাই ওর কাজ আগে শেষ হয়ে গেছে। তা ছাড়া একটু তাড়াহুড়োও করেছে। বাড়িটা শেষ করতে হবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়ির কাজ শেষ হল। খুঁটি, কড়িকাঠ কাঠের। বাড়িটা তেমন বড়ো নয়— তিনকোঠার হলেও কোঠাগুলো ছোটো ছোটো। ভবিষ্যতে বেশ বড়ো করে একটা ঘর তৈরি করতে হবে। সুযোগ এলে সময়ও পাওয়া যাবে। একটা উঠোন বের করল। কিন্তু যে-সব ফুল গাছ পুঁতবে ভেবেছিল তার চারা আর ধারে-কাছে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। পরে বুনবে। গাছ-সুদ্ধ ধান রাখতে হলে বড়ো গোলার প্রয়োজন, সামনের বছর গোলাঘর বানাবে। এখন সম্ভব না হলেও বর্ষার সময়ে গোরু-বাছুর-গুলোকে নিয়ে আসতে হবে, গোরু-বাছুর ঘরে না থাকলে কিসের সংসার! হাঁস-মুরগী রাখার জন্যও একটা খুপরি চাই। ছেলে-মেয়ে না হওয়া পর্যন্ত হাঁস-মুরগী, দামড়া-বক্‌না কয়েকটা ঘুরে না বেড়ালে উঠোনটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তবে আপাততঃ হাঁস-মুরগীর খুপরিটা না করলেও চলবে। মাড়ল ঘরের এক কোণে খাঁচার

মধ্যে রাখলেই হবে। আজকাল শেয়াল বনবেড়াল তেমন বেরোয় না।

তক্তাপোশ দুখানা লাগবে, তিনখানাও লাগতে পারে। একটাতে ও আর তরা শোবে, অন্যটায় কপাহী, আর তৃতীয়টা অতিথির জন্যে। মেঝেতে শোয়া যায়, তবে নতুন-বউ এনে মেঝেতে শোয়াটা ঠিক দেখায় না। সফিয়তের বাড়ির লোকেরা খাটে শোয়। তা তো শোবেই, অবস্থাপন্ন লোক, আমরাও একদিন করব।

ডালিমগ্রামের বাসায় দুখানা তক্তাপোশ আছে। একটা একটু পুরানো, পায়াগুলো নড়বড়ে। অন্যটা নতুন, ছ' টাকায় কিনেছিল। দুটোই নিয়ে আসতে হবে। গাড়ি, নৌকো আর কাঁধে করে কোনো রকমে আর-কি নিয়ে আসতে হবে। নতুন সংসার পাততে চাইলে একটু কষ্ট তো করতেই হবে।

শুধু একটা অসুবিধের কিভাবে সমাধান করবে গুলচ ভেবে পেল না। ধারে কাছে একটা পুকুর নেই। বাড়ি থেকে নদীটা একটু দূরে— দেড়-দু ফার্লং মতো। জল টেনে টেনে দুটি মেয়েমানুষ ঘেমে নেয়ে উঠবে। ঘরের ভিত করার জন্য কাটা গর্তটা আর-একটু গভীর করতে পারলে জল বেরতে পারে। কিন্তু একা ও বাড়িটা করবে, পুকুর কাটবে? বড্ড খাটুনি পড়েছে। তবে বাড়িতে জলের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

তা বলে নদীটাকে বাড়ির বুকের কাছে সে চায় না। নদী যত দূরে যায় যাক-না। নদীর জল ওর জমিটা স্পর্শ না করলেই ও বাঁচে। ধনশিরিকে ভালোবাসে বলেই ভরসা ক'রে নদীর পারে সংসার পাততে চলেছে, ধনশিরি কি এখন ওর সঙ্গে শত্রুতা করবে?

কোনো কোনো জমিতে ধান কাটা হয়ে গিয়েছিল, কোনোটাতে

বা হয় নি। এই পথে যেতে যেতে গুলচ একদিন মোলোকার বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়ল। ওদের বাড়ি ঢোকে নি। মোলোকার ছোটো ছেলে তিখরের সঙ্গে পথে দেখা।

—"ককাইটির কোন্ দিকে যাওয়া হচ্ছে?" তিখর জিজ্ঞেস করল।

—"এই একটু বেতের খোঁজে বেরিয়েছি। এদিকে জরধদের বাড়িতে নাকি আছে। তোরা সবাই ভালো আছিস তো?"

—"হ্যাঁ, তবে ককাইটির শরীরটা তেমন ভালো নেই। বাড়ির কাজ শেষ হল?"

—"করছি আর-কি কোনো রকমে, একা মানুষ তো!"

—"এসো, একটু বসে যাবে না?" তিখর বলল।

—"এখন আর ঢুকব না রে, অনেক বেলা হল। পেলে জরধদের বাড়ি থেকে একটু বেত নিয়ে যাই। অন্য সময় আসব।"

—"আমিও তোমাদের ওদিকে যাব যাব করছি। ঠেলে বেরিয়ে পড়তে পারলেই হয়। একদিন আসব।"

জিজ্ঞেস করব কি করব না করে গুলচ জিজ্ঞেস করে ফেলল —"তোর ন-বউ কেমন আছে?"

—"ভালোই আছে। বুঝলে ককাইটি, ন-বউ বাড়ি আসার পর আমি ছুটি পেয়েছি। রান্না করে করে আমার কোমর বেঁকে যাচ্ছিল আর-কি—"

গুলচ আর-কিছু জিজ্ঞেস করল না, বেতের খোঁজে গ্রামের ভেতরে চলে গেল। গাঁয়ের একপ্রান্তে, গাঁয়ে ঢোকার পথে মোলোকাদের বাড়ি।

দেখতে-শুনতে তিখর ছেলেটা মন্দ নয়, স্বাস্থ্যও ভালো। গায়ের

রঙটা অবশ্য কালো। কথাগুলো একটু টেনে টেনে বলে। রান্না-বান্না, জল-টানা আর এ-ধরনের কাজ-কর্ম করে বলে যেন একটু ঢিলে প্রকৃতির। নিজহাতে রান্না করে খায়, তাই হয়তো এটা-ওটা খেতে খেতে ভুঁড়িটা বেড়েছে। মোটাও হয়েছে। জোয়ান ছেলে, তেইশ-চব্বিশ বছর বয়েস।

গুলচ ভাবল— ঘর ছাওয়ানোর সময়ে তিখরকে ডাকবে। ছাইতে না জানলেও খড়গুলো অন্ততঃ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে পারবে। একটু সাহায্য হবে। এ-সব কাজ একা একা হয় না। ওপারের গ্রামেরই আরো দু-চারটে জোয়ান ছেলেকে ডাকতে হবে! আজকাল চন্দ্র কোথায় কী করে বেড়াচ্ছে কে জানে? ওর সঙ্গে দেখা হলে একটু হয়তো সাহায্য পাওয়া যেত। তবে সে মিছেমিছি গালাগাল করে।

চেনিমাই বিয়ের পর দেখতে কেমন হয়েছে, গুলচের ইচ্ছে হল একটু দেখে। কিন্তু ওদের বাড়ির সামনে আসতেই ওর মন ভেঙে গেল। কলাই-এর সঙ্গে ওর আলাপ-পরিচয় অবশ্য আছে। মোলোকার সঙ্গেও দু-চারবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। তিখরও অচেনা নয়, তবে নিজে থেকে এসে চেনিমাইর খবর করলে অন্যেরা কি ভাববে কে জানে! চেনিমাই-ই বা কি ভেবে বসে। কম কথা বলা ওর স্বভাবই, মন ভরে থাকলেও মুখে রা নেই— তা না হলে বাপকে কি আর দু-কথা বলতে পারত না! অসুস্থ কলাইটার সঙ্গে বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে হাঁ বা না, কিছু তো বলতে পারত। কথা না বলাটাই ওর রোগ।

উঠোনে বসে বেত চাঁচার সময় আজ গুলচের চেনিমাইর কথা খুব মনে পড়ছিল। মা-মরা মেয়ে। সৎ-মা আছে— ভীষণ কড়া, বাপ-জ্যাঠা দু'জনই সাক্ষাৎ যমদূত, ছেলেপেলেরা বাঘের মতো ভয় পায়।

এমন একটা সংসারে বড়ো হয়ে চেনিমাই বোবার মতো থাকে ; সেই কাক-ডাকা ভোর থেকে শুরু করে পেঁচার ডাক না শোনা পর্যন্ত মুখ বুজে বাড়ির কাজ-ই করে যায়— ধান-ভানা, জল-আনা, চারা-ধান রোয়া, মুগা-সুতো কাটা, তাঁত-বোনা। হাত দুটো মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম পেত না, কথাবার্তা বলার ওর সময় কোথায় ? এর-ই ফাঁকে ওর গুলচের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। গুলচ-ও বেশি কথা বলার মানুষ নয়, ভাবে বেশি। মা-ই কাজকর্ম করে। বাবার সংসারে থাকতে অন্যেরা কাজ করত। বাড়ি আসত শুধু ভাতটা খেতে। তারপর বনে-জঙ্গলে, পথে-মাঠে, নদীর ঘাটে, বালুচরে ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাত ; মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে অভ্যস্ত বলেই হয়তো ওর মনটা এত নরম। সবার সঙ্গে থাকলে মনটা যে বিরক্তিতে ভরে ওঠে না এমন নয়, কিন্তু আকাশের দিকে, বন-জঙ্গলের দিকে, নদীর দিকে তাকালে যেন ছোট্ট ছেলেটির মতো হয়ে যায়, মনটা তখন ওর বড়ো নরম হয়ে আসে, হাঁ করে চেয়ে থাকে, খাওয়া-শোয়ার কথা ভুলে যায়।

বর্ষার সময়ে ধনশিরি জলে ভরে গেলে পাড়ে দাঁড়িয়ে আনন্দে লাফাতে থাকে। ফাল্গুনের ঝিরিঝিরি হাওয়ায় একা একা নাচে। এমন-কি কখনো কখনো শ্রাবণ মাসে ঝমঝম বৃষ্টি নামলে ঘরে না ঢুকে বাইরে বৃষ্টির জলে স্নান করতে বেরিয়ে পড়ে, হা হা করে হাসে, আনন্দে চেঁচিয়ে ওঠে।

আপনমনে গান গায়— আদি-অন্ত শূন্য গান। নিজেকে নানা কাহিনী শোনায়— নিজের মনের আশা-নিরাশার কথা, দুঃখ-বেদনার কথা। গুলচ একা ঘুরে বেড়ায়— আপন মনে।

এর-ই ফাঁকে চেনিমাইর সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছিল, চেনিমাইকে

ওর ভালো লেগেছিল, চেনিমাইর-ও ওকে ভালো লাগত— যদিও এই ভালো লাগার কথা প্রকাশ করতে জানত না। ওদের মনের মিল হয়েছিল, তুজনে সংসার পাতার স্বপ্ন দেখেছিল। কথাটা এ-কান-ও-কান হয়েছিল। তবে অনেকদিন থেকে তু-বাড়ির তু-বুড়োর মধ্যে একটু খিটিমিটি চলছিল। গুলচের সঙ্গে চেনিমাইকে বিয়ে দেবে না।

একদিন রাতে তুজনে পালিয়ে গিয়েছিল, একটা রাত চেনিমাইকে বাহুবন্ধনে ধরে রেখে গুলচ ওর বুকভরা ভালোবাসা উপলব্ধি করেছিল; কিন্তু সেদিনই প্রথম আর সেদিনই শেষ।

চেনিমাই কিছু বলল না।

অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে না পেরে গুলচ বাপের সংসার থেকে সরে গেল। কার জয়, কার পরাজয় হল কেউ বুঝতে পারল না।

চেনিমাইকে কলাই-এর হাতে দিয়েছে, হয়তো গুলচ-ও একটি মেয়েকে ঘরে আনবে। তুজনেই কাছাকাছি থাকবে। কিন্তু তুজন তুবাড়িতে, অচেনা মানুষের মতো ওদের বাস করতে হবে। আগের পরিচয়ের কথা ভুলে যেতে হবে, গুলচকেও চেনিমাইকেও।

গুলচের মনটায় একটা যেন ভারী বোঝার ভার নেমে এল।

বারো

নদীর পাড়ে ন্যাড়া শিমূলের ডালে লাল ফুল ফোটার সময় এল চলে। পাতা-ঝরা গাছগুলো নতুন কচি-পাতার আরাধনা করছে।

শীর্ণ ধনশিরি, স্ফটিক স্বচ্ছ নীল জল। খটখটে শুকনো খাড়া পাড় পড়ে আছে— বুকে আকণ্ঠ তৃষ্ণা। একদিন ধনশিরি ভরে উঠবে, খাড়া পাড়ের শুকনো বুক ভিজিয়ে দেবে।

জলের খোঁজে আসা বনহরিণীর পায়ের চিহ্ন নদীর বালুতে। ওরা দল বেঁধে আসে, জল খায়, চলে যায়। স্থির পাখা মেলে শকুনেরা নির্মেঘ আকাশের বুকে উড়ে বেড়ায়। ওদের চোখ নিচের বালুচরে —কোথাও আহার পাওয়া যায় কি না।

বনের ভেতর জংলী পাখিগুলো আপনমনে কিচিরমিচির করে। ওদের কণ্ঠে বসন্তের অভ্যর্থনার সহজ উন্মাদনা। নিস্তব্ধ দুপুরবেলা একজোড়া ঘুঘু ডাকে— পৃথিবীতে আর যেন কেউ নেই, কেবল ওরা দুজনেই।

কোনো বিহু-পাগল জোয়ান ছেলে বনগীত গায়— দগ্ধ হৃদয়ের কাহিনী বলে যায়, পোড়া কল্‌জের খবর ছড়ায়, ওদের গানের সুরে ইনিয়ে-বিনিয়ে যেন কান্না ঝরে পড়ছে।

যুবতী মেয়েরা নতুন ধানের ভাত খেয়ে লালচে ঠোঁটে অকারণে হৈ হৈ করে হাসে। ফাগুনের কাঁচা রঙ ওদের হাসিতে। আনন্দে, আহ্লাদে আটখানা, মনে ওদের হাজার রামধনুর ছোঁয়াচ। একজন আর-একজনকে ক্ষেপায়, একজন আর-একজনকে চিমটি কাটে, কানে কানে কথা বলে। গাঁয়ের ফোকলা-বুড়োদের সঙ্গে সদ্য যুবতীদের নাম জুড়ে দিয়ে ক্ষেপায়, একজন আর-একজনের গায়ে ঢলে পড়ে। মনের উপচে পড়া আনন্দে ওদের চোখ মুখ ঝলমলিয়ে ওঠে, হাসিটি ঠোঁটে লেগেই থাকে।

গুলচের মনটাও নাচে, ওর মন-ও অকারণে কথা কয়ে ওঠে। বুকে ওর সাত-বিহুর ঢোল-পেঁপা বাজে।

গুলচ চেনিমাইর কথা ভাবে না, কপাহী বা তরার কথাও ভাবে না। ওর উড়ু-উড়ু মন কিছু না ভেবেও সব কথা ভাবতে চায়। মন উড়িয়ে-নেয়া গাংচিলের সাদা পাখার ঝাপটায় ও যেন নিজেকে খুঁজে পায়। ধনশিরির পাড়ে একলা বসে থাকে, কোন্ এক অস্তগিরির সদাগরের ডিঙা বুঝি ঘাটে লাগল, তারই স্বপ্ন দেখে। সদাগরের পানসীতে সাত রাজার ভাণ্ডারের হীরা-মাণিক-মুক্তো। যা, ধামা আর ডালি ভরে মুক্তো নিয়ে যা।

তুপুরের মিষ্টি রোদের সঙ্গে ধান-কাটা মাঠের মিতালী। গোধূলির কুয়াশা বিরিণার পাতা-ঝলমা মুথাগুলোকে ঘুমপাড়ানি গান শোনায়। রাতের ফ্যাকাশে তারাগুলো ধনশিরির বুকে জলকন্যার প্রাসাদের দোরগোড়া খোঁজে। আঙিনার সামনে খড়ের স্তূপটায় রোদের তেজ বাড়তে থাকে। ডালিমগ্রামে, ওপারের গ্রামে, ধনশিরির পাড়ের নতুন-আবাদী জমিতে শীতের শেষের কোমল ঝিরঝিরে হাওয়ার ছোঁয়া লাগে।

তুধ-চোষা বাছুরগুলোর মুখ ফেনায় মাখামাখি। মায়েরা চেটে-চেটে ওদের গায়ের লোম খাড়া করে তোলে। বাচ্চাগুলো লেজ তুলে অকারণে ছুটে বেড়ায়।

গুলচের মনটাও লেজ তুলে ছুটে বেড়ায়।

ওর উঠোনের ধুলো নরম নরম মনে হয়।

কখনো কখনো সারাটা দিন কাজকর্ম না করে বসে বসে কাটায়। ইচ্ছে না হলে কাজ করতে হয় না— ব্যস্, আমরা কি আর কারো গোলাম? তরারা এলে আর রান্নাঘরে ঢুকব না, মা থাকতে যা হোক রান্নাটা করতে হ'ত না। তবে, ভাত যখন ফোটে, দেখতে কী যে ভালো লাগে। বুড়বুড়, ভুটভুট। সুন্দর একটা ফরফরে

গন্ধ নাকে আসে। ভাতের ফ্যান হাঁড়ির পাশ দিয়ে গড়িয়ে এসে আগুনে পড়ে। বসে বসে দেখতে গুলচ খুব ভালোবাসে। অনেক কিছু কাজ সে হুড়মুড় করে করতে চায়। আবার কিছু না করে ওর মন অকারণে ঘুরে বেড়ায়।

একদিন চন্দ্রর খোঁজে গুলচ ডালিমে গেল।

চন্দ্র বাড়িতে ছিল না, 'গোলা'য় গেছে— আজ তিনদিন হল। গাঁয়ের মেয়েদেরও স্কুলে পড়াতে হবে বলে কি জানি এক সভা করে সে নাকি বলে বেড়াচ্ছে। লজ্জার কথা, ছেলেরা এক-কেলাস, দু-কেলাস পড়ে, মানায়। মেয়েরাও কি স্কুলে পড়বে? চন্দ্রর শরীরে শহরের হাওয়া লেগেছে, সে গ্রামের কী করে ঠিক নেই।

গাঁয়ের মাঝ-বরাবর সড়কটার ভার নেয়ার জন্যও নাকি সরকারের কাছে দরখাস্ত করেছে। একটা ডাকঘর চাই, গাঁয়ে একটা হাসপাতাল চাই। ছেলেটার যে কী হল, কম সাহস নয়। গাঁয়ের একপাল ছেলে-ছোকরাকে দলে টেনেছে। দোলের সময়ে নাকি থিয়েটার করবে, না-দেখা না-শোনা যত সব কাণ্ড! ডালিমগ্রামে ঠাকুর-দেবতা এলে ভাওনা হয়। ভাওনা না হলে ছেলেরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বচন বলে বেড়ায়— 'কে তুই দুরাচার, এইবার তোর নাহিকো নিস্তার'—

কিন্তু থিয়েটার?

চন্দ্রটা পাগল না হলেই হয়।

দু-চারটে মেয়েও নাকি দলে ভিড়েছে। একাধারে সব গোল্লায় যাবে।

চন্দ্রর সঙ্গে গুলচের দেখা হল না।

কিন্তু চন্দ্রদের উঠোনে বাহাদুর ওঝাকে পাওয়া গেল। ওঝারা

অসুখ-বিসুখের চিকিৎসা করে, ভূত-প্রেত তাড়ায়, তুকতাকের জোরে হারানো জিনিসের সন্ধান দেয়। আর হাতের তেলোর রেখা দেখে ভাগ্যের কথা বলে। হাতটা এগিয়ে দিয়ে গুলচ ওঝার সামনে বসল।

চন্দ্রর মা বলল— "জোয়ান ছেলের আর কী হতে পারে? একটা বিয়ে ভেঙে গিয়ে আইবুড়ো হয়ে বসে আছে— ওর সংসারটা কবে হচ্ছে দেখে দিন—"

— "দু আনা পয়সা লাগবে—" ওঝা বলল।

গুলচের মুখটা একটু চুপসে গেল। হাতে পয়সা না থাকায় একটু কাঁচুমাচু।

—"দেখে দিন-না, যদি লেগে যায় তো আমিই নাহয় দিয়ে দেব—চার আনা—" চন্দ্রর মা বলল।

গুলচের মুখে হাসি বেরল। চন্দ্রর মা বড়ো ভালো লোক।

হাতের রেখাগুলো বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখে গম্ভীর হয়ে ওঝা বলল— "তোর ভাগ্যটা তো কম নয়। বেশ সুখেই দুটো খেতে-পরতে পারবি দেখছি। সংসারও হবে, এই যে দেখতে পাচ্ছিস না এই রেখাটা— শিগগিরই তো হবে মনে হচ্ছে, মেয়েটাও লক্ষ্মী। তবে একটু সাবধানে চলিস, কেউ ঠকাতে পারে। না— না— ভয়ের কোনো কারণ নেই, সুদিন আসবে, সুদিন। জমজমাট সংসার হবে।"

আরো অনেক কিছু বলল, গুলচের ভালো লাগল না। অবশ্য ওঝা যে কী বলল গুলচ পরিষ্কার করে বুঝতেই পারল না, ওঝাদের ভাষা এই রকমই।

চন্দ্রর মা জিজ্ঞেস করল— "কিন্তু ওর বিয়েটা হচ্ছে কবে?"

একটু হেসে ওঝা বলল— "জোয়ান ছেলের আবার বিয়ে কি? যখনই একটা মেয়ে আনবে তখনই হবে, চিন্তা কিসের?"

একটু ঘোরাঘুরি করে সন্ধে নাগাদ সে কপাহীদের বাড়ি গেল। মা-মেয়ে বাড়িতেই আছে, তরা ছ-কঠিয়া কাপড় বুনছে তাঁতে। সন্ধে অবধি বুনে সবে উঠেছে—গুলচকে দেখে ভেতরে এল। আগে তরাই বলল— "ককাইটি, কোথাও গিয়েছিলে?"

—"কোথায় আর যাওয়া! কাজ থেকে কি রেহাই আছে? তোদের খবর ভালো তো?"

কপাহী উত্তর দিল— "আছি কোনোরকম, বাড়িটার আর কত বাকি?"

—"আর বেশি বাকি নেই—তরা একবাটি জল খাওয়া দিকি—বড্ড ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে আজ—"

কপাহী বলল—"তোর ককাইটির জন্য একমুঠো চাল নিস— রাতে এখানে খাবে।"

তরা আর বসার সুযোগ পেল না। পিদিমটা জ্বালিয়ে পিলসুজের ওপর রাখল। তারপর রান্নাঘরে ঢুকল।

কপাহী একবাটি জল এনে গুলচকে বসতে দিয়ে নিজে ওর গা ঘেঁষে বসল।

—"বাড়ির কাজ শেষ হয়ে এল কি?"

—"চাল আর বেড়া হয়ে গেছে। ছাউনি এখনো হয় নি। দিন কয়েকের মধ্যে হয়ে যাবে। ধান-চাল তোলা হয়েছে?"

—"হুঁ!" কপাহী ভেতরের দিকে এক পলক চেয়ে নিয়ে বলল— "এদিকে কি আবার গাড়ি আসবে?"

—"গাড়ি? হুঁ, আনতে হবে, ঘরটাতে দুখানা তক্তাপোশ

আছে। আগড়-বাগড়ও কিছু আছে। এখানে থাকলে তো সব নষ্ট হবে।”

—“আমাদের ধান বস্তায় ভরে রেখেছি। গাড়িতে তুলে দেব। সময় থাকতেই পাঠাতে হবে।”

গুলচের মন আনন্দে ভরে উঠল, কপাহীকে ওর আরো ভালো লাগল— “আর কিছু আছে?”

“এখানেও এটা-ওটা আছে। এক গাড়ি মতো হবে।”—মালপত্র-গুলো পার করাতে পারলে কপাহী আর তরাকে নিয়ে তেমন চিন্তা নেই—

গুলচ চুপ করে রইল।

হয়তো দেয়ালের ওধার থেকে তরাও ওদের কথাবার্তাগুলো কানপেতে শুনছিল, সেদিক থেকেও কোনো সাড়াশব্দ নেই।

কপাহী বলল— “অত ভাবতে হবে না, আমরা আর কাকে জিজ্ঞেসবাদ করব, নিজেদের মন ঠিক থাকলেই হল—”

গুলচ কোনো উত্তর খুঁজে পেল না।

ওর নিজের মন ঠিক-ই আছে, কপাহীদের জন্যই চিন্তা ছিল, আজ সে চিন্তা দূর হল। এখন সুযোগ সুবিধে মতো যত তাড়াতাড়ি পারা যায় তরাদের নিয়ে যেতে হবে।

দুজনের মধ্যে আরো অনেক কথাবার্তা হল। তরা ওদের কথায় অংশ গ্রহণ করতে চাইল না, ওর লজ্জা করছিল।

একটা জিনিস তরা অবশ্য লক্ষ্য করেছিল। কিছুদিন থেকে গুলচ ও কপাহীর কথাবার্তা কেমন জানি একটু অন্য ধরনের লাগে। গুলচকে আর আগের মতো কপাহীকে বাইটি বলে ডাকতে তরা শুনছে না। কপাহীও গুলচকে তুই-তুমি বলে না, নাম ধরেও

ডাকে না। কথাগুলো কেমন জানি মাঝ-পথ ধরে চলে। সম্বন্ধ পালটানোর সময় এখন আগতপ্রায়, তাই ওদের কথাবার্তার সুরও পালটে গেছে।

তরা খুশি হল।

ওরও লাজুক লাজুক ভাব। গুলচকে দাদা বলতে আজকাল একটু যেন সঙ্কোচ হয়। কিন্তু আর কী বলে ডাকবে?

খেতে দেয়ার সময়ে তরা একবার গুলচের মুখের দিকে তাকাল। সুন্দর দেখাচ্ছে। মুখে কেমন একটা লালচে রঙের আভা লেগেছে। তাই তো, বিয়ের আগে মনের আনন্দে মানুষের এমন হয়। গুলচ কিন্তু তরার সামনে গম্ভীর হয়ে থাকে। তা হোক, মাসীর সামনে হাল্কা হাসি-ঠাট্টা ঠিক যেন মানায় না।

থালা-বাসন মাজতে তরা পেছনের উঠোনে চলে গেল। কপাহী গুলচের কাছে এসে ফিস ফিস করে বলল— "জিনিসপত্রগুলো সময় থাকতে সরিয়ে ফেলতে হবে। বিহুর পরেই ও-গাঁয়ের মসজিদে বড়ো ভোজ। তখন এদিকটাতে বেশি লোকজন থাকবে না। আমরা চলে গেলে কেউ জানতেই পারবে না।"

গুলচ সংক্ষেপে বলল—"ঠিক আছে।" কৌতূহল না চাপতে পেরে জিজ্ঞেস করল, "তরা জানে?"

—"জানুক বা না-জানুক, তা দিয়ে কী হবে? আজকালকার মেয়ে, জানে কি আর না? ও-সব চিন্তা করতে হবে না।"

গুলচ কপাহীর দিকে মুখ তুলে চাইল। কপাহীটা দিন দিন যেন সুন্দর হচ্ছে; গোলাপের মতো মুখখানা লাল, বুকটাও সুন্দর। একটু ঝুঁকে ওর মুখের সামনে মুখটা এনে হেসে হেসে কপাহী বলল, "কী দেখছিস?"

হাত দিয়ে চোখ দুটো ঢেকে বলল—"ওরা এক্ষুণি আসবে, আজ যা— আমার গায়ের দিকে অমন করে তাকিয়ে থাকতে হবে না।"

চোখের ওপর থেকে কপাহীর হাতটা সরিয়ে দিয়ে গুলচ আবার ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল—"ভোজের দিন তা হলে?"

"হুঁ, একটু রাত করে এলে ভালো হয়।"

ওরা এল।

গুলচ ওর সঙ্গে দেখা করে যেতে চাইল।

একটু সাহস সঞ্চয় করে ওরা বলল—"বিহুর আগে পারলে একদিন দেখা করে যেয়ো ককাইটি।"

—"কেন রে?"

—"একটা কথা ছিল, এলে তো বলব।"

গুলচ শুধু বলল—"আচ্ছা— তবে এখন চলি।"

তেরো

পৌষ-সংক্রান্তির তিনদিন আগে বৃষ্টি নামল।

প্রথম দিকে ঝম ঝম প্রচণ্ড বৃষ্টি, তারপর টিপ টিপ— শেষের দিকে অবিরাম দিবারাত্রি। হাড়-কাঁপানো শীত, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া। শীতের শেষ মার, মেজীতে আগুন দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতের তীব্রতা কমে আসবে।

গুলচের ঘরে ছাউনির কাজ শেষ। ওর মনে খুব আনন্দ। বৃষ্টিটার আগে ছাউনি না দিতে পারলে খুবই অসুবিধায় পড়ত। মেঝেটা ভিজে যেত। বেড়া না থাকা চালাঘরটায় শীতে কাঁপতে হত।

পুরানো এণ্ডিচাদরটা গায়ে জড়িয়ে গুলচ বসে ছিল। ওপারের গ্রামের দিক থেকে চন্দ্র এল— সঙ্গে তিখর। টিপ টিপ বৃষ্টিতে দুজনেই ভিজে গেছে।

গুলচ গন্‌গনে আগুন জ্বালাল। তিনজনে মিলে আগুনের চার পাশে বসে হাত-পা সেঁকতে শুরু করল।

—"তুই নাকি একদিন আমার খোঁজে গিয়েছিলি?"—চন্দ্র জিজ্ঞেস করল।

—"একদিন কি, দু-তিনদিন। আজকাল তোর পাখা গজিয়েছে নাকি রে? ছায়াটি পর্যন্ত দেখা যায় না। গিয়েছিলি কোথায়, আর এখন-ই বা এলি কোত্থেকে?"

—"টাউনে গিয়েছিলাম, মেনি ওয়ার্ক— বুঝলি, অনেক কাজ। পি. ডব্লিউ.কে বলে এসেছি, আমাদের এখানে ডালিমের ঘাটে ধনশিরির ওপর দিয়ে একটা পুল এবছরই চাই। এপার ওপার একটাই গ্রাম— ওয়ান ভিলেজ, নদীটার জন্যই দুটো হয়ে আছে। ব্রীজটা হয়ে গেলে একটা গ্রাম হয়ে যাবে। ডালিম আর ওপারের গ্রাম— ওয়ান ভিলেজ, কত সুবিধে হবে ভাবছিস?"

—"পুলটা হবে নাকি?"

—"বলার সঙ্গে সঙ্গে কি আর হবে? হাজার হাজার টাকা চাই। ছোটো পুল হবে ভাবছিস? তবে, না হওয়া পর্যন্ত ছাড়ছি না। এবছর না হলে নেক্‌স্ট ইয়ার হবে। তোর বাড়িটা তো হলই দেখছি," চারিদিকে চোখ বুলিয়ে চন্দ্র বলল।

বিড়ি বের করে তিখরকে একটা আর গুলচকে একটা দিল। নিজেও একটা জ্বালাল।

তিনজনে মিলে বিড়ি টানতে লাগল— নীরবে।

—"একটু চা করব নাকি, বড্ড শীত পড়েছে—" গুলচ জিজ্ঞেস করল।

—"কর-না একটু, কর, আমারও বড্ড শীত করছে। চা পাতা আছে তো?"

—"আছে, তুই গুড়ের চা খাস তো?"

—"গুড়ের না খেয়ে কিসের খাব; হোটেল পেয়েছিস যে চিনির চা খাব?"

গাঁয়ে চিনির চা খাওয়াও একটা বিলাসিতা, চন্দ্র এখনো অতটা বিলাসী হয় নি।

তিখর বলল— "আমি বাড়িটা দেখাতে এসেছিলাম, এখন যাই। গোরু-বাছুরগুলো নিয়ে আসি।"

"একটু বোস, এখনো বৃষ্টি পড়ছে. ভিজে যাবি।"

তিখর অবশ্য বসল না।

সে চলে যাওয়ায় গুলচ খুশি হল।

—"মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করিস—" গুলচ এমনি বলল।

—"কতটা জমি বের করলি?" চন্দ্র জিজ্ঞেস করল। জমির কথা শুনে গুলচ হেসে ফেলল। সব বলার পর চন্দ্রর পরামর্শ চাইল, কী করে নতুন জমিটার, আর আশে-পাশে বের করা যাবে এরকম জমির, পাট্টা করা যায়।

চন্দ্র আশ্বাস দিল, "ইউ ডোণ্ট কেয়ার, আমি করিয়ে দেব। এবছর আর করতে হবে না, কারণ তা করলে খাজনা ভরতে হবে।

সামনের বছর আরো জমি বের কর। সব একসঙ্গে পাট্টা করিয়ে দেব। এবার জমি হল, বাড়ি হল, বিয়ের কথা ভাবছিস কি না?"

গুলচ হেসে ফেলল।

—"এইজন্যই তো তোর কাছে গিয়েছিলাম।" কাঠখড়িগুলো আগুনে ভালো করে গুঁজে দিয়ে চন্দ্র একটু গম্ভীর হয়ে বসল। আর-একটা বিড়ি ধরালো। পকেট থেকে চিরুনিটা বার করে চুল-গুলো ঠিক করে নিল।

—"হুঁ—বল—"

—"একটা মেয়ে নিয়ে আসব ভাবছি—"

—"বিয়ে করবি?"

—"উহুঁ, কি করে আর বিয়ের ব্যবস্থা করি, মেয়েটি নিজে থেকে আসবে বলেছে।"

—"যদি অন্য বারের মতো হয়?" চন্দ্র সাবধান করতে চাইল।

—"হবে না মনে হয়, মেয়েটি ভালো—"

—"মেয়ে ভালো হলেই কী হবে? গার্জেন কী বলে—"

—"অন্য আর কেউ নেই—" গুলচ চন্দ্রর মুখের দিকে চাইল।

বিড়িতে টান দিতে দিতে চন্দ্র একটুক্ষণ কি যেন ভাবল। বাইরে বৃষ্টির দিকে চাইল, থামে নি। কনকনে হাওয়াও রয়েছে সেইসঙ্গে। কিছুক্ষণ পর চন্দ্র বলল— "হুঁ, ভালোই করেছিস। একটা মেয়ে নিয়ে আসা মন্দ না। তবে সব কাজ ভেবে-চিন্তে করতে হয়। থিংকিং গুড্। কবে আনছিস?"

—"এখনো ঠিক হয় নি। ডালিমগ্রামে ভোজ আছে— সংক্রান্তির দিনকয়েক পরেই, ভোজের দিনই আনব ভাবছি—"

—"মেয়েটা কী বলে?"

—"কী আর বলবে, রাজী আছে।"

—"ডু ওয়ান থিং, একটা কাজ কর। এখানে কি কোনো মৌলবী আছে?"

—"মৌলবী?" গুলচ চন্দ্রর মুখের দিকে তাকাল।

—"হুঁ, একটা মৌলবী ঠিক করে রাখিস। পরের মেয়ের সঙ্গে এমনি এমনি সংসার করবি? এসে পৌঁছেই মৌলবীকে দিয়ে নিকা করিয়ে নিস। তা হলে কেউ আর তোদের কিছু করতে পারবে না। চেনিমাইকে এনে যদি নিকা করতিস তা হলে কি আর এই গোলমাল হ'ত?"

গুলচের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কথাটা তো ওর মনেই হয় নি। নিকা করিয়ে নিলে ওদের সম্পর্কটা আরো পাকা হবে।

—"তাই তো, কথাটা তো তুই ঠিকই বলেছিস। আমাদের ওখানে মজফ্ফর মৌলবী আছে, তাকেই বলে রাখব—"

—"উহুঁ, মজফ্ফরকে বলিস না। সে দুদিকে তাল দেয়, আমি ওকে খুব ভালো করে চিনি। ওপারের গ্রামের ও-মাথায় সিদ্দিক মৌলবী আছে— সিলেটের লোক, তার সঙ্গে বন্দোবস্ত করে রাখিস। মেয়েটাকে ঘরে তুলেই প্রথম নিকা করিয়ে নিস।"

—"সিদ্দিককে আমি তো চিনিই না। তুই ব্যবস্থাটা করিস চন্দ্র।"

—"তুই কি একটা বুদ্ধু, তোর নিকার মৌলবী কি আমি ঠিক করব, আমি বললে আসবে কেন? ইউ ম্যারেজ, আই নিকা।"

—"না, ঠাট্টা করিস না চন্দ্র। তুই বললে আসবে, প্রয়োজন হলে চার আনা পয়সা বায়না দিয়ে আসিস।"

—"আচ্ছা, একটা ব্যবস্থা হবে। কিন্তু আনবি তো ভাগিয়ে,

বিয়ের তো আর ব্যবস্থা করছিস না। একটু সাবধান হয়ে চলিস। আরে যাঃ, আসল কথাটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি, মেয়েটি কে ?"

—"তুই চিনিস— এই যে কপাহী— ওরই— তোকে বলেছিলাম না!"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝলাম বুঝলাম। ভালো মেয়ে, তবে দুজনকেই আনতে হবে না ?"

"তা না হলে আর চলবে কি করে ? কাকে এনে কাকে ফেলে আসব ? বেলা কতটা হল রে ?"

—"কি জানি, আন্দাজে মনে হচ্ছে বিকেল, এবার যেতে হয়। রাতে খুব শীত হবে মনে হচ্ছে।"

—"আমিও যাই, ডালিমে একটু কাজ আছে।" গুলচ বলল।

—"যদি যাস তো মেইক হেস্ট কর, ফিরে আসবি না ওখানেই থাকবি ?"

—"থাকব না, ফিরে আসতে হবে, বাড়িটা কি এমনি ফেলে রাখা যায় ?"—দুজনে বেরিয়ে পড়ল।

—"একটা কথা, চন্দ্র—"

—"আবার কি হল ?"

—"দুটো জিনিসের ব্যবস্থা তো আর হল না।"

—"কি বাকি রইল ?"

—"পুকুর আর একটা ঢেঁকি।"

—"হয়ে যাবে'খন, বাড়ির গিন্নিকে আগে ঘরে আন। ঢেঁকি, পুকুর সব হবে, এখন থেকে সেই চিন্তায় শুকিয়ে মরতে হবে না।"

দুজনেই এগিয়ে চলল। বৃষ্টি একটু কমেছে, কিন্তু থামে নি। রাতে আবার মুষলধারে নামতে পারে।

পথে বিজ্ঞের মতো চন্দ্র বলল—"রিয়েলী বুঝলি, আমাদের মতো গ্রামের লোকের চারটে জিনিস না হলে চলে না, বেড্‌লী রিক্যোয়ার। কুড়াল, দা, কলমী আর ঢেঁকি, না হলেই চলে না।"

গুলচ বলল—"বাকিগুলো আছে। ঢেঁকিটা বসাতে পারলে হয় এখন। ডালিমের বাসায় পুরানো ঢেঁকিটা পড়ে আছে। ওটা নিয়ে আসতে হবে।"

ওর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চন্দ্র বলল—"সড়কটা ভালো করলে আমাদের এখানেও মোটর, বাস চলাচল করবে বুঝলি। তখন আর হেঁটে মরতে হবে না, ইচ্ছে হলে একটা রাইস-মিল খোলা যায়। আমি শহরে গেলে এই বিষয়টা নিয়ে কথাবার্তা বলে আসব।"

ওদের ছাড়াছাড়ি হওয়ার সময় হয়ে এল।

গুলচ বলল—"তুই কিন্তু সাহায্য করে দিস চন্দ্র। আমার আর কে আছে? পয়সা-কড়িও নেই। দুটো হাত দিয়ে আর কত রোজগার করা যায়? সিদ্দিক মৌলবীকে তুই নিয়ে আসিস। আমি ঘোরাঘুরি করার আর সময় পাব না।"

—"হবে রে হবে। তোর বিয়েতে আমি কি আর সাহায্য করব না? তবে দিনক্ষণ সব সময় থাকতে জানাস। আই হেল্প ইউ—নো এফরেড।"

চন্দ্র বাড়ি চলে গেল। মাথা পর্যন্ত এণ্ডি-চাদরে ঢেকে গুলচ কপাহীদের বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

নদীর ওপারে থাকতেই সন্ধে হয়ে এসেছিল। বৃষ্টি-বাদলের রতা, অন্ধকার হয়ে গেল। এদিক ওদিক তাকিয়ে গুলচ দেখল, শীত ও বৃষ্টির জন্য সবাই বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছে।

চোদ্দ

সফিয়ত বুড়ো নিজে আসে না। হাবাটাকেও পাঠায় না আজকাল, অন্য লোক লাগিয়েছে। আশা দিয়েছে, তরার বিয়ের পর কপাহীর-ও একটা ব্যবস্থা করবে। ওর আর এভাবে বিধবার মতো জীবন কাটাতে হবে না। চেষ্টা করে দেখবে যদি নাহর ওকে ফিরিয়ে নেয়। আজকাল ওর আগের মতো রাগ-গোসা নেই। সে যদি রাজী না হয় তো কপাহীর মতো মেয়েকে বিয়ে করতে কি আর কেউ বেরবে না? ওর রূপ-যৌবন একটুও কমে নি। এখনো দেখলে মনে হয় বয়েস ষোলো কি সতেরো। কে বলবে তিরিশের কাছাকাছি, আর বর্তমান যুগে তিরিশ কি একটা বয়েস? শহরের মেয়েদের জন্য এ বয়েসে পাত্র খোঁজা হয়। হাজারিকা হাকিমের মেয়ের তো সেদিন ছত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে হল।

তরার বিয়েটা আগে হয়ে যাক।

মাঝে মাঝে কপাহীকে সফিয়ত ডেকে পাঠায়, কপাহী যায়। চা ভাত খেয়ে আসে। কখনো কখনো ধান ভানে। ফেরার সময়ে মাঝে মাঝে এক আনা পয়সা তুলে দেয়। কুটুম্বিতার পথ পরিষ্কার করছে।

অবশ্য কপাহীর সামনে হাবাটার গুণকীর্তন করে যে কোনো লাভ

নেই সে-কথা সফিয়ত জানে। অতএব সে বিষয়ে কোনো কিছু উল্লেখ না করে নিজেদের বাড়ির অবস্থার কথা বলে। মাছ চাও না পুকুর চাও?

কপাহী এপর্যন্ত হাঁ না কিছু বলে নি। সুযোগ-সুবিধে দেখছে। মনের কথা সে কাউকে বলে না। অবস্থা দেখে ব্যবস্থা করবে। অবশ্য তরার একটা গতি হলে নিজের ব্যবস্থা সে নিজেই করে নিতে পারবে।

গুলচ যখন ওদের বাড়ি পৌঁছয়, কপাহী তখন ছিল না। সফিয়ত বুড়ো ডেকে পাঠিয়েছিল, বিকেলে বেরিয়ে গেছে। ফিরতে একটু রাত হবে। আজকাল রাতে ভাত খাইয়ে পাঠায়— বুড়োর দরদ বেড়েছে।

"ককাইটি নাকি?"

"হুঁ, বড্ড শীত। আগুনটা একটু বেশ করে জ্বালা দেখি— মাসী বাসায় নেই?"

তরা সব বলল; কপাহী সফিয়তের বাড়ি গেছে, শীগ্‌গির ফিরছে না। আর এসে পৌঁছলেও কোনো ভয় নেই। আজ বাদে কাল ওরা একসঙ্গে বাস করবে।

—"রাত বিরেতে আবার ওখানে গেল কেন?" আগুনে হাত দুটো সেঁকতে সেঁকতে গুলচ বলল।

—"আমি বলেছিলাম তো, দেরি হলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।"

—"ভয় করিস না, আর দেরি হবে না, বিহু সামনেই এর পরের শুক্‌কুর বার ভোজ—না? ক'টা দিন আর আছে?"

—"আমার যা ভয় করছে, মাসীও পরিষ্কার করে ওদের কিছু

বলে না। মিছিমিছি তু তু করছে। এরপর জোর করে ওরা কিছু একটা না করলেই হয়।"

—"কিছু একটা না-হয় করলই, তুই কি করবি?"—ঠাট্টা করে গুলচ বলল।

চোখগুলো ড্যাবা ড্যাবা করে গুলচের দিকে তাকিয়ে তরা বলল—"বলতে মুখে আটকাল না? বলবেই তো, পুরুষমানুষের আর কি? আমি কিন্তু অন্য মেয়ের মতো নই। তুমি নিয়ে গেলে যাব। আর কাউকে আমি মন দিই নি, দরদও নেই কারো প্রতি। তুমি নিয়ে না গেলে আর কারো কাছে যাব না। তোমার হয়েই থাকব, যেখানেই থাকি-না কেন—"

গুলচ তরাকে কাছে টেনে নিল।

—"ঠাট্টা করছি রে। তুই আমার না হয়ে আর কার হবি? যদি কোনো কারণে না হোস তবু তোকে ভালোবেসে থাকব। অন্য কারো সাথে পিরীত করতে তুই কি কখনো দেখেছিস?"

তরা গুলচের হাঁটুতে মাথা রাখল। গুলচ ওর মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করল।

—"তুমি আমায় ছেড়ে গেলে আমি বাঁচব না। আমাকে ধনশিরির বুকে পাবে।"

—"তুইও কিন্তু আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকিস না। আমি তোকে কখনোই ছাড়ব না—যা-ই হোক-না কেন।"

গুলচ তরাকে আরো কাছে টেনে আনতে চাইল।

নিজেকে সরিয়ে এনে তরা বলল—"এখনই এ-সব ঠিক নয়। মাসী এসে পড়বে, দেখি, হাতটা সরিয়ে নাও—"

—"রাগ করলি?" গালে গালটা রেখে গুলচ বলল।

নিজেকে গুলচের বুকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়ে তরা কিছুক্ষণ পরম তৃপ্তিতে চুপ করে রইল।

তারপর ধীরে ধীরে গুলচ বলল—"তরা, তোকে আমি কখনো ছেড়ে যাব না। তুই কি আমায় ছেড়ে যাবি?"

প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে নিবিড় আবেগে তরা গুলচের গলাটা জড়িয়ে ধরল।

ঘরের চালে ঝির-ঝির বৃষ্টির শান্ত নরম শব্দ, বেড়ায় ঠাণ্ডা হাওয়ার সোঁ-সোঁ আওয়াজ। আগুনের বুকে লাল উত্তাপ।

দুটি অন্তরের স্পন্দন এক হয়ে মিশে গেছে।

কোথাও একটা ফেউ ডাক দিল— দূরে। তরা ধীরে ধীরে গুলচকে ছেড়ে দিয়ে একটু দূরে বসল— আগুনে আর কয়েকটা কাঠখড়ি গুঁজে দিল। তারপর মাথা নিচু করে বসে রইল, যেন গুলচকে দেখে লজ্জা পাচ্ছে। মেয়েটি লাল হয়ে গিয়েছিল।

চোদ্দ বছরের একটি ছোটো মেয়ে এই তরা, কিন্তু বাড়ন্ত বলে মনে হয় ভরা যৌবন। আঁটো-সাটো পুষ্ট শরীর, হাত-পাগুলো গোল-গোল, ডালিম ফুলের মতো দুটি ঠোঁট— নিরীহ, গভীর, সুন্দর দুটি চোখ। চেয়ে থেকে গুলচের মন যেন ভরে না। কপাহীও সুন্দরী, কিন্তু ওর সৌন্দর্য অন্য রকম। কপাহীকে দেখলে লোভ হয়; তরাকে আদর করতে, কোলে নিতে ইচ্ছে করে, ওর সঙ্গে আবোল-তাবোল কথা বলতে মন চায়। তরা একটা বড়ো ছোট্ট মেয়ে।

—"এবার তা হলে আমি যাই, তরা—"

—"ভাত খেয়ে যেয়ো— তা নাহলে কোথায় খাবে, যা শীত পড়েছে।"

—"হয়ে গেছে যদি, দে তা হলে—"

খেতে বসে গুলচ বলল—"ভোজের দিন রাত্রিবেলা কিন্তু— মনে থাকবে তো?"

—"আরেক জন ভুলে না গেলেই হয়"— তরা বলল।

খেতে খেতে কপাহী এল। মাথালটা বাইরে রেখে কপাহী ভেতরে এসেছিল। "উঃ বড্ড শীত। দে দেখি তরা এক ঘটি গরম জল—ওঃ—" হঠাৎ গুলচকে দেখে কপাহী থেমে গেল।

গুলচ নিজের সাফাই গাইল—"এই তো এদিকে এসেছিলাম, তরা ভাত খেয়ে যেতে বলল—"

—"মফি বুড়ো ডেকে পাঠিয়েছিল। অনেক রাত হল মনে হচ্ছে—"

—"কেন ডেকেছিল?"

সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে কপাহী বলল—"আমি খেয়ে এসেছি, তরা। তুই খেয়ে নে।" তারপর বলল—"কী যে করব কিছুই বুঝতে পারছি না।"

—"কি হল?"

—"হবে যা হবার। তারপর কি? যোগাড়যন্ত্র হয়েছে কিছু?"

—"হুঁ, সব হয়ে গেছে। এদিক থেকে হলেই হয়ে যায়—"

কপাহী বলল—"ভোজের আর বেশিদিন নেই। মালপত্রগুলো আগে পাঠালে ভালো হত।"

"গাড়ি আসবে—" গুলচ বলল।

খাওয়া-দাওয়ার পর গুলচকে কপাহী একটা পরামর্শ দিল। ভোজের দিন ওর এখানে আসাটা ঠিক হবে না। গাড়িতে ওরা একা-ই এখান থেকে যাবে। নদীর ওপারে একজন কেউ এলেই হবে। তা না হলে কথাটা জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয় আছে।

চন্দ্রকে দিয়ে সিদ্দিক মৌলবীকে আনানোর ব্যবস্থা করার কথাটা গুলচ জানাল। ভেতর থেকে কান পেতে তরা সব কথা শুনছিল। সে কোনো মন্তব্য করল না। অবশ্য একটা কথা তরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না— মাসী এত গোপন ব্যবস্থা করছে কেন? তরা যাব না বললে জোর করে হাবাটার জন্য তাকে কেউ ধরে নিয়ে যেতে পারবে না। নিলেও সে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে। এতখানি ভয় পেয়ে চলার কোনো দরকার ছিল না কপাহীর। তবু তরা ভাবল— আমার জন্যই মাসী এত পাকা ব্যবস্থা করছে। তাই তো, মাসীর কি গুলচের প্রতি কম দরদ?

যাবার সময় গুলচ তরার কাছে আর বিদায় নিল না। একটু একটু বৃষ্টি পড়ছিল বলে কপাহী ওকে মাথালটা পরে যেতে বলল। গুলচের হাতে নেপালী খুকরীটা ছিল, ওর কোনো ভয় নেই।

একা হেঁটে যাওয়ার সময়ে ওর মনে সাত-পাঁচ অনেক রকম চিন্তা জট পাকাচ্ছিল। আজ যদি বাবার সংসারে সে থাকত তা হলে তরাকে পাওয়ার জন্য এতখানি করতে হত না। সরাসরি প্রস্তাব দিয়ে সবাইকে সামনে রেখে প্রকাশ্যভাবে আনুষ্ঠানিক বিয়ে করে মেয়েটিকে ঘরে তুলতে পারত। সে আজ নিঃসঙ্গ, গরিব। এজন্যই একটি মেয়েকে ঘরে আনবে বলে চোরের মতো এত সব করতে হচ্ছে। ওর বুকে বাজল।

অন্যদিকে ভালোও লাগছে, একটা যেন গর্ব বোধও। কারুর সাহায্য ছাড়াই সম্পূর্ণ একা ও একটা সংসার পেতেছে; একাই তরার মতো একটি মেয়েকে এনে ঘর করবে, সে একাই তিন পুরা জমি বের করেছে, আরো করবে। এটা আমার নিজের সংসার, এখানে কারো অংশ নেই—গুলচ যত ভাবে তত ওর মনটা তৃপ্তিতে ভরে যায়।

পনেরো

ডালিম গ্রামের মসজিদে শুক্রবার দিন ভোজ হবে— একটা বড়ো ঘটনা। বছরে ছুটো বড়ো ভোজ হয়। একবার বৈশাখের মাঝামাঝি বা জ্যৈষ্ঠের প্রথম দিকে, চাষের জোগাড় করার সময়। আরেকবার মাঘে, ফসল তোলার পর। ছুটো ভোজকেই মসজিদের জামাত খুব পবিত্র বলে মনে করে। অনেকে রোগ-ভোগ থেকে আরোগ্য কামনা করে অথবা কোনো অভীষ্ট সিদ্ধির আশায় ভোজে চাঁদা হিসেবে কিছু মানত করে।

ভোজের দিন গ্রামের লোকের অন্য কোনো কাজ নেই। সেদিন শুধু ঘর-দোর নিকোয়, জামা-কাপড় কাচে, স্নান করে পরিষ্কার হয়। বাড়ি বাড়ি চালের গুঁড়ো তৈরি করে শানিকি পিঠে বানায়। মসজিদে বারোয়ারি ভাবে এক পাকে হাঁড়ি হাঁড়ি মাংস রান্না হয়। বিকেল বেলা ছেলে-মেয়ে (অবশ্য নাবালিকা মেয়ে) ও গাঁয়ের লোকেরা মসজিদের বাইরের উঠোনে লাইন করে বসে ; নিজেদের সঙ্গে যারা এসেছে তাদের প্রত্যেকের জন্য হিসেব করে একটা ছুটো পিঠে রেখে বাকি পিঠে বারোয়ারি টুকরিতে জমা দেয়। প্রত্যেকের পাতে পরিবেশনকারীরা হাতা দিয়ে মাংস দিয়ে যায়। আসলে ভোজে বারোয়ারি খাবার এই মাংসটাই। গাঁয়ের লোকেরা

একটু একটু করে খেয়ে বাকি পিঠে-মাংস পুঁটুলি বেঁধে যে যার বাড়ি নিয়ে যায়। পদমর্যাদা অনুযায়ী ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়। মোল্লা, মোড়ল ও সর্দার-রা ভাগে বেশি পায়। কখনো কখনো চেঁচামেচি হয়, কখনো শান্তিতে সব হয়ে যায়।

ভোজের আগের দিন সফিয়ত নিজে এসে তরাকে চালের গুঁড়ো কুটে দিতে ডেকে গেল। কপাহী বলল—"যাবে'খন, এর জন্য কষ্ট করে নিজে আসার কি দরকার ছিল, কাউকে দিয়ে খবরটা পাঠালেই তো হত।"

সফিয়ত বলল—"শোন তরা, তুই একটু তাড়াতাড়ি যাস। দু-দোণ চালের গুঁড়ো কুটতে হবে, তা ছাড়া পিঠে কটাও গড়িয়ে দিতে হবে।"

কপাহী বলল—"আমাদের বাড়ি থেকে মসজিদে যাওয়ার কেউ নেই। তা হলেও গাঁয়ের লোককে দুটো পিঠে দিতে হবে। আমি একাই পারব, একটু চালের গুঁড়ো করে, কয়েকটা পিঠে করে পাঠাব। তরা নিশ্চয়ই যাবে—"

প্রতিবাদ করার সময় আর সুবিধা তরা পেল না।

যাবার সময় সফিয়ত বলে গেল—"তরা কিন্তু আমাদের ওখান থেকে ভোজ খেয়ে আসবে, একটু যদি ফিরতে রাত হয় তুই চিন্তা করিস না—"

"তোমাদের কাছে থাকলে আর চিন্তা কিসের?" কপাহী বলল।

তরার গলা শুকিয়ে এল।

কাল এখান থেকে যাওয়ার ব্যবস্থার কথা মাসী কি ভুলে গেল? সফিয়ত বুড়োর বাড়িতে যদি রাত হয়ে যায় আর এদিকে গুলচের

গাড়ি এসে আমাকে না পেয়ে ফিরে চলে যায়। তখন গুলচ কি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হবে না? কে জানে ও কী ভাববে।

মাসী কি আর-কিছু ফন্দি আঁটছে?

তরা একটু বিব্রত ও চিন্তিত হয়ে পড়ল। তবু ও মনে মনে ঠিক করল— চালের গুঁড়ো কুটে পিঠে বানিয়ে সে আর থাকবে না, চলে আসবে। সন্ধে নামার সঙ্গে সঙ্গে যে করে হোক এসে পৌঁছবে। ওকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না। গুলচের গাড়ি আসুক বা না আসুক, এ-বাড়িতে সে আর থাকবে না। মাসীর যা হবার হবে। দরকার হলে ও নিজেই গুলচের কাছে পালিয়ে যাবে। ওপারের গ্রামে দুদিন গেছে, দূর থেকে গুলচের পামটাও দেখেছে।

কপাহীকে সে কিছু বলল না। সফিয়তের বাড়িতে ওকে ডাকল কেন? মাসীকে ডাকলেই তো ভালো ছিল। মাসী সময়মত এসে না পৌঁছতে পারলে সে একা গুলচের কাছে চলে যেত।

ডাকল আবার আমায়!

কপাহী বিছানায় গেল। তরা কিন্তু নিজের জিনিসপত্রগুলো গোছাতে শুরু করল। পুঁটুলি বেঁধে সব রেখে যাবে, গাড়ি এলে আর কোনো চিন্তা থাকবে না।

অবশ্য সফির বাড়িতে মসজিদের ভোজের পিঠে বানাবে বলে ওর আনন্দও হল। সবাইকে এ-কাজ করতে দেওয়া হয় না, ওর যদি একটু চাওয়াব (পুণ্য) হয়।

তরা নামাজ পড়তে জানে না। মোনাজাত করতে জানে না। তবুও বিছানায় শুয়ে শুয়ে ও নীরবে অন্তরের প্রার্থনা জানাল: আগামী কাল যেন কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে। কাল আমি এখান

থেকে গুলচের বাড়ি যাব, কাল আমার বিয়ে হবে; আমাকে যেন সফিবুড়োর বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেয়।…

ওর গুলচের কথা মনে হল। কাল থেকে ওর আর একা থাকতে হবে না। আমি থাকব— আমি ওর বুকের ভেতর লুকিয়ে থাকব, ও আমায় দুহাতে জড়িয়ে রাখবে। ওর জন্য কিছু ভোজের পিঠে আর তরকারী নিয়ে যাব, ওপারের গ্রামে তো আর ভোজ হচ্ছে না। পুঁটুলিটা লুকিয়ে নিতে হবে।

মাসীর গলার মিনে-করা বিরিটার কথা ওর মনে হল। আজকাল ওটা সর্বদা গলায় দেয়; আমাকে কি দেবে না? না দিল, গুলচ দেবে— এখন না হলেও পরে দেবে। জমিগুলোতে ঠিকমতো আবাদ করতে পারলে, আলু-সর্ষে একটু বেশি করে পেলে, আটআনি সোনার একজোড়া চুড়ি গড়াব। অবশ্য তার আগে গড়াতে হবে কানের একজোড়া ছোট্ট থুড়ীয়া আর একটা আংটি। কে জানে গুলচ হয়তো আমার জন্য একটা আংটি গড়িয়ে রেখেছে···

ধীরে ধীরে ও ঘুমিয়ে পড়ল।

ষোলো

ভোজ খেয়ে, যে যার বাড়ি যেতে যেতে মগ্‌রিবের সময় পার হয়ে গেল। সন্ধে পার হয়ে গেল। মাঘ মাসের ছোটো দিন।

দেখতে দেখতে সন্ধে হয়। অবশ্য সংক্রান্তির পর বৃষ্টি থামল; আকাশে আজ নবমী না দশমীর চাঁদ? কুয়াশায় ঢাকা রয়েছে, তবু আলো দেখা যাচ্ছে।

সফিয়তের বাড়ির পুরুষমানুষরা মসজিদে গেল। যাওয়ার সময়ে তরাকে বলে গেল, "তুই চলে যাস না। রাতে খেয়ে দেয়ে যাবি, তোর দাদা রেখে আসবে'খন।"

সে কিছু বলতে পারল না।

হাবাটা দু-একবার চক্কর মেরে দূরে সরে থাকল, তরার কাছে আসার সাহস হয় নি।

মসজিদ থেকে পিঠে-টিঠে নিয়ে আসার পরেও দেখল তরাকে পোঁছে দিয়ে আসার কথা কারো মনে পড়ছে না। ওকে পিঠে খেতে দেওয়া হল, কিন্তু খাওয়ায় ওর মন ছিল না।—ভাবছিল কখন এখান থেকে যেতে পারবে। এতক্ষণে হয়তো গুলচের গাড়ি এসে গেছে। ওর জন্য কি আর অপেক্ষা করে থাকবে?

একবার সফিয়তের ছেলের বউ-এর মা দেখা করে বলল, "নবৌ, আমি এবার যাব, অনেক রাত হল। বাড়িতে মাসী একা আছে।"

বউদি বাঁকা হাসি হেসে বলল—"ওটাও তোর বাড়ি, এটাও। যেয়ে আর কি হবে; এখানেই থেকে যা—"

ওর কথা শুনে তরার গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল। এরা কি গোপনে কোনো অভিসন্ধি করেছে? এটা আমার বাড়ি কী করে হতে পারে?

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সে সফিবুড়োকে খুঁজল, বুড়ো কোথাও নেই। ও ভীষণ ব্যাকুল হয়ে উঠল, কে এখন ওকে পোঁছে দিয়ে আসবে? হাবাটার সঙ্গে কিছুতেই যেতে পারবে না.

দরকার হলে একা চলে যাবে। ডালিমের মেয়ে, ডালিমেই বড়ো হয়েছে, এখানকার পথ-ঘাট ওর অচেনা নয়। এদ্দিনে ওকে যখন বাঘে খায় নি, আজও খাবে না।

ভয়ংকর অস্বস্তির মধ্যে এদিক-ওদিক দেখতে থাকল। এ-বাড়িতে ওর কথা ভাবার যেন কারো সময় নেই।

মসজিদের ভোজ শেষ হয়ে গেছে, এখানে তবে এত হৈ-চৈ কেন?

অনিশ্চিত আশঙ্কায় ওর মন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল; ওর ভয় করতে লাগল।

একবার মাড়ল ঘরে এল। দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। সফিয়ত বসে রয়েছে, সঙ্গে গ্রামের আরো দু-চারজন। কয়েক পা পিছিয়ে এসে সে পাশ কাটিয়ে বেড়ার এ-ধারে দাঁড়িয়ে রইল।

—"শীগ্‌গির সেরে ফেল— আর কারো আসা বাকি?"

—"আসল লোকটাই তো এখনো আসে নি। আহাম্মদ মুন্সি এখনো আসে নি, নিকা পড়াবে কে?"

তরার পা দুটো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল। কোনো রকমে বেড়া ধরে ও দাঁড়িয়ে আছে।

—"মেয়ের মাসীকে বলেছ তো?"

—"মোটামুটি বলা আছে। অমত করার কোনো কারণ নেই। ওর আর আছে কি—"

এর বেশি শোনার শক্তি বা ধৈর্য তরার ছিল না, ওর মাথাটা ঘুরছিল, কোনোরকম করে সেখান থেকে সরে এল।

এক্ষুনি আহাম্মদ মুন্সি এসে পৌঁছবে। আর এরা সবাই মিলে জোর করে বোকাটার সঙ্গে নিকা পড়িয়ে বিয়ে দেবে।

অসহায়ভাবে তরা চারদিকে তাকাল, চোখের সামনে লণ্ঠনটা যেন নাচতে শুরু করেছে।

কিছুক্ষণ অনিশ্চিতভাবে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ কী যেন একটা ভাবল— মাথায় একটা বুদ্ধি খেলেছে, মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল।

একবার চারদিকে চেয়ে দেখল, পুরুষরা সামনে— মারল ঘরে, মেয়েরা রান্নাঘরের দিকে। আর এক মুহূর্ত দেরি করা চলবে না।

পরমুহূর্তে পেছনের দরজা দিয়ে পা টিপে টিপে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

সফিয়তের বাড়ির পেছনটায় বড়ো ধানক্ষেত—ধানগাছের মুড়োগুলো শুধু পড়ে আছে, তারপর পাতলা জঙ্গল। কোনো কিছু না ভেবে তরা দৌড়ে মাঠ পার হয়ে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সরু পথটা ধরে জোরে জোরে পা চালাল।

আজ এই মুহূর্তে কোনো হিংস্র জন্তুকে ভয় পাচ্ছে না, ওর ভয় মানুষকে— সফিকে, হাবাটাকে। পালানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল, কোথায় যাচ্ছে খেয়াল করতে পারছে না; জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে হোঁচট খাচ্ছে, হামাগুড়ি দিচ্ছে, দৌড়চ্ছে। ওর মাথায় একটাই চিন্তা— হয় বাড়ি গিয়ে পৌঁছব, না হয়, ধনশিরির পাড়ে। কেউ জোর করতে চাইলে হয় ধনশিরিতে ঝাঁপ দেব, না-হয় যে আসবে তাকে রাম-দা দিয়ে কেটে নিজেও আত্মঘাতী হব।

আর যদি গুলচের গাড়িটা পথে পেয়ে যাই! ভয় ও শঙ্কার মধ্যেও ওর মনে আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। তখন পৃথিবীর আর কেউ আমার কিছু করতে পারবে না, গুলচের গলা জড়িয়ে ধরে আমি চলে যাব।

প্রায় আধঘণ্টা দৌড়নোর পর সে হাঁপাতে লাগল। একটু দাঁড়াল, মাঘ মাসের শীতের রাতে ঘেমে নেয়ে উঠেছে। ওর কপাল থেকে ঘাম ঝরছে।

এবার যেন একটু ভয় ভয় করছে। এত রাতে একা একা এদিকে কোথায় এল? পথ তো নয়— জঙ্গল। কানা হোলাতে পেয়েছে নাকি? এদিক দিয়ে গেলে কোথায় পৌঁছব? ঘুরে-ঘুরে আবার সফির বাড়ির সামনে পৌঁছব না তো?

তরা এক পলক আকাশের চাঁদটার দিকে চাইল, কিন্তু কোন্ দিকে যাচ্ছে চাঁদটা দেখে ঠাহর করতে পারল না। সামনের জঙ্গলটার দিকে কান পেতে রইল। দূরে কোথাও যেন মানুষের হট্টগোলের শব্দ। একটু শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু কতটা দূরে ধারণা করতে পারল না। একবার মনে হয় কাছে, একবার অনেক দূরে! নিজের বুকের স্পন্দন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। হাত-পাগুলো যেন অবশ হয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ একটা গাছের গুঁড়ি ধরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আর বিশেষ কিছু না ভেবে আবার চলতে শুরু করল, দাঁড়াবার অবকাশ নেই।

এই রাতকে ভয় নেই, ভয় মানুষকে। স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছে না। জঙ্গলটা পার হয়ে এসেছে, এবার শুকনো বিরিণা-ঘাসের বন। কুয়াশা-মাখা চাঁদের আলোতে সব-কিছু অস্পষ্ট, অচেনা মনে হল। আলো-আঁধারির মধ্য দিয়ে শুধু এগিয়ে চলল।

হঠাৎ মনে হল ওর পায়ের তলায় নরম ভিজে মাটি। মাটি না বালি? একটু দাঁড়াল, সামনের দিকে তাকাল— এ যে ধনশিরি! কী করে ঘুরে ঘুরে জানি ধনশিরির পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে।

তরা হঠাৎ নির্ভয় হল, এই তো চিরপরিচিত ধনশিরি। আর সবাই ঠকালেও ধনশিরি কখনো ঠকাবে না, ধনশিরি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অসহায়ের সহায়।

শান্তভাবে বয়ে যাওয়া নদীটার দিকে একবার তাকাল— কুয়াশা নেমে এসেছে নদীর স্রোতের ওপর। ধনশিরির বুকে জ্যোৎস্নার হাল্কা রঙ। হাঁটার আর যেন শক্তি নেই, নদীর পাড়ের বালুর ওপর বসে পড়ল। নদীর পাড়ে ঠাণ্ডা বেশি। কুয়াশার বুক চিরে ধীরে ধীরে তখন হাওয়া বইছে।

তরা চারদিকে তাকাল— কেউ নেই, কিছু নেই। ওর চতুর্দিকে কুয়াশায় ঘেরা এক ধূসর পৃথিবী, চেনা নদীর এক অচেনা পাড়, পরিচিত এক গ্রামের অপরিচিত অঞ্চল, রহস্যময় জ্যোৎস্না, দুর্বোধ্য কুয়াশা। জ্যোৎস্না-প্লাবিত রহস্যময় নীরব রাত্রি।

নিঃসঙ্গ, ভয়ার্ত একটি মেয়ে।

তরা যেন আর-কিছু ভাবতে পারছে না। হঠাৎ যেন ওর চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে, চেতনা হারিয়ে যেন একটা জড় পদার্থে পরিণত হয়েছে।

কিছুক্ষণ একভাবে বসে রইল, ভাবতে চেষ্টা করল কতক্ষণ হয়েছে, একঘণ্টা, দু-ঘণ্টা? না কি আরো বেশি?

আমার খোঁজে হয়তো সফি লোক পাঠিয়েছে, ওরা হয়তো আমাকে খুজে খুঁজে চারদিক চষে বেড়াচ্ছে। আশ্বস্ত হল— সোজা বাড়ি না গিয়ে ভালোই করেছি। নাহলে ওরা আমায় ধরে নিয়ে যেত।

কিন্তু গুলচের গাড়ি এসে যদি আমাকে না পেয়ে ফিরে চলে যায়। কী ভাববে গুলচ? আমার ওপর খুব রাগ করবে, অসন্তুষ্ট

হবে। সব কথা বুঝিয়ে না বলা পর্যন্ত আমার সঙ্গে হয়তো কথাই কইবে না।

সব শোনার পর গুলচ আমায় আরো বেশি আদর করবে। ওরই জন্য তো আমি এতখানি কষ্টভোগ করছি। তা নাহলে আর কার জন্য ?

তরার মনে হল অনেক রাত হয়েছে। মাঘ মাসের রাতে এভাবে একা একা বসে থাকা ঠিক নয়, আকাশে চাঁদ আছে বলে কিছুটা নিশ্চিন্ত। রাত দুপ্রহর হল, আর বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না।

তরা উঠে দাঁড়াল, চারদিকে আরেকবার চেয়ে দেখল। বাড়ির পথ কোন্‌দিকে ? নদীর পার ধরে উজানের দিকে, না কি ভাঁটির দিকে ? জানি না কোথায় গিয়ে পৌঁছব ? যেখানেই পৌঁছই-না কেন রাতে এভাবে একা নদীর পাড়ে বসে থাকা ঠিক নয়। তা ছাড়া খুব শীত করছে। এতক্ষণ গরম লাগছিল— এখন আবার শীত করছে, এত ঠাণ্ডায় বসে থাকলে অসুখ-বিসুখ করবে। ঠোঁট দুটো শুকিয়ে কাঠ, হাত-পাগুলো শক্ত হয়ে আসছিল আর পায়ের আঙুলগুলো অসার।

একবার নদীটার দিকে তাকাল, তারপর বিশেষ কিছু না ভেবেই উজিয়ে দক্ষিণের দিকে চলা শুরু করল।

চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ, শেয়ালের ডাক পর্যন্ত শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। বাঘের গর্জন নেই, বাথান-অলা গোয়ালার টানাসুরের হাঁকও শোনা যাচ্ছে না। কুয়াশার নীরবতায় লীন হয়ে যাচ্ছে এক নীরব পৃথিবী। তরার পায়ের তলার বালি শুধু একটু খস খস শব্দ করছে। আর ওর গায়ে লেগে বিরিণা ঘাস ও অন্য গাছের

পাতাগুলো খর খর শব্দ করছে। পাতায় লেগে থাকা শিশির ওর গায়ে লাগছে।

বেশি রাত হয় নি তখন, কিন্তু তরার মনে হল যেন অনেক রাত। ওর পদক্ষেপ মন্থর হয়ে আসছিল, ধনশিরির পাড়ের নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে দূরে চলে যেতে ওর মন সরছিল না। ভোর থেকে এ পর্যন্ত আজ সারাটা দিন যেন একটা যুগ! সেই সকালবেলা সফিয়তের বাড়ি চাল কুটতে যাওয়া, ভোজের জন্য পিঠে বানানো, মসজিদের ভোজের কোলাহল আর তারপর সেই ভয়াবহ ঘটনা— কথাগুলো ওর যেন ভালো করে মনেই পড়ছে না। অনেক কিছু ঘটনা ঘটে গেল এই একটা মাত্র দিনের মধ্যে, অবোধ্য অনেক ঘটনা। বুঝতে চেষ্টা করতেও ভয় করছে।

হঠাৎ নদীর পাড়টা ওর চেনা চেনা মনে হল। একটুও ভুল হয় নি— এই তো বটগাছটা, এই ঘাট আর এই তো ওদের বাড়ি যাওয়া পথটা।

ধনশিরির দিকে এক পলক তাকিয়ে তরা বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

সতেরো

গুলচ আর চন্দ্র দুজনে মিলে প্রায় সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিল। অবশ্য ভীম আর তিখরও অল্পবিস্তর সাহায্য করেছে। গাড়ির

ব্যবস্থা করেছে চন্দ্র। খেয়াঘাটে নৌকো বাঁধা ছিল— মাঝিকে চন্দ্র বলে রেখেছিল পার করানো কথাটা যেন দশকান না করে। এভাবে মেয়ে পার করানোর কাজ সে আগেও করেছে বলে আশ্বাস দিয়েছিল।

এবার কথা হল— মেয়েটিকে ঘরে তুলে আনার জন্য যদি একজন মেয়েমানুষ পাওয়া যেত! চন্দ্র বলল, গুলচের মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আনলে কেমন হয়? গুলচ রাজী হল না। তিখর একটা উপায় দিল— গুলচ নিজে গিয়ে যদি বলে তা হলে মোলোকা তার ছেলের বউ চেনিমাইকে পাঠাতে পারে। না পাঠানোর কোনো কারণ নেই। গুলচ প্রথমে চমকে উঠল, তারপর ভেবে দেখল— তাই তো, ভুল বলে নি, চেনিমাইর চাইতে বেশি পরিচিত ওর কি আজ কেউ আছে?

চুরি করে ফুসলিয়ে আনা কনে হলেও, চন্দ্রর কথা হল—ওরা সংক্ষেপে একটা বিয়ের ব্যবস্থাই করে। সমাজের সমর্থন পেলে গুলচদের মিলনে কারো কিছু বলার থাকবে না।

মৌলবী সময়মত এল।

গুলচ নিজে ঘাটে গেল না— গেল তিখর। অন্যদিকটা চন্দ্র ছাড়া সামলানোর মতো আর কেউ ছিল না। চন্দ্রর পরামর্শমত ঘাটের এপারে একটা গোরুর গাড়ির ব্যবস্থা করা হল। ওপারে গাড়ি করে মেয়েটি ঘাটে আসার সময় সঙ্গে থাকবে ভীম। গাড়িটা একটা নেপালীর। মাঝি নদী পার করে দেবে। এপারে অন্য একটা গাড়িতে বসিয়ে দিয়ে তিখর কনেকে গুলচের বাড়ি নিয়ে আসবে। এসে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে মৌলবী নিকা পড়াবে। কনের সঙ্গে থাকবে চেনিমাই।

অভয় দিয়ে চন্দ্র বলল—"এভরিথিং অল রাইট। সব সুন্দর ভাবে হয়ে যাবে।"

সেইসঙ্গে মৌলবীকে বুঝিয়ে রাখল—"কুইকলী নিকা করিয়ে দিয়ো, অন্য মন্ত্র-টন্ত্রগুলো তুমি বাড়িতেই করে নিয়ো— কেমন?"

এই-সব বিষয়ে মৌলবী বেশ অভিজ্ঞ লোক, শুধু গোঁফের তলায় মুচকি হেসে মাথা নাড়ল: "মিয়া-বিবির মনের মিলই আসল নিকা, বাকি সব কাজ তো আমাদের ই জন্য।"

চন্দ্রও এই কথা বোঝে।

গাঁয়ের লোকদের মসজিদে ভোজ খেতে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে বাড়ির জিনিস-পত্রগুলো কপাহী দিনের বেলা পার করিয়ে রেখেছিল। আগড়-বাগড় সব-কিছু মিলিয়ে একগাড়ি মালপত্র হল।

রাত আটটা নাগাদ গাড়িটা আবার কপাহীদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। মুগার মেখেলা, পাটসুতো দিয়ে বোনা রিহা আর আশি নম্বর সুতোর চওড়া চাদর পরে হাতে ছোটো একটা পুঁটুলি নিয়ে কপাহী বাড়ি থেকে একা বেরিয়ে পড়ল—। ভীম এগিয়ে এল।

"আর কিছু নেই তো?" সে জিজ্ঞেস করল।

—"নেই—" হুড়মুড় করে সে গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি চলতে শুরু করল। ঘাটে অপেক্ষারত নৌকোটা করে নদী পার হল।

ঘাট থেকে কপাহীকে এনে তিখর অন্য গাড়িটাতে বসাল। গাড়িতে বসে কপাহী ভীমকে একটু উঁচু গলায় বলল—"ভীম, তুই বাড়ি যাওয়ার আগে আমাদের বাড়িটাতে একটা চক্কর দিয়ে যাস, কেমন—"

—"আবার কী করতে ?"

—"ওরা সফিয়তের বাড়ি গিয়েছিল, ফিরে আসতে পারে। ওর অবশ্য ওখানেই থাকার কথা। যদি আসে, দেখা হলে বলিস আমি চলে এসেছি—"

মাঝির সঙ্গে বসে ভীম এক ছিলিম গাঁজা খেয়ে ধীরে ধীরে কপাহীদের বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

নিজেকে বলল—'কথাগুলো সুবিধের মনে হচ্ছে না—'।

অবশ্য ভীমের কাছে এ-সব কোনো নতুন কথা নয়। ডালিমগ্রাম আর ওপারের গ্রামের মধ্যে বিয়ে খুব একটা হয় না, প্রায়ই পালিয়ে আসে অথবা ফুসলিয়ে আনে। পরে গ্রামের লোককে শুধু পান-তাম্বুল দিলেই হয়। বিয়ে দেয়া আর ক'জনের সাধ্যে কুলায়। সবাই গরিব।

মৌলবী চন্দ্রর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। লম্বা ঘোমটা টেনে আসা কপাহীকে চেনিমাই গাড়ি থেকে নামিয়ে ঘরে নিয়ে এল। কপাহী এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে মৌলবী এল। তিখর ও গাড়ির গাড়োয়ান নিকার সাক্ষী রইল। মৌলবী উকীলও হল—খোৎবাও পড়ল। বরের নাম কি, কনের নাম কি— এ-সব ব্যাপারে মনোযোগ দেয়ার সময় তখন কারো ছিল না। মোহরণা মৌলবীই ঠিক করে দিল—পঞ্চাশ টাকা।

—"কবুল করেছ ?"

—"হুঁ"—

—ব্যস, আর কোনো কথা নেই।

সিলেটের মৌলবী খোৎবা পড়ল, মোনাজাত করল, তারপর চা-জলখাবার খেয়ে চন্দ্র ও গুলচের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

একটা টাকা হাতে দিয়ে চন্দ্র জিজ্ঞেস করল—"নিকা ভালো করে পড়িয়েছ তো ?"

—"হুঁ, খুব ভালো করে—" মৌলবী বলল।

চা খেয়ে যে যার বাড়ি চলে গেল। চেনিমাই ও তিখরকে কিছুটা পথ এগিয়ে দিয়ে গুলচ বাড়ি ফিরে এল।

যাওয়ার সময় চন্দ্র জিজ্ঞেস করল—"মাত্র একজন এল কেন রে ?"

সংক্ষেপে গুলচ বলল—"কি জানি—"

বিদায় নেয়ার সময় গায়ে জড়িয়ে আসা এণ্ডি চাদরটার তলা থেকে কাগজে বাঁধা একটা মোড়ক বের করে চন্দ্র গুলচের হাতে দিল।

—"এটা আবার কি ?" গুলচ জিজ্ঞেস করল।

—"স্যাণ্ডেল, বিয়েতে স্যাণ্ডেল উপহার দেব বলে তরাকে বলে রেখেছিলাম—"

—"আচ্ছা দে—"

মোড়কটা গুলচ ঘরের ভেতরে রেখে এল।

—"তা হলে তোরা থাক্, এবার আমি আসি—" বলে চন্দ্র চলে গেল।

তখন বেশ রাত হয়েছিল। নদীর পারের নির্জনতা আর কুয়াশা মিলে রাতটাকে আরো গভীর করে তুলেছিল। একটা বড়ো কাজ করে দিতে পারার গৌরব নিয়ে চন্দ্র বেরিয়ে এল। একটু পথ এসে সে চিৎকার করে বলল—"গুলচ, গুড্ নাইট্ কেমন—"

কিছুক্ষণ গুলচ উঠোনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বুকটা ওর দুরু দুরু কেঁপে উঠল। চারিদিকে চেয়ে দেখে সবাই চলে গেছে। এক অভূতপূর্ব আনন্দ নিয়ে প্রদীপটা হাতে করে ভেতরের ঘরে ঢুকল।

মাথার ঘোমটা ফেলে চোখ বড়ো বড়ো করে কপাহী গুলচের মুখের দিকে তাকায়। গুলচ এমন হতভম্ব হল, যেন কপাহীকে চিনতেই পারে নি।

—"তুই!"

—"আমি না হয়ে আর কে হবে?"

কপাহী উঠে দাঁড়াল, ওর সামনে দাঁড়িয়ে সে গুলচের হাতটা চেপে ধরল।

—"তরা কোথায়?"

—"কোথায় আর যাবে, আসবে। আজ সফি বুড়ো ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, পাঠাল না তো।" সহজভাবে কপাহী বলল।

হঠাৎ গুলচ ওর হাতটা কপাহীর হাতের মধ্য থকে ছাড়িয়ে নিয়ে এল।

—"কি হল?" বিস্মিত হয়ে কপাহী জিজ্ঞেস করল।

মাথা নিচু করে গুলচ বাইরে বেরিয়ে এল। উঠোনে দাঁড়িয়ে সে একবার ধনশিরির দিকে তাকাল। কুয়াশার ওপাশ দিয়ে ধনশিরি একাকী বয়ে যাচ্ছে— শান্ত ভাবে, দেখতে পাওয়া যায় না। ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে কপাহীও এসে ওর পাশে দাঁড়াল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কপাহী সরু গলায় জিজ্ঞেস করল, —"ওদিকে কী দেখছ?"

কপাহীর সম্বোধনটা নতুন, গলাটাও মনে হল অচেনা। গুলচ কোনো কিছু না ভেবে বলে উঠল—"এই তো আমাদের জমি—"

কপাহী ওর আরো কাছে এসে আবার হাতটা ধরল। গলাটা ওর শুকনো।

—"কাছেই তা হলে?"

—"হুঁ, তার পরেই নদী—"

কিছুক্ষণ দুজনে কুয়াশার মধ্য দিয়ে নতুন আবাদী জমিগুলোর দিকে চেয়ে রইল। তারপর গুলচ বলল—"ভেতরে চল, এখানে খুব ঠাণ্ডা।"

"রাতও অনেক হল—" কপাহী বলল।

ভেতরে ঢুকে কপাহী বলল—"আমি যে চলে এসেছি আমাদের ওখানে কিন্তু কেউ জানে না।"

গুলচ সংক্ষেপে বলল,—"হুঁ—"

কিছুক্ষণ দুজনে বসে রইল নীরবে, পাশাপাশি। গুলচ কী যেন ভাবছে, কখনো কপাহীর দিকে তাকাচ্ছে আর কখনো মাথা হেঁট করে বসে থাকছে। একটু ভয় ও সন্দেহ মেশানো চোখে কপাহীও মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকাচ্ছিল।

ওদের কাছ থেকে কিছু দূরে কুপিটা ধিকি ধিকি জ্বলছে। কোথাও সাড়া-শব্দ নেই।

ধীরে ধীরে কপাহী বলল—"সফিয়ত বুড়ো বুদ্ধি করে তরাকে হাবাটার জন্য রেখে আমায় নাহরের হাতে আবার গছাতে চেয়েছিল।"

—"নাহরের হাতে?"

—"হুঁ। সে তো অন্য কোনো মেয়েকে আর আনে নি। আজই পালিয়ে না এলে একটা কিছু করে ফেলত।"

গুলচ কপাহীর মুখের দিকে তাকাল, ওর গুলচের প্রতি এত দরদ? নিজের মানুষটা এখনো বেঁচে আছে, অথচ তাকে ছেড়ে গুলচের কাছে পালিয়ে এল।

কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করল—"তরাকে আনলি না যে?"

—"আসবে, এখানে না এসে যাবে কোথায়? হাবাটাকে বিয়ে করতে সে কখনো রাজী হবে না। সঙ্গে আনি কি করে?"

গুলচ কিছু বলল না, ওর মনটা কেমন কেমন করছিল। কান্না পাচ্ছিল, কিন্তু হেসে ফেলল। অকারণ হাসি।

গুলচের খুব কাছে এসে কপাহী ওর মুখটা নিজের দুহাতের মধ্যে নিয়ে সেদিকে তাকিয়ে মিহি গলায় বলল,—"অনেক রাত হল, শোবে না?"

কপাহীকে বুকে জড়িয়ে গুলচ অনুভব করল সে নবযৌবনা। ওর শরীরে যুবতী মেয়ের মাদকতা। যেন গুলচের চাইতে কপাহী অনেক ছোটো একটি মেয়ে।···

আঠারো

খেয়া ঘাট থেকে ফিরে ভীম আবার কপাহীদের বাড়ির উঠোনে এল। কোথাও সাড়া-শব্দ নেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই কপাহীদের বাড়িটা যেন পোড়ো-বাড়ি হয়ে গেছে। ভীমের কেবল কেমন কেমন লাগছিল, পোড়ো-বাড়িতে আসা ঠিক নয়।

তখন প্রায় রাত দুপুর।

ভীম একবার চারিদিকে তাকাল, কপাহী কম মেয়েলোক না। গ্রামের এক প্রান্তে এই জায়গায় মাসী-মেয়ে দুটোতে মিলে একা

একা বেশ ছিল। ভয়ডর নেই, আর আজ কি কম সাহসের জোরে বাড়ি-ঘর ফেলে একা একা চলে গেল?

ভীম ঘরের ভেতরে ঢুকল। অন্ধকার, চোখে কিছু দেখা যায় না। আর আছেই বা কি? দেখে আর কি হবে? কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে ওর ভালো লাগল, ঘরের ভেতরটা বাইরের চেয়ে গরম। কিন্তু একটু পরেই উঠোনে বেরিয়ে এল। কিছুই নেই, বাড়িতে জিনিসপত্র ফেলে রেখে যাওয়ার পাত্র কপাহী নয়।

হঠাৎ ফটকের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল কুয়াশা ভেদ করে একটা লোক গট গট করে আসছে। ওর গা একটু ছমছম করে উঠল। খুকরীটা হাতে নিয়ে গলার স্বর উঁচু করে উঠল—"কে?"

তরা চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সেও চিৎকার করে উঠল—"কে?"

কাছে এগিয়ে আসতে তরা ভীমকে চিনতে পারল।

—"আমি ভীম, তরা নাকি?"

—"হুঁ, আমি।"

—"এত রাত করে একা একা কোত্থেকে এলি?"

—"তুই এখানে কী করছিস?" তরা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল—"মাসী কই?"

—"মাসী তো চলে গেছে, অনেকক্ষণ আগে আমি ঘাট পার করে দিয়ে এসেছি। তোর মাসী বলল কিছু ফেলে রেখে গেল নাকি দেখে যেতে। তাই আমি এসেছিলাম।"

তরা একটু যেন থতমত খেয়ে গেল। তারপর বিহ্বল হয়ে জিজ্ঞেস করল—"মাসী তা হলে চলে গেল?"

ভীম বলল— "বড়ো শীত, তুই ঘরের ভেতরে যা তরা। একটু আগুন জ্বালাই, আমার হাতে শলাই আছে।"

তরা ভীমের কাছে এল।

—"ভীম কাইটি—"

—"কী হল তরা?"

—"আমিও ওপারে যাব—"

—"সে তো ঠিকই, না গেলে এখানে কার সঙ্গে থাকবি? কিন্তু এখন যে অনেক রাত হয়েছে।"

—"তা হোক, আমি আর এখানে থাকব না, এক্ষুনি যাব। তুই আমায় পার করিয়ে রেখে আসতে পারবি?"

এত রাতে ধনশিরি পার হওয়া ঠিক হবে না। ভোর হতে আর বাকী নেই, এইটুকু সময় এখানে থাক্।"

তরা ভেতরে গিয়ে ভীমের কাছ থেকে দেশলাইটা নিয়ে কোণের লণ্ঠনটা জ্বালাল। তারপর বেঁধে রেখে যাওয়া পুঁটুলিটা খুঁজল, মাসী সেটাও নিয়ে গেছে।

বেড়ালটা কোথায় জানি ঘাপটি মেরে বসেছিল, তরাকে দেখে বেরিয়ে এল। ম্যাও ম্যাও করে ওর পা দুটো জড়িয়ে ধরায় তরা বেড়ালটার দিকে তাকাল। এক মুহূর্তের জন্য সে অন্য কথা ভুলে গিয়ে বেড়ালটাকে বুকে চেপে ধরল। ওর গায়ের ওমটুকু পেয়ে তরার ভালো লাগল। একটু পরেই বেড়ালটাকে কোল থেকে নামিয়ে রাখল—

সঙ্গে সঙ্গে সে বাইরে বেরিয়ে এল।

—"ভীম কাইটি, আমি গেলাম—"

—"এক্ষুনি যাবি?"

—"হুঁ, আয়, আমায় দেখিয়ে দিয়ে আসবি। নদীটা পার করে দিলে বাকী পথ আমি একাই যেতে পারব।"

তরা এগিয়ে চলল, পেছন পেছন ভীম। যেতে যেতে ভীম জিজ্ঞেস করল—"তোকে তোর মাসী সঙ্গে নিয়ে গেল না কেন?"

তরা কিছু বলল না।

আজকের মতো এমন ভয়াবহ দুর্যোগের রাত ওর জীবনে আসবে বলে সে কখনো স্বপ্নেও ভাবে নি। ও যেন অনেককাল অন্ধকারের মধ্য দিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারদিকে শুধু কুয়াশা আর অন্ধকার, কবে যে ভোর হবে!

কুয়াশা ও রাতের হাওয়া লেগে তরার ঠোঁট দুটো ফেটে গিয়েছিল। অসাড় হাত-পাগুলো টন টন করছিল। কিন্তু এক ভীষণ উদ্‌বিগ্নতা ওর শরীরের ভেতরটাকে গরম করে তুলেছিল, তখন সে উদ্‌ভ্রান্ত।

নদীর ঘাট তখন নিস্তব্ধ নিঝুম। কুয়াশা গাঢ় হয়ে নদীর ওপর নেমেছে। চাঁদটা ফ্যাকাশে ও বিবর্ণ। নিঃশব্দে ঘুমচ্ছে সাড়া-শব্দহীন মৃত এক গ্রাম।

ভীম ও তরা নিঃশব্দে এগোচ্ছে। কোনো কথা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছে ভীমের ছিল না। ও যেন সব-কিছু বুঝে ফেলেছে, যেন কিছুই বোঝে নি। কপাহী তরাকে কেন নিয়ে গেল না? গুলচ কি কপাহীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল? তরাকেই তো। তরা অবশ্য ছোটো মেয়ে— চোদ্দ বছর বয়েস। কিন্তু দেখতে-শুনতে ছোটো নয়, বেশ সোমত্ত। আর কপাহী— সে-ও যুবতী। তা গুলচের চাইতে দু-এক বছরের বড়ো হোক, গায়ের গড়ন দেখলে মনে হয় অল্পবয়েসী। করুক, ওরা সংসার করুক। তরার সংসারটাও ওরা একদিন পেতে দেবে।

ওরা ঘাটে পৌঁছল, খুঁটিতে নৌকো বাঁধা ছিল, কিন্তু বইঠা নেই।

ভীম বলল—"তরা যা হবার হয়ে গেছে, গুপ্তচরা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। এখন গিয়ে জাগিয়ে তোলা আর ভোরবেলা গিয়ে পৌঁছনো একই কথা। আমরা ঘাটের চালাঘরটার নিচে একটু বসি গিয়ে চল। এত শীত, হাত-পাগুলো যেন সব জমে যাচ্ছে—"

তরা আপত্তি করল না, ওর-ও খুব শীত করছিল, হাত-পা কাঁপছিল।

ভীম গনগনে আগুন জ্বালাল। মাঝি এক জায়গায় খড়-কাঠ জড়ো করে রেখেছিল। সেগুলো এনে আগুনে ঢেলে দিয়ে দুজনে আগুনের পাশে বসল। একবার ভীম ও তরা পরস্পরের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করল। কারো মুখে কথা নেই।

হাত-পাগুলো গরম হয়ে ওঠায় দুজনে যেন জাগ্রত চেতনার মধ্যে আবার ফিরে এল।

ভীম বলল—"একটু বাদেই ভোর হবে, তোদের সঙ্গে আমারও রাতটা বরবাদ হয়ে গেল! তোর যদি গুপ্তচের ওখানেই আজ যাওয়ার কথা, তবে অন্যখানে যাওয়া ঠিক হয় নি।"

তরা কিছু বলল না।

দূরে মুরগী ডাকছে। রাতটা যেন হঠাৎ ফুরিয়ে এল। শরীরও হাল্কা লাগছে। আকাশ ও পৃথিবী তখনো কুয়াশায় ঢাকা।

তরা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

—"নদীটা পার করিয়ে দে ভীম কাইটি—"

—"এক্ষুনি যাবি?"

—"হুঁ, ভোর প্রায় হয়ে এসেছে।"

—"বাকী পথটা কি করে যাবি?"

—"তুই একটু দেখিয়ে দিলেই পৌঁছে যেতে পারব।"

ভীম উঠে দাঁড়াল।

চালাঘরটায় গুঁজে রাখা নাতিদীর্ঘ বইঠাটা খুঁজে এনে সে খেয়াঘাটে নেমে এল।

আকাশ তখন ঘোলাটে ফরসা হয়ে এসেছিল। ভীমের পেছন পেছন তরা গুলচের বাড়ির দিকে চলতে শুরু করল। স্যাঁতসেঁতে মাটি, শুকনো বনানী— সব শিশিরে ভেজা।

ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে চোখ কচলাতে কচলাতে কপাহী সবে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। চোখের সামনে তরাকে দেখে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু বড়ো একটা অবাক না হয়েই বলল—"তুই এলি নাকি? ভেতরে যা। তোর দদাইটি এখনো ঘুমোচ্ছে, আমি নদীতে গিয়ে চানটা সেরে আসি—"

কিছুক্ষণ স্থির হয়ে তরা উঠোনে দাঁড়িয়ে রইল। চারিদিক ঝাপসা হয়ে আসায় সে মাটিতে বসল। গুলচ আজ তার 'দদাইটি'। তরার স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে। ও চোখ মেলে পুবদিকে তাকাল। এ আকাশ ওর চেনা নয়।

রাতের অন্ধকারে যাকে অস্বাভাবিক মনে হয় নি, দিনের আলোয় তাকেই নিষ্ঠুর দুঃসহ মনে হল। ওপর ওপর দেখলে এমন কিছু পরিবর্তন হয় নি। সবাই রয়েছে— গুলচ, কপাহী, তরা। পরিবর্তন হয়েছে শুধু ভিটেটার। কপাহী আর তরা নদীর এপারে এল। একটা নতুন গামের এক বাসাবাড়িতে স্থায়ী বাড়ির স্থিরতা এনে দেবার জন্য দুটি নারীর নতুন পদক্ষেপ। কিন্তু এ তো শুধু একটা নদীর এপার থেকে ওপারে যাওয়া নয়, এক ভিটে ছেড়ে আরেক ভিটেয় আসা নয়। এ যেন একটা জীবন শেষ করে

আরেকটা নতুন জীবনে প্রবেশ করা, একটা পৃথিবী ছেড়ে অন্য এক পৃথিবীতে ঢোকা। আশ্চর্য ও দুর্বোধ্য এই নতুন পৃথিবী।

ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে গুলচ কপাহীর দিকে তাকাতে পারল না। ওর দেহ ও মন অবশ হয়ে গিয়েছিল। সে শুধু বারবার নিজেকে বলল—"কী হল, কী করে হল?"

দোরগোড়ায় তরাকে দেখে চোখের সামনে বাঘ দেখার মতো সে চমকে উঠল। ওর শুকনো গলা আরো শুকিয়ে কাঠ। চোখ দুটো জ্বালা করছে; বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠছে।

কিছুক্ষণ ও থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর শুকিয়ে-আসা গলায়, শুনি কি না শুনি করে, তরার দিকে না তাকিয়েই বলল—"আচ্ছা তুই বোস, আমি নদীতে চানটা সেরে আসি।"

মাথা হেঁট করে সে বেরিয়ে গেল।

ঝকঝকে রোদ উঠছে। শীতের মিষ্টি রোদ, রোদের সাদা আলোতে চারদিক ছেয়ে গেছে। আকাশটা যেন সাদা সাদা দাঁত বের করে ওকে দেখে হাসছে, ঠাট্টা করছে। চারদিক থেকে ঘিরে আকাশটা যেন ওকেই উপহাস করছে।

আকাশ তো নয়— অদৃষ্ট।

এ যেন দুর্বোধ্য নিয়তির নিষ্ঠুর হাসি।

গুলচ পাশে বসে নদীটার দিকে তাকাল— স্বচ্ছ, ঝলমলে জলের অগভীর স্রোত শান্তভাবে বয়ে যাচ্ছে। একটু শব্দ নেই, একটুও চঞ্চলতা নেই। শান্ত ও নির্বিকার, নীরব ও উদাসীন।

'আমার যে কী হল, তরা জানতেই পারে নি'— গুলচ ধনশিরির দিকে তাকিয়ে বলল।

ওর মনের দুঃখের কাহিনী সে ধনশিশিকে বুঝিয়ে বলতে চাইল।

যে অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল তার জন্য ধনশিরির কাছে ওর ক্ষমা চাইতে ইচ্ছা করছে : 'আমি কিছু জানি না, যদি জানতাম, এ ঘটনা ঘটতে পারত না। তুই কি আমার ওপর রাগ করেছিস? আমি কী করব? কী করে যে কী হল—?'

কথাগুলো ধনশিরিকে বলছে না তরাকে বলছে সে বুঝতে পারল না, এ যেন ওর পরিচিত ধনশিরি নয়, এ যেন নির্বাক মৌনী তরা। বুকের মাঝে গভীর দুঃখের অন্তঃসলিলা অ-দেখা বউতী ধারা। ঠোঁট দুটো ফ্যাকাশে আর শুকনো, চুলগুলো এলোমেলো। চোখ দুটো উদ্‌ভ্রান্ত, উদাসীন।

গুলচের কান্না পাচ্ছে। ধনশিরির নির্বিকার স্রোতের দিকে চেয়ে থাকতে আজ ওর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। ওর চিরপরিচিত, ওর আদরের ধনশিরি আজ ওর ওপর ক্ষুণ্ণ হয়েছে। নদী ওর মনটাকে একটুও বুঝতে চাইছে না।

'তুই ভাবছিস তরাকে আমি ইচ্ছে করেই ঠকিয়েছি। তুই বিশ্বাস কর ধনশিরি, আমি ঠকাই নি। জেনে-শুনে বল, কী করে আমি তরাকে ঠকাব? আমিই ঠকেছি। বল, আমি এখন কী করি, সব-কিছু ওলটপালট হয়ে গেল। সব দেখেছিস, তুই সব জানিস। আমার দোষ কোথায়।'

মন খারাপ করে অনেকক্ষণ গুলচ নদীর পাড়ে বসে রইল। ধনশিরিকে যত একান্তভাবে সে মন খুলে তার সুখের কথা, দুঃখের কথা, তার আশার কথা, বেদনার কথা নিবিড়ভাবে বলতে পারে, আর কাউকে পারে না। কিন্তু আজ মনে হয় ধনশিরিকে সে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারে নি। ধনশিরির কাছে নিজেকে অপরাধী মনে হল।

নিচে পাথরের টুকরো মেশানো চকচকে বালু। তার ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছ জলের নির্বিকার স্রোত, ধীরে ধীরে গুলচ নিচে নেমে এল। ঠাণ্ডা জলের নরম স্পর্শ ওর বড়ো ভালো লাগছে। সূর্যটা মাথার ওপর। স্বচ্ছ জলে গাঢ় নীল রঙের পরিপূর্ণ আকাশটার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে। জলগুলোও যেন নীল। সেই নীল জলে সে নিজের মুখের ছায়াটা দেখতে পেল —সূর্যের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, শুধু বহতা স্রোতে ছায়াটা পড়েছে।

জলে ওর মুখটা যেন লম্বাটে। এ যেন অন্য কারোর মুখ, ওর নয়। অন্য সময়েও নদীর জলে নিজের মুখ দেখে: চেনা চেনা মনে হয়। আজ সব-কিছু যেন বদলে গেছে। সব ওলটপালট হয়ে গেছে। গতরাতে তাকে যেন কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে একটা নতুন মানুষ তৈরি করে দিয়েছে। অচেনা নতুন এক মানুষ। কখনো সে ধনশিরিকে গালাগাল করে। আজ কিন্তু ভয় পাচ্ছে। সব কথা জেনেও ধনশিবি ওর ওপর যেন ক্ষুণ্ণ হয়েছে, অভিমান করেছে। 'তুই এমন করলে আমি কী নিয়ে বাঁচি'— গভীর দুঃখে সে ধনশিরিকে বলল।

স্নান করে বাড়ি ফিরে আসার পরেও গুলচের মন প্রসন্ন হল না। মনটা ভারী হয়েই রইল, তরার মুখেও কোনো কথা নেই।

ভাত খেতে দিল—খেল।

তাম্বুল খেতে দিল—খেল।

নিজে একটা বিড়ি ধরাল। বাড়িটাতে যেন তিনটে প্রাণী, অথচ যেন কেউ নেই, নিঝুম। হাওয়া বইছে, হাওয়ার বাইরের মুঠো মুঠো রোদ কাঁপছে। নদীর পাড়ের শিমুলগাছে চোখ বন্ধ করে

বসে দুটো শকুন কী যেন ভাবছে, সূর্যের আলো এখন তার দুর্বল উত্তাপটুকু দিয়ে পৃথিবীটাকে একটু গরম করতে চাইছে।

গুলচের চিন্তাগুলো বার বার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে; খেই হারিয়ে ফেলছে। নিজেকে বার বার জিজ্ঞেস করছে—কী হয়ে গেল। কি করে এমন হল? এমন হওয়ার তো কথা ছিল না। তরা কি ভাবছে আমি ওকে ঠকিয়েছি? আমি কি বেইমানি করেছি? আমরা তিনজন কী করে একবাড়িতে একসঙ্গে থাকব? কী করে এমন হল, আমি নিজেই বুঝতে পারি নি। তরাকে কী করে বোঝাব, বললেও কি সে বিশ্বাস করবে; কেউ বিশ্বাস করবে না। আমি নিজে নিকা করেছি, অথচ জানি না কাকে করলাম—কপাহীকে না তরাকে? আমার এমন তো হবেই। কেন এত তাড়াহুড়ো করে নিকা করলাম। সে এসেছিল, না-হয় থাকত, রাতটা কাটাতে পারত। আমি কি এর আগে রাতে ওর বাড়ি থাকি নি?

নিজের ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছে গুলচের, আর কপাহীর ওপর, চন্দ্রর ওপর; মৌলবীর ওপর। আমাকে এভাবে ঠকানো কি এদের সবার উচিত হয়েছে? কখনো কখনো ধনশিরিও ঠকায়, কিন্তু লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়। কখনো বানের জলে ভাদ্র মাসের রোয়া ধান ডুবিয়ে ফেলে, ক্ষেতের শস্য নষ্ট করে, ফসল-ভরা মাঠ পলি মাটিতে ঢেকে দেয়, চাষীদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস করে ফেলে। তা বলে লুকিয়ে চুরিয়ে এ কাজ করে না। করে সকলের চোখের সামনে। কিন্তু কপাহী কেন এ ভাবে করল।

প্রথম থেকে সব কথা ধীরে ধীরে ভাবতে থাকল গুলচ। কপাহী তাহলে যখন যা করেছে এইজন্যই করেছে। কম নয়।

তরার জন্য কি ওর একটুও মায়া হল না? মেয়েলোকেরা বোধ হয় নিজেদের ছাড়া আর কারো কথা ভাবতে জানে না। তবে কপাহী তরুণী হয়েই রয়েছে। গায়ের চামড়া কোথাও এতটুকু কোঁচকায় নি। আদর করতেও জানে।

গত রাতের কথা ওর মনে পড়ল। কখনো নিজের বাড়িতে কোনো মেয়ের সঙ্গে এভাবে কাটায় নি। কপাহী ওকে অনেক আদর করেছিল। কাল থেকে কপাহী ওর আপন জন হল। ওর ভালোবাসায় কোনো ভয়ডর নেই।

পাশের কোঠায় তরা ঘুমচ্ছিল। সারা পৃথিবীর ক্লান্তি ও অবসাদ ওর ওপর ভর করেছে যেন। কপাহী কিন্তু ঘুমোয় নি। সে দোরগোড়ায় মাদুর পেতে বসে ছিল। একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে গুলচ ওর দিকে তাকাল— মনে হল কপাহী আপন মনে হাসছে। ওর চোখ-মুখ যেন আরক্তিম হয়ে উঠেছে। গুলচকে এইভাবে পেয়ে ও যেন মহা সুখী। গুলচ কিন্তু ভাবল আমি তোর মতো সুখী হই নি। আমার খারাপ লাগছে।

উনিশ

পরের দিন কথাটা ডালিমগ্রামে জানাজানি হল। সফিয়তের বাড়ি থেকে উধাও হওয়ার পর তরাকে একটু খোঁজাখুঁজি করা হয়েছিল।

কিন্তু বেশি হৈ-চৈ করে নি। সফিয়ত বলেছিল—"ওরা বাড়ি-পালানো ধাতের মেয়ে, গেছে ভালোই হয়েছে। খুঁজে বেরাতে হবে না, ওরা হারাবে না।"

তবু তরা বাড়ি গিয়ে পৌঁছেছে কি না খবর করতে পরের দিন সফিয়ত লোক পাঠিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সব রহস্য বেরিয়ে পড়ল।

কেউ বলল—"গুলচ তরাকে বিয়ে করেছে।"

কেউ বলল—"তরাকে নয়, কপাহীকে।"

দু-একদিনের মধ্যেই আসল খবর সবাই ঠিকমতো জানতে পারল— গুলচ কপাহীকে বিয়ে করেছে, তরাকে নয়।

নানা ভাবে সমালোচনা হল, অনুকূল প্রতিকূল দুরকম মন্তব্যই শোনা গেল।

তরাকে সামনে রেখে গুলচকে ফুসলিয়ে কপাহী নিজেই গেল। অল্পবুদ্ধি মানুষকে বিশ্বাস নেই।

আগের থেকে কপাহীর সঙ্গেই ওর ভাবসাব ছিল। সেটাকেই এখন পাকা করল।

—তরাকেও নাকি বিয়ে করবে বলে আশা দিয়েছিল।

—তরাও নাকি খুব আশা করে ছিল, ওকে ঠকাল।

—কে কাকে ঠকাল জানবি কি করে? যার কপালে যা আছে হবেই, খণ্ডাবে কে?

—তরার কি আর বিয়ের বয়েস পার হয়েছে? এই তো সেদিনের মেয়ে, কপাহীকে বিয়ে করে গুলচ ভালোই করেছে!···

একদিন চন্দ্রর সঙ্গে গুলচের দেখা।

—"তুই এ-সব কি করলি রে গুলচ? আমার ধারণা ছিল তুই তরাকে ভালোবাসতিস্, অপোজিট!"

অপরাধীর মতো মাথা হেঁট করে গুলচ বলল—"তোর ধারণা ঠিকই। আমি, আমি কখনো ভাবি নি, কেমন করে সব যেন ওলটপালট হয়ে গেল।"

—"তরার প্রতি যদি দরদ ছিল, তো কপাহীর সঙ্গে নিকা করলি কেন?"

—"আমি বুঝতেই পারলাম না, মৌলবীর কথায় কানই দিলাম না। তরার বদলে ওর মাসী আসবে বলে জানব কি করে?"

—"তাই তো, কথাটা আমারও খেয়াল হয় নি, আমি আবার ভাবলাম ঘোমটা দিয়ে বুঝি তরাই এসেছে। যাক্, যা হবার হয়ে গেছে। এখন ভালো ভাবে চলিস— তরাকে আদর-যত্ন করিস।"

—"তা কেন করব না। ওকে আমার খুব ভালো লাগে, কিন্তু এখানে এসে ও মনমরা হয়ে আছে।"

—"কয়েকটা দিন এমন হবেই, সী মাস্ট স্যরি। তোরা দুজনেই ওকে স্নেহ করিস। ছোটো মেয়ে, নট ওল্ড গার্ল।"

গুলচ বলল—"যাকগে; যা হবার হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে চাষের মরসুম এসে যাবে। জমিগুলোর একটা পাট্টা করে দে—"

—"দেব, দেব, তুই চিন্তা করিস না, এবছরটা ভালো করে আবাদ কর। কলাই, সর্ষের দাম বেড়েছে, ধানেরও বাড়বে। এখন তুই একা না, ইউ থ্রি ম্যান। ভালো করে আবাদ না করতে পারলে না খেয়ে মরবি।"

গুলচও সে-কথাই ভাবছে, এখন বেশি করে কাজ করতে হবে, সারাটা বছরের জন্য ধান ফলাতে না পারলে ওরা কষ্ট পাবে, কপাহী কী খাবে, আর তরাই বা কী খাবে?

অবশ্য কপাহী শুয়ে-বসে থাকার মতো লোক নয়। পরের

সপ্তাহেই সে গুলচাকে দিয়ে দুখানা তাঁত পাতাল, সঙ্গে করে আনা জমানো টাকা ক'টা দিয়ে সুতো কিনিয়ে আনল। দুখানা তাঁত পেতে কপাহী আর তরা তাঁত বোনা শুরু করল। বসে থাকলে কি আর পেট ভরবে? রাস, গাড়ি, দশটনি ইত্যাদি তাঁতের অন্যান্য অংশগুলো বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল।

তরার দিকে তাকাতে গুলচ ভয় পায়। তরাকে দেখলে সে দমে যায়, নিজেকে অপরাধী মনে করে, চুপ করে থাকে।

তরার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। নিস্তব্ধ সংসারে একেবারে নীরব হয়ে গেছে, কথা প্রায় বলেই না! মাথা নিচু করে চুপচাপ কাজ করে যায়। ঘুম থেকে মাসীর চেয়ে আগে ওঠে, ঘর-দুয়োর ঝাঁট দেয়, নদী থেকে জল নিয়ে আসে, গোরুগুলোকে ছেড়ে দেয়, ধান ভানে, ঘর উঠোন নিকোয় আর রাত্রে গুলচরা শুতে গেলে সব-কিছু গুছিয়ে রাখে। কিন্তু সব-কিছু করলেও মুখে ওর রা-টি নেই, পৃথিবীতে আর যেন কেউ নেই, ও যেন একাই।

তরার মনের অবস্থা গুলচ কিছুটা বোঝে, কিন্তু উপায় নেই বলে দূরে সরে থাকে। বড়শি বেয়ে নদীর পাড়ে একটা বেলা কাটিয়ে আসে। গোরু চরাতে গিয়ে রাত করে বাড়ি ফেরে।

কথাবার্তা বলে শুধু কপাহী, যেন কোথাও কিছু হয় নি। সে আর গুলচ যেন অনেক দিন থেকে এভাবেই আছে, তরাও যেন ওদের সঙ্গে চিরদিন ছিল।

ফাগুন রঙ পালটাল, চৈত্র পার হয়ে এল বৈশাখ। ধনশিরির বুকে নতুন জলের স্রোত, গুলচদের উঠোনে নতুন ঘাস, মাটি সজীব, দিনগুলো আলোময় আর রাতগুলো উষ্ণ।

হাঁসের ডিমে তা দিয়ে ফোটানো নতুন বাচ্চা হাঁস কপাহী

খাঁচায় তুলল। তরাও ওর মুর্গীর বাচ্চাগুলোকে কাক-চিলের হাত থেকে বাঁচাতে ব্যস্ত থাকে।

গুলচ একবার ডালিমগ্রামে গিয়েছিল। গ্রামের এক বাড়িতে মাকে ডেকে এনে দেখা করে বলেছিল—"তোকে নিয়ে যেতে এলাম, বউটি। চল, আমার কাছে গিয়ে থাকবি।"

গজগজ করে মা বলল— "তোর কাছে? কেন? সেই চাপনী (বিয়ে না করেই কাঁধে চাপা মেয়েলোক) মাগীর হাতে ভাত খেতে যাব? কাক-শকুনে খেয়ে ফেললেও যাব না— অন্ততঃ ও ঐ সংসারে যত দিন আছে!"

মাথা নিচু করে গুলচ বলল— "তরাও তো আছে—"

—"আছে তো কী হল? তা, যেমন মা তেমনই তো মেয়ে হবে, একদিন ঐ মেয়েও উড়বে। বেশ করেছিস চাপনীকে ঘরে তুলেছিস, এখন তুই সুখে সংসার কর গে যা, আমায় আর ডাকিস না।"

গুলচও রাগ করে বলল— "না যাস্ তো থাক্, ছেলের বউয়ের সেবা-যত্ন পাওয়ার ভাগ্যি তোর নেই।"

—"ওটার সেবা-যত্নের আশায় মরছি না।" মা বলল।

অবশ্য কে কাকে বিয়ে করল, কার সঙ্গে কে পালাল— এ-সব চিন্তা করে থাকার সময় ডালিমের মানুষের নেই, বিয়ে হওয়াটাই খবর। যার যাকে খুশি বিয়ে করুক। গুলচকে বিশেষ কোনো অসুবিধের সম্মুখীন হতে হয় নি। ভালো হল কি মন্দ হল ভাববার প্রয়োজন বোধ করল না তেমন। ঘর-সংসার করতে হলে বাড়িতে একজন মেয়েমানুষ থাকা চাই— তা কপাহীই হোক আর যে-ই হোক। কে আর তাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাখবে?

বাড়িতে এলে কিন্তু গুলচের অস্বস্তি লাগে। সে অবশ্য সব কাজে তরাকেই ডাকে :

—"দে দেখি তরা, একবাটি জল দে।"

—"তরা আমার জামাটা কেচে দিস, কেমন।"

—"তরা, মাগুর মাছ ক'টা জীইয়ে রাখিস।"

—"তরা, গোরুগুলোকে জল দিতে ভুলে যাস না।"

তবু সে তরার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক সহজ করে তুলতে পারল না। তরার নীরবতায় এক অব্যক্ত অভিযোগ যেন গুমরে মরছে ; গুলচ তা অনুভব করে। ও সহজ হতে পারে না, অস্বস্তি বোধ করে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার আশায় সে অকারণে তরাকে ডাকে।

কপাহী কিন্তু একটা দিনের মধ্যেই গুলচের সঙ্গে সম্পর্ক পালটাতে পারল। যে গুলচকে এক সময় 'তুই' বলে নাম ধরে ডাকত সে গুলচকে 'তুমি' বলতে ওর এতটুকু বাঁধল না। আর গুলচেরও কপাহীকে 'বাইটি' ডাক ছেড়ে নাম ধরে ডাকতে মুখে আটকাল না।

কিন্তু তরা পারল না। বরাবর 'ককাইটি' বলে ডাকা গুলচকে কিছুতেই 'দদাইটি' বলতে পারল না। আজকাল ও গুলচকে কোনো নামেই ডাকে না। তুমিও না, আপনিও না, ককাইটিও না, দদাইটিও না, মাঝামাঝি কিছু একটা বলে। অদ্ভুত এক সংকোচ এসে বাধা দেয়।

গুলচের প্রতি ওর সেবাযত্ন কিন্তু এতটুকু কমে নি। দিন দিন যেন তা গভীর হতে লাগল। মুখ ফুটে কোনো কথা না বললেও সজাগ থেকে গুলচের সুখসুবিধের দিকে নজর দেয়। ওর জামা-কাপড় কেচে দেয়, ছেড়া জামা সেলাই করে, ওর রুচিমতো রান্না

করে খাওয়ায়, ওর সব কাজে সবরকম ভাবে সাহায্য করে। গুলচ আপ্যায়িত হয়, কৃতজ্ঞ হয়, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না।

মাঠে গোরু চরাতে গেলে হঠাৎ যদি হুড় হুড় করে বৃষ্টি নামে তা হলে তরাই দৌড়ে গিয়ে মাথালটা দিয়ে আসে। পায়ে কাঁটা ফুটলে নিচে থাবড়ি খেয়ে বসে কাঁটা বের করে দেয়, চাঁচাড়ি চাঁচার সময়ে বাঁশের চোঁচে হাত কেটে গেলে দৌড়ে এসে একটু নুন-হলুদ বেঁধে দেয়, কখনো কখনো গরমের সময়ে বাইরে থেকে এলে পাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া করে। ওর সুখের জন্য সর্বক্ষণ তরা ছায়ার মতো পাশে পাশে ঘোরে।

মুখে কিছু বলে না, যেন মৌনী। এটা-ওটা করতে ব'লে, এটা-সেটা জিজ্ঞেস ক'রে গুলচ ওর মুখ থেকে দুটো কথা বের করার চেষ্টা করে। কিন্তু ঠিক উত্তরটা ছাড়া একটিও বেশি কথা বলে না। মনে হয় তরা হাসতে ভুলে গেছে। গুলচ নিরস্ত হয়। কপাহী এ-সবের দিকে মনোযোগ দেয় না। কে হাসল, কে কথা বলল তা দেখার সময় ওর নেই। নতুন সংসার পাততে ও ব্যস্ত। একা একটা পুরুষমানুষ আর কী করবে, কত করবে। সব দিক সামলালে তবে তো সংসার।

ভেতরে ভেতরে তরার জন্য অস্বস্তি থাকলেও গুলচ কিন্তু সুখী। এখন বাড়ি ফিরে রাঁধা ভাতটুকু ও খোলা দরজাটা পায়। সুখ-দুঃখের কথা বলবার জন্য মনের মানুষ পেয়েছে। তা ছাড়া নতুন এই সংসারটার ও নিজে স্রষ্টা, নিজে বিধাতা, মাথার ওপর অন্য কেউ নেই।

আজকাল যতক্ষণ খুশি গুলচ মাঠে কাজ করে বা কাজ না থাকলে বসে কাটাতে পারে, ধনশিরির পাড়ে বসে মনের সাধ পূর্ণ

করে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে পারে, বিরিণাঘাসের মধ্য দিয়ে অকারণে মনের সুখে ঘুরে বেড়াতে পারে।

রাতের জ্যোৎস্নায় ও আর কপাহী উঠোনে চাটাই পেতে শুয়ে থাকে, তরা রান্নাঘরে রান্না করে। নিজেদের ছোটো ছোটো অভাব-অভিযোগের বিষয় আলোচনা করে।

একটা পুকুর কাটতে হবে।

চাষের জন্য সম্ভব হলে একটা মোষ কিনতে হবে।

তরার জন্য সোনার আংটি গড়াতে হবে।

শিমুলতলার ওদিকটার জমিতে কালো জহাধান বেশ ভালো হবে। সোহাগমণি ধানের বীজ একটু বেশি করে ছিটাতে হবে।

কখনো কখনো জোরে, কখনো ফিসফিস করে ওরা দু-চারটে পিরিতির কথাও বলে, জীবনের অভাবনীয় কথা মনে করে রোমাঞ্চিত হয়।

চাঁদের আলো ওদের মিষ্টি লাগে। ওপার থেকে বয়ে আসা হাওয়াটুকুও যেন কত আপন।

হয়তো তরা ওদের সব কথা কানপেতে শোনে, কিন্তু সে তাতে ভাগ বসায় না। ওর মনের কথা আপনমনে নিজেকেই বলে। বাতাস হয়তো সে-কথা শোনে, জ্যোৎস্নার আলো শোনে, রাত্রিটাও শুনতে পায়, শুনতে পায় না পৃথিবীর অন্য কেউ।

একটা ছিমছাম ছোট্ট সংসার, একটি শান্ত জীবন। সুখ-সমৃদ্ধির একটুকরো ছোট্ট স্বপ্ন— প্রচুর আশা, কিন্তু ব্যবস্থা পরিমেয়।

—"এখানটায় উঠোনের ঠিক সামনেই দুটো ফুলের চারা বুনব"— জায়গাটা দেখিয়ে গুলচ কপাহীকে বলে।

"আচ্ছা—" সংক্ষেপে কপাহী উত্তর দেয়। হয়তো ঠিক সে-সময়ে ও ফুলের চারার কথা ভাবে নি।

তরা শোনে। ও ভাবে, ফুলের চারা বুনলে রোজ জল দেনে। হাঁস-পায়রা, গোরু-ছাগল, মুর্গী-বেড়ালকে খুব ভালোবাসে, তরা ওদের বুকে জড়িয়ে আদর করে, ওদের সঙ্গে কথা বলে।

কপাহী আগের চেয়ে মোটা হয়েছে, দেখতে সুন্দরী হয়েছে, গাল-মুখে রক্তের ছোপ লেগেছে। মনে আনন্দ, মুখে হাসি লেগেই আছে। ওর দিকে তাকালে গুলচের মনেও আনন্দ হয়। তরা সামনে না থাকলে বলে, খুব রঙ লেগেছে না, কী মেখেছিস?

লজ্জা পেয়ে কপাহী আরক্তিম হয়, ওর চোখদুটো চক চক করে ওঠে।

তরা আগের চেয়ে আরো মোটা, আরো সুন্দর হয়েছে। হাত-পাগুলো গোল গোল, গাল দুটো গোলাপের পাপড়ির মতো, ঠোঁট দুটো লাল টুকটুকে।

ওর দিকে গুলচ বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না। ও অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তরাও হয়তো বোঝে, সেও লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে।

ধনশিরির পাড়ে জীবনের স্রোত মন্দাক্রান্তা গতিতে এগিয়ে চলে। গুলচদের জীবনও।

কুড়ি

নির্জন এক গ্রামের এক প্রান্তে মাঠের মাঝখানটায় একটা বাসা-বাড়ি। সেই বাসাবাড়ি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় এক স্থায়ী গৃহে। মাটিতে কোনোরকম করে গুঁজে রাখা কলা আর সুপারী গাছের চারাগুলোও লকলক করে বাড়ে। জঙ্গল কেটে তৈরি করা আবাস আর সে আবাস থাকবে না। বহির্মুখী মন গৃহমুখী মনে পরিণত হয়, জঙ্গল কেটে বার করা নতুন জমিতে নতুন জীবনের পলি পড়ে।

মাঝে মাঝে তিখর গুলচের বাড়ি আসে। সুখ-দুঃখের কথা বলে। পেলে চা-তাম্বুল খায়। না পেলে এমনিই বসে থাকে। তরা তিখরের সামনে বড়ো একটা বের হয় না, সে জানে তিখর অবিবাহিত জোয়ান ছেলে, এমন লোকের সঙ্গে মাখামাখি ঠিক নয়। কপাহী অবশ্য তিখরকে আদর-আপ্যায়ন করে। তার কাছে সে কৃতজ্ঞ—ঘাট থেকে তিখরই তো কপাহীকে গুলচের বাড়ি নিয়ে এসেছিল। ছেলেটা শান্ত, মিষ্টি। জোয়ান হলেও চঞ্চল নয়, ধীর স্থির। এই-জন্য গুলচও তাকে পছন্দ করে। গুলচ নিজেও ধীর স্থির, বেশি কথা বলে না। পুরুষমানুষের ধীর স্থির হওয়াই উচিত।

কখনো কখনো চন্দ্র আসে। তরা ও কপাহীর খবর-বার্তা নেয়, দুটো নির্দেশ উপদেশ দিয়ে চলে যায়।

কখনো ভীম আসে, গোরুগুলোর খবর নিয়ে যায়, গুলচের গোরু বাছুর তার কাছেই থাকে। হাতে করে কখনো একটু দই নাহয় একটু ঘি নিয়ে আসে। তরার প্রতি ওর যেন একটু দরদ, কেমন আছে খোঁজ নিয়ে যায়।

হঠাৎ আচমকা কোনোদিন সকাল অথবা বিকেলে চেনিমাই আসে। গুলচের সঙ্গে বেশি কথা বলে না, বলে কপাহী আর তরার সঙ্গে। তরা চেনিমাইকে খুব ভালোবাসে।

চেনিমাইর খুব পরিবর্তন হয়েছে। তরুণী হলেও ওকে আধ-বয়েসী বলে মনে হয়। ওরা গরিব, তা ছাড়া স্বামী অসুস্থ। দিন দিন অসুখ বেড়েই চলেছে। টাকার অভাবে চিকিৎসা তেমন হচ্ছে না। তা ছাড়া ভালো চিকিৎসা হবার আশাও নেই। অনেকে শহরের হাসপাতালে দেখানোর পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু সব-কিছুর মূলেই টাকা। মুখ ফুটে না বললেও চেনিমাইর মুখ দেখেই বোঝা যায় ওর মনে কোনো দুঃখ জমাট বেঁধে আছে। মুখে ম্লান হাসি, দুঃখের চিহ্ন।

ওর জন্য গুলচের কষ্ট হয়, হয়তো দরদও, কিন্তু কিছু বলে না। মনে মনে শুধু ভাবে— যদি ওর ভালো ফসল হয়, যদি দুটো পয়সা লাভ করতে পারে, তা হলে প্রয়োজনে কাউকে কিছু না বলে চেনিমাইকে সাহায্য করবে; এটা যেন ওর কর্তব্য।

চেনিমাই কিন্তু কখনো ওদের কাছে সাহায্য চায় নি।

কপাহী মাঝে মাঝে চেনিমাইদের বাড়ি যায়, তরা কিন্তু যায় না, নিজেদের বাড়ি ছেড়ে তরা কোথাও যায় না। চেনিমাই কখনো ডাকলে বিষাদের হাসি হেসে সেখান থেকে চলে যায়। তবু ধীরে ধীরে গুলচরা ওপারের গ্রামেরই একঘরে হয়ে পড়ে।

গুলচ কিন্তু কখনো নামাজ পড়তে শেখে নি। শেখা হল না, সে-জন্য ওর কোনো আক্ষেপ নেই। গ্রামের কজন লোক আর নামাজ পড়তে জানে? শুক্রবারেও ও জুম্মার নামাজে যায় না।

শুধু ঈদ ও বকরিদে মসজিদে যায়। কিছু না জেনেও অন্যদের সঙ্গে ওঠ-বস করে।

মাঝে মাঝে শুক্রবার দিন ওকে মসজিদে যাওয়ার কথা কপাহী মনে করিয়ে দেয়। আগে নামাজ পড়তে না জানলেও চলত, এখন ঘর-সংসার হয়েছে, আল্লারসুলের চিন্তা করতে হয়। তা নাহলে এখানকার লোকেই বা কী বলবে?

ও কিছু বলে না; কপাহীকে বলতে পারে না যে নামাজের ও কিছুই জানে না। তা ছাড়া শেখারও আর সময় নেই।

অবশ্য মসজিদে না যাওয়ার জন্য কপাহী তেমন কোনো অনুযোগ দেয় না। গ্রামের ক'জন লোকেই বা নামাজ পড়ে? জোয়ান ছেলে বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে সবই করবে, তা ছাড়া মসজিদটাও অনেকটা দূরে। একবার গেলে অর্ধেকটা দিন চলে যায়।

কখনো কখনো গুলচ চেনিমাইদের বাড়ি যায়, সাধারণভাবে খবর-বার্তা নিয়ে চলে আসে। চা-জলপান খেতে দিলে খায়। কলাই কেমন আছে, ওর কী চিকিৎসা হচ্ছে, এই ধরনের খবর নেয়। ওদের বাড়ি গেলে চেনিমাইও গুলচকে দু-চারটে কথাবার্তা জিজ্ঞেস করে, সাধারণ পারিবারিক কথা। পরস্পরের কাছ থেকে ওরা দূরে দূরে থাকার চেষ্টা করে। দুজনের জীবনের স্রোত আজ দুদিকে বয়ে চলেছে। এই দুর্লঙ্ঘ ব্যবধানকে স্বীকার না করার কোনো যুক্তি নেই। অবশ্য ওদের দুজনের পরস্পরের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। ওদের সম্পর্কও বেশ সহজ হয়ে এসেছে। ওদের

আগের সম্পর্কের কথা মোলোকা, কলাই বা তিশ্বর কেউই তেমন কিছু জানে না।

আষাঢ়ের মাঝামাঝি।

চাষের কাজ শুরু হয়ে গেছে। এখানকার কেউ কেউ কিছু জমিতে আষাঢ়ের গোড়ার দিকেই আগুরি ধান বুনতে শুরু করে। অবশ্য কিছু জমিতে আশ্বিন পর্যন্ত বোনা হয়। এগুলো নদীর জলের সার পড়া নিচু জমি।

কপাহী ও তরা দুজনে চারাধান তুলতে গিয়েছিল। খাঁ খাঁ করছে রোদ, সূর্য একটু হেলেছে।

উঠোনের সামনে বসে গুলচ পাচনবাড়ি একটা চাঁচছিল। এমন সময়ে চন্দ্রর সঙ্গে একটা লোক এসে হাজির।

—"গুলচ আছিস? খবর ভালো তো?" চন্দ্র জিজ্ঞেস করল।

—"হুঁ, ভালোই, আয় বোস, সঙ্গে ইনি কে?"

দুটো মোড়ায় ওরা দুজন বসল।

—"চিনতে পারিস নি? তাই তো— কী করে চিনবি। অনেকদিন পর এসেছে। এ হল আমাদের বসিরত 'দাইটি—"

গুলচ বসিরতের দিকে ভাল করে তাকাল। তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর বয়েস। চেহারাটা একটু কাটখোট্টা গোছের। শ্যামবর্ণ, মুখে পাতলা দাড়ি। পরনে একটা নতুন সার্ট ও লুঙি।

—"কে বললি—?" গুলচ জিজ্ঞেস করল। ও লোকটাকে চিনতে পারে নি। এর আগে কখনো দেখেছে বলে মনে করতে পারল না।

এবার লোকটা নিজে বলল— "তুমি আমাকে চিনতে পারবে না। আমিও আজই তোমাকে প্রথম দেখলাম। এখানকার লোক আমি নই। তবে বেশ-কিছুদিন আগে এখানে বছর দুয়েক ছিলাম।

আজকাল মাঝে মাঝে আসি। কারবার করি—এক জায়গায় থাকা হয় না।”

চন্দ্র বলল—“ইনি বিজনেস করেন বুঝলি? খুব ভালো কাজে হাত দিয়েছেন। আমাদের অসমীয়া লোকেরা বিজনেস করে না, করলেও প্রফিট করতে পারে না। ওনার কথা অবশ্য ডিফারেণ্ট, মানে বিগ্ বিজনেস্, বিগ প্রফিট।”

বাটায় তাম্বুল এনে গুলচ ওদের সামনে রাখল।—“তা এখানে কী কারবার করবেন?” গুলচ জানতে চাইল।

বসিরত এবার একটু গম্ভীর হল। তারপর ধীরে ধীরে বলল—“উঁচু জমিই হোক আর নিচু জমিই হোক, চাষ করতে অনেক জিনিসের দরকার হয় না? এই ধরো, ভালো বীজ, গোরু-মোষ, চাষের সরঞ্জাম। আরো কত কিছু। টাকা থাকলেই এ-সব হয়। কিন্তু আমাদের চাষীর আর কত টাকা আছে!”

বসিরতের কথার সঙ্গে জুড়ে চন্দ্র বুঝিয়ে বলল—প্রয়োজন হলে বসির চাষের সময়ে আগাম টাকা দেয়। বীজের ব্যবস্থা করে, গোরু-মোষ কেনার জন্যও আগাম টাকা দেয়। এইজন্য ও সুদ নেয় না, সামান্য কিছু লাভ নেয়। তা এখন দিতেও হয় না। ফসল তোলার পর নেয়। টাকা দিলে টাকা নেয়, না হলে কলাই-সর্ষে-ধান-আলু, যে যা দেয় তাই-ই নেয়। মোট কথা, এদ্দিন মারোয়াড়ী মহাজন আর তেলের ব্যাপারীরা যে-সব কাজ ক’রে চরের চাষীদের ঠকিয়ে খেত, এখন দেশের মানুষ বসিরই সে-সব ক’রে গ্রামের লোককে সাহায্য করবে। টাকাটা যে আসলে বসিরের নয়, তার মহাজনের, সে কথাও চন্দ্র সেইসঙ্গে বুঝিয়ে বলল। তবে বসির ও তার মহাজনের মধ্যে খুব সদ্ভাব। বসির যা বলে

মহাজন শোনে, তাকে অবিশ্বাস করে না। আজ সতেরো-আঠারো বছর মহাজনের সঙ্গে থেকে তার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

গুলচ বলল— "আমার অন্য কিছু চাই না, সম্ভব হলে একটা মোষ কেনার ইচ্ছে ছিল। আচ্ছা আপনি আছেন কোথায়?"

বসির বলল—"এই কাছেই, ধনশিরির মুখ থেকে মার-নৌকো করে উজিয়ে এসেছি। বটতলায় পুরানো ডালিমের ঘাটে নৌকো বেঁধে সেখানেই আছি। দিন কয়েক থেকে আরো একটু উজিয়ে যাব।"

এমন সময় কপাহী ও তরা মাঠ থেকে ফিরে এল। রোদে চারাধান তুলে তুলে দুজনের চেহারা পাকা থৈকড় ফলের মতো হয়েছিল। কপাল বেয়ে ঘাম পড়ছিল। পরনের মেখেলা জলে-কাদায় মাখামাখি হয়ে গায়ে লেপ্‌টে ছিল।

উঠোনে বাইরের লোক দেখতে পেয়ে দুজনে চট করে পেছন দিকে চলে গেল, মানুষগুলোর দিকে তাকাল না। বসির কিন্তু তাকাল।

—"আচ্ছা, আমি বাসায় জিজ্ঞেস করে দেখি। দরকার হলে চন্দ্রকে জানাব—"

—"আচ্ছা ঠিক আছে—" বসির বলল। "এবার আমরা উঠি।" ওরা উঠে দাঁড়াল।

স্নান করার জন্য ভেতরে কাপড় আনতে গিয়ে বেড়ার ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে কপাহী বসিরকে দেখল, কিছুক্ষণ দেখে সেখান থেকে চলে গেল।

তরা কিন্তু কারো দিকে তাকাল না। সে সোজা স্নান করতে চলে গেল। আজকাল স্নান করতে আর নদীতে যেতে হয় না।

বাড়িটা বানানোর সময়ে ভিতের মাটি কাটতে গিয়ে একটা গর্ত মতো হয়েছিল। সেটারই পাড়গুলো বেঁধে পুকুরের মতো করা হয়েছে। সেখানে বর্ষার জল জমেছে।

রাতে খাবার সময়ে কপাহী জিজ্ঞেস করল, "চন্দ্রর সঙ্গে লোকটা কে?"

—"কোথাকার এক বসির, কারবারী লোক। চাষের জন্য আগাম টাকা, বীজ এ-সব দেয়। ভাবছি একটা মোষ কিনব—"

—"এমনি এমনি কি দেবে?"

—"এমনি আর কে কাকে দেয়, ফসল তোলার পর টাকা ফেরত দিতে হবে। একটু বেশি করে দিতে হবে আর কি—"

—"আর ধার-টার করে দরকার নেই। অন্যেরা আগে নিক, আমরা ধীরে ধীরে নেব।"

—"সে তো ঠিকই—" গুলচ বলল।

তারপর কোন্ জমিতে কী ধান বুনলে ভালো হবে, কোন্‌টাতে কবে বুনবে, কোন্ জমিতে ক'চাষ দিতে হবে ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কথা অনেক রাত অবধি আলোচনা করল।

দিন কয়েক পরে বসিরত আবার এল, তখন বাড়িতে গুলচ ছিল না, কপাহী আর তরা ছিল।

ডাকাডাকি শুনে প্রথম কেউ উত্তর দিল না, তারপর সামান্য ইতস্তত করে কপাহী বেরিয়ে এল।

—"গুলচ বাড়ি নেই?"

—"বাইরে কোথাও গেছে—"

—"এখনই ফিরছে কিনা?"

—"জানি না।"

—"মোষ একটা কেনার কথা বলেছিল—"

—"এক্ষুনি কেনার দরকার নেই, একজোড়া বলদ আছে।"

—"নতুন করে জঙ্গল কেটে বের করা জমি বলদ দিয়ে কি আর চাষ করা যাবে?"

কপাহী চুপ করে রইল।

—"বিরিণাঘাসের শিকড়ে ভরা নতুন জমি কি আর বলদ দিয়ে চাষ করা যায়? একবার মোষ দিয়ে চষে নিতে পারলে ভবিষ্যতে বলদ দিয়েও করা যাবে। এখন পয়সা-কড়ি দিতে হবে না। ফসল তোলার পর দিলেও চলবে। এবছর না হয় সামনের বছর দিলেও হবে। কেউ তো আর কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না—"

কপাহী ভেতরে গিয়ে তাম্বুলের বাটায় কয়েকটা তাম্বুল কেটে এনে বসিরতের সামনে রাখল।

বসিরত একবার ভালো করে কপাহীকে দেখল, কপাহীও বসিরতকে একবার দেখে মাথা নিচু করল।

যাওয়ার সময়ে বসিরত বলল—"আমি টাকা দিয়ে যাব, একটা মোষ যেন কিনে নেয়।"

সংক্ষেপে কপাহী বলল—"আচ্ছা—বলব—"

কাগজে-পত্রে কোনো লেখা-লেখি হল না। বসিরত গুলচকে নগদ তিন কুড়ি টাকা দিল। দুই কুড়ি আঠারোতে একটা জোয়ান ভিন্-দেশী মোষ কিনল। সুন্দর, গোলগাল কালো রঙের মোষটা —শিং দুটো দেখবার মতো। ভাগ্য ভালো হলে আট-দশ বছর কাজে লাগানো যাবে— বয়েস বেশি না।

মোষটা পেয়ে সবাই খুশি।

আজ থেকে গুলচ মোষ দিয়ে চাষ করবে। বছর ফিরলে মোষের

দামের ওপর আরো পনেরো টাকা বেশি দিতে হবে। ফসল ভালো হলে এটা তেমন কোনো কথাই নয়।

এবছর খরার দিনে আরো কিছুটা জমি বের করতে পারলে শীতের আবাদও বেশি করে করা যাবে— কলাই, সর্ষে, কপি, মুলো।

গুলচের চোখের সামনে সবুজ স্বপ্নের ঝিলিমিলি।

কপাহী ও তরার সঙ্গে সঙ্গে গুলচের ঘরে লক্ষ্মী এসেছেন যেন। অনাবাদী সরস জমি, নদীর সার পড়া জমি, পলি পড়া জমি— আঙুল দিয়ে কোনো রকমে গুঁজে রাখলেই লক্‌লক্‌ করে চারা গজায়। চৈত্র মাস থেকে লাউ ফলছে— খেয়ে অরুচি ধরে গেছে। আদাগুলোতে যা গোছ এসেছে দেখলেই ভালো লাগে। দুটো পানের চারা হয়েছে— ধানী লঙ্কার গাছটা বড়ো ঘরের ডোয়ায় গজিয়েছে— রোজ আঁজলা ভরে তুললেও শেষ হয় না— এত ফলেছে। আজ গুলচের সংসারের দিকে তাকালে মনে হয় না যে নতুন সংসার— যেন কতদিন আগেকার পুরানো বাড়ি-ঘর-বাগান।

দূর থেকে তাকিয়ে দেখলেই গুলচের মন আনন্দে ভরে ওঠে। কপাহী বা তরা কেউ এক মুহূর্ত বসে থাকে না। ঘরে অন্য কোনো কাজ না থাকলে বাগানে ঢুকে এটা ওটা নিড়ায়, গোড়া খুঁচিয়ে দেয়। বাড়ির চারপাশে গাছপালায় ভরে থাকার জন্য পা ফেলার জায়গা নেই। তিনজনে মিলে আমের চারা, পেয়ারার চারা, জাম-পানীয়ালের চারা এনে পুঁতেছে। সকাল-সন্ধে দুবেলা দূর থেকে ঢেঁকির শব্দ শুনতে গুলচ ভালোবাসে। তিন প্রহর রাতে মুর্গীর ডাক ওর আরো যেন মিষ্টি, আরো যেন ভালো লাগে। একটু পরে ওরাও ঘুম থেকে ওঠে।

মাঠের কাজ শেষ করে তুজনে তাঁতে কাপড় বুনছে। কপাহী বুনছে বড়ো কাপড় আর তরা বুনছে রিহা। তরা তাঁতে ফুলের নকশা পাখির নখের মতো মিহি করে বুনতে পারে। ওর এ কাজ যে-কোনো শিপিনীর ঈর্ষার কারণ। ডালিম গ্রামে থাকতে লোক ওকে 'মাকড়শা' বলে ক্ষেপাত— ওর হাতের কাজ এত সূক্ষ্ম। কোথাও এতটুকু খুঁত নেই।

তাঁতের গাড়ি-মাকু-দশটনির শব্দের তালে তালে গুলচের মনটাও নাচে। একটা সজীব ঘর, একটা প্রাণময় জীবন্ত সংসার— সবুজ জীবন রসে উচ্ছল, প্রাচুর্য-মুখর।

সব থেকেও সংসারটায় একটা জিনিসের অভাব— তরার হাসি, তরার কথা। তরা এখনো নীরব। বাইরের ও ভেতরের সব কাজ ও করে— একটুও বিশ্রাম নেই, একটুও ক্লান্তি নেই। তবু সর্বদা ও মাথা নিচু করে থাকে, সর্বদা ও মন-মরা। সর্বদা কথাবার্তা বলে গুলচ ও কপাহী, হাসে ফুর্তি করে গুলচ ও কপাহী। তরা চুপ করে থাকে, কিছু বলে না, কিছু কয় না, কিছু জিজ্ঞেস করে না, ও যেন নেই। সংসারের ওর থাকার যেন কোনো তাৎপর্যই নেই। আনন্দের সমস্ত সামগ্রী জীবনে ভরপুর থাকা সত্ত্বেও তরার যেন আনন্দ নেই। অবশ্য তরার মন আগের চেয়ে কিছুটা হাল্কা হয়েছে। তবু মনে হয় ওর প্রাণের সজীবতা কোথাও যেন হারিয়ে গেছে! বাইরের জগৎটার দিকে তাকানো ছেড়ে দিয়ে যেন মনের ভেতরের তুর্বোধ্য জগৎটার সন্ধান পাবার জন্যই ওর সাধনা।

একুশ

মোষটার পিঠে চড়ে ধানক্ষেত দেখতে দেখতে গুলচ নদীর পাড়ের দিকে যাচ্ছিল। কার্তিকের মাঝামাঝি। বেশির ভাগ ধান গাছে ছড়া বেরিয়েছে। ধানক্ষেত থেকে কাঁচা ধানের গন্ধ ভেসে আসছিল। তখনো কুয়াশার ঘোর ভালো করে কাটে নি।

মোষকে আর ধান কেটে খাওয়ানোর দরকার নেই। ধনশিরির পাড়ে ঘাসের অভাব নেই। হাঁটু-সমান উঁচু ঘাসে মাঠ, জলা সব ভরে আছে।

ওপারের গ্রামের দক্ষিণ দিকে নদীর পাড় ঘেঁষে এক টুকরো জঙ্গল। অবশ্য ডালিমের পশ্চিম দিকের বড়ো জঙ্গলটার মতো অত বড়ো ও ভয়ংকর নয়।

এদিককার জঙ্গলে হাতি তেমন বেরোয় না, কিন্তু হরিণ আর বাঘ আছে। মাঝে মাঝে হরিণরা এসে ক্ষেতের ধান খেয়ে নষ্ট করে। অবশ্য গুলচের জমিটা জঙ্গল থেকে একটু দূরে— একেবারে কাছে নয়।

মোষটাকে একটা জলায় ছেড়ে দিয়ে গুলচ জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। শিশিরে ভেজা ঘাস পাতাগুলো ওর বড়ো আপন লাগছে; ওর প্রাণের গভীরে ছিল অরণ্যের প্রতি আদিম প্রীতি;

বনানীর ভিজে নিশ্বাস ওকে উন্মনা করে তোলে— অকারণ আনন্দে ও পথঘাটহীন জায়গা দিয়ে পথ কেটে কেটে যাচ্ছিল। দুপাশে উঁচু উঁচু বিরিণা ঘাস— শিশিরে ভিজে-পাতাগুলো নুয়ে পড়েছে।

কুয়াশা ভেদ করে রোদের সাদা আলো ক্রমে চারদিক ছেয়ে ফেলল। আর-কিছুক্ষণ বাদে সারাটা পৃথিবী উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ঘাস পাতা সব জীবন্ত হয়ে উঠবে।

কিছুদূর গিয়ে গুলচ ছোটো একটা গোরু-চলা পথ পেল। নদীর পাড় থেকে বিরিণা বনের মধ্য দিয়ে ওপারের গ্রামের দিকে চলে গেছে পথটা। সংকীর্ণ গোরু-চলা পথ— এক-দেড় হাত মতো চওড়া। গোরু-মোষের পায়ের চাপে বিরিণা, খাগড়া ইত্যাদি মরে গিয়ে পথটা তৈরি হয়েছে।

পশ্চিমে মুখ করে গোরু-চলা পথটা দিয়ে নদীর দিকে গুলচ কয়েক পা এগিয়েছে। সামনের দিকে চাইতেই দেখল কে একজন আসছে, গুলচ আর-একটু এগিয়ে গেল।

এ যে চেনিমাই!

গুলচকে এভাবে দেখতে পেয়ে চেনিমাই থমকে দাঁড়াল। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। উঁচু বিরিণা ঘাসের ভেতরে সংকীর্ণ গোরু-চলা পথ— আশেপাশে কোনো জনপ্রাণী নেই।

—"তুই— তুই এদিকে কোত্থেকে এলি চেনি?" গুলচ শুধোল।

—"সর্বা মোড়লের বাড়ি গিয়েছিলাম—"

—"মোড়লের বাড়ি? কেন? এই সকাল বেলা যে—"

—পাঁচটা টাকার ধান নেয়া হয়েছিল। ঝেড়ে-ঝুড়ে রেখে এলাম, পরে তিখর গিয়ে নিয়ে আসবে—।"

—"তোদের গোলায় ধান নেই ?"

—"আজ কুড়ি দিন হয় শেষ হয়ে গেছে।"

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

—"তুই এদিকে কোথায় যাচ্ছিস ?" চেনিমাই জিজ্ঞেস করল।

—"কোথাও যাচ্ছিলাম না, মোষটাকে নিয়ে এদিকটাতে এমনি এসেছিলাম।"

—"আমি যাই, কেউ এসে পড়বে—" ও চলে যেতে চাইল।

—"শোন চেনি—"

—"কি ?"

—"সব কেমন জানি ওলট-পালট হয়ে গেল, কী করবি—।"

মুখে কিছু না বলে চেনিমাই মাথা হেঁট করে রইল।

—"তোর কথা আমার সর্বদা মনে হয়।"

—"কেন, কপাহী কি ভালোবাসে না ?"

—"বাসে, কিন্তু তোর কথা আমার খুব মনে হয়। তা ছাড়া তোর বিয়ে হল কলাই-এর সঙ্গে—।"

—"সে-সব কথা আর বলছিস কেন ? কপালে যা হবার ছিল হয়েছে, তোদের মঙ্গল হলে আমারও মঙ্গল।"

আর-কিছু না বলে চেনিমাই চলে গেল। কী একটা কথা বলব বলব করেও কিছুতেই গুলচ মুখ ফুটে বলতে পারল না, শুধু চেনিমাইর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

কিছুদূর গিয়ে চেনিমাই দাঁড়িয়ে পড়ল। সে ঘুরে গুলচকে বলল—

—"এদিকে শোন্—"

গুলচ কাছে এল।

—"কী হল চেনি?"

একটু উত্তেজিত স্বরে চেনি বলল—"বাবা-জ্যাঠারা মিলে আমার জীবনটা নষ্ট করল, বিয়ে দিল এই আধমরাটার সঙ্গে। ওটার সঙ্গে বিয়ে দেয়া না দেয়া একই কথা। কোন্ দিন চোখ বোজে ঠিক নেই। আমি যেন এখানে বিনে পয়সার ঝি-গিরি করতে এলাম। ওটার সেবা-যত্ন করতে হয়, সংসারের ভেতরে বাইরে সব-কিছু দেখাশোনা করতে হয়। এখন হাতে কুলো যাও, মাথায় টুকরি নিয়ে গ্রামে গ্রামে ধানের খোঁজ করো। আমি আর এ-সব কিছু করতে পারব না। সুযোগ বুঝে আছি। ধনশিরির পথটা চিনে রেখেছি। কোনো দিন শুনবি যে অমুক নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে। আমি এ কথা বলে রাখলাম।"

ওর কথা শুনে গুলচ ভয় পেল। কম দুঃখে কি ও আত্মঘাতী হওয়ার কথা বলছে! কিন্তু এখন আর করার কি আছে?

গুলচ কোনোরকম করে বলল—"রাগ-গোসা করে লাভ কি? আমি কাছেই আছি। তুই যদি কিছু মনে না করিস তা হলে তোর খোঁজ-খবর আমি করব।"

মাথা তুলে চেনি গুলচের দিকে তাকাল।—"তোর নিজের সংসারটা নেই না কি?"

"তা বলে কি তোর খবর করব না? তবে অন্যেরা অন্যভাবে কথাটা না নিলেই হল—"

—"যে যা ভাবে ভাবুক। দরদ থাকলে তুই আমার কাছে মাঝে মাঝে আসিস। তা না হলে আমি এই ভাবে আর বেশি দিন বেঁচে থাকতে পারব না।"

—"ঠিক আছে, তুই চিন্তা করিস না।"

চেনি চলে গেল, ও একটু আশ্বস্ত হল। এখনো ওর প্রতি গুলচের দরদ।

কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে চেনির পথের দিকে গুলচ চেয়ে রইল। চেনি ঠিক আগের মতোই আছে। বিয়ে তো মাত্র নামে, লোকটা অসুস্থ। চেনির জন্য ওর কষ্ট হল।

গোরু-চলা পথটা ছেড়ে বিরিণাবনের মধ্য দিয়ে বাড়ির দিকে চলতে লাগল। তখন সাদা মিষ্টি রোদে বিরিণাবন ছেয়ে গেছে। নদীর দিক থেকে হাল্কা হাওয়া বইছে। গায়ে হাওয়া লাগতেই চেনিমাইর কথা যেন ভুলে গেল। আকাশের দিকে চেয়ে দেখল —একটা ঘন নীল রঙের আকাশ, কোথাও একটু মেঘ নেই। নীল আকাশটা অনেক দূরে নেমে এসে পৃথিবীকে যেন আলিঙ্গন করছে।

বাতাসে কেঁপে কেঁপে ওঠা বিরিণা-খাগড়াগুলো ঝির-ঝির শব্দ করে রোদের আলোয় সজীব হয়ে উঠছে। পথ নেই, ও পায়ে মাড়িয়ে বিরিণা ভেঙে ভেঙে পথ বের করে নিচ্ছিল।

হঠাৎ উঁচু বিরিণাঘাসের জঙ্গলের মধ্যে ও থমকে দাঁড়াল। একটু যেন ভয় পেল।

তরা!

ও দাঁড়িয়ে পড়ল।

এই দিকে তরা যায় কোথায়? ও এল কোথা থেকে? এদিকে তো কোনো পথ নেই!

তরা ওর সামনে এসে পড়ল।

—"তরা—"

তরা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল গুলচের সামনে।

—"তুই এদিকে কোথায় যাস তরা?"

—"চন্দ্র এসেছে—ডাকছে—"

—"কি করে জানলি আমি এখানে?"

তরা কিছু বলল না।

গুলচ তরার কাছে এসে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, "চন্দ্র কি সত্যই এসেছে?"

তরা কিছু বলল না।

—"এই তরা, তুই আমার সঙ্গে আগের মতো কথাবার্তা বলিস না কেন রে?"

কাঁদো কাঁদো সুরে ও বলল— "তুমি, তুমি আমায় ঠকালে কেন?"

গুলচ নীরব হয়ে রইল; কী একটা বলতে গিয়েও পারল না। তরাকে ও ফাঁকি দিতে পারবে না। কিন্তু কি করে যে কি হল বুঝিয়ে বলতেও পারবে না। ও নিজেও আজ পর্যন্ত ভালো করে কিছু বুঝতে পারে নি। তরার এ প্রশ্নের আজ কোনো উত্তর নেই।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গুলচ জিজ্ঞেস করল—"তোর মাসী ঘরে আছে?"

—"না, ওপারের গ্রামের দিকে গেছে। কাদের বাড়ি জানি মুগা আছে, তারই খোঁজে গেছে।"

পা দিয়ে কয়েকটা বিরিণা ভেঙে গুলচ জায়গাটা একটু পরিষ্কার করে নিল। তারপর বলল—"এখানটায় একটু বসি আয়—"

—"না, কেউ এসে পড়বে।"

—"কে আর আসবে? এটা কি রাস্তা? এই বিরাট বিরিণা-বনের মধ্যে আমরা আছি কে জানবে?"

কয়েকটা বিরিণা ঘাস নিচে পেতে তার ওপর দুজনে বসল।

গুলচ বলল— "ঘরে কথাবার্তা না বলে সবসময় তুই মনমরা হয়ে থাকিস, আমার খুব খারাপ লাগে।"

—"তোমরা দুজনে হেসে-খেলে আছ, আমি আর কোন্ মুখে হাসব?"

গুলচ বলল— "মন খারাপ করে থাকলে আমার ভালো লাগে না। বাড়িতে আমার থাকতে ইচ্ছে করে না, জানি না তুই কি ভাবিস।"

গুলচ তরার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল— "তুই আগের চেয়ে মোটা হয়েছিস।"

তরা কোনো উত্তর না দিয়ে কি জানি কি ভেবে বসে রইল। ও বলল— "আমার ওপর তোর স্নেহ ভালোবাসা কি সব ফুরিয়ে গেল নাকি তরা?"

—"ভালোবাসা না থাকলে আমি তোমার ঘরে পা-ই ফেলতাম না। তুমি ভুলে গেছ বলে ভেবো না আমিও ভুলে গেছি।"

গুলচ দুহাতে তরাকে বুকের মধ্যে টেনে নিল। তরাও দুহাতে গুলচের গলাটা জড়িয়ে ধরল।

কিছুক্ষণ পর ওরা উঠে দাঁড়াল। গুলচ বলল— "তুই যা, আমি মোষটা নিয়ে আসছি।"

তরা আর-এক বার দুহাতে গুলচকে জড়িয়ে ধরে ওর বুকের ভেতর মুখটা রেখে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলে গেল, একবারের জন্যও ফিরে তাকাল না।

মোষটার খোঁজে গুলচ বাঁওড়টার দিকে গেল। কিছুক্ষণ বাদে মোষটার নাকের দড়িটা ধরে বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

কার্তিক মাসের সূর্যটা তখন মাথার ওপর। সাদা সাদা রোদ আকাশের বুক থেকে পৃথিবীতে নেমে এসেছিল অবিশ্রান্তভাবে।

নিজেদের ধানক্ষেতের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে গুলচ আপন মনে বাতাসে দোল খাওয়া সবুজ ধানগাছের দিকে তাকাল ; বাড়ন্ত গাছ, নতুন নতুন গোছগুলো বেশ বড়ো বড়ো গাছ হয়ে উঠেছে। থোকা-গুলো এখনো পাতলা, সব ধানে চাল হয় নি, কতগুলো দুধে ভরা। গর্বে ওর বুক ফুলে উঠল। নদীর পাড় পর্যন্ত এই সম্পূর্ণ জমিটার মালিক ও নিজে, অন্য কেউ নয়। সামনের বছর আরো দুপুরা মতো জমি বের করতে পারলে ওর আর ভাবনা থাকবে না। এবছর বলদজোড়া কোনো কাজে লাগল না। হাল বায় ও একা। মোষ আর বলদের দুটো আলাদা লাঙ্গল ও একা হাতে কী করে টানবে ? যদি একজন সঙ্গী পাওয়া যেত !

নানা কথা ভাবতে ভাবতে ও মনের আনন্দে ও ধীরে ধীরে বাড়ি পৌঁছল। তখন কপাহীও ফিরেছে।

বাইশ

ধনশিরির বুকের ওপর দিয়ে আর-একটা বর্ষার প্লাবন বয়ে গেল। বড়ো কিছু নয়। এবছর জঙ্গল কেটে গুলচ আরো তিন বিঘের মতো জমি বের করল। চন্দ্রের সাহায্যে আগের জমিগুলোর

একসনা পাট্টাও করিয়েছে। হাঁস-মুর্গী-গোরু-বাছুরের সংখ্যাও দু-চারটে বেড়েছে। নতুন উদ্যম; নতুন আশা নিয়ে গুলচ কাজ করছিল। এই তো সময়। এখন ও ভরা যৌবনে পা দিয়েছে— ছাব্বিশ বছর বয়েস। এই বয়েসে যতটা পারা যায় করে নিতে না পারলে আর হবে না।

কপাহীরাও বসে থাকে না। কিস্তিতে কিস্তিতে কাপড় বোনে, কাপড় বেচে। বাগানের লঙ্কা-বেগুন হাটে বেচে ওরাও দু-চার পয়সা যা পারছে রোজগার করছে।

তরা কিন্তু আগের মতোই উদাসীন। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে কথা বলে না, হাসে না, হাসিঠাট্টাও করে না। কখনো কপাহী কোথাও গেলে ও আর গুলচ একা ঘরে থাকে। তখনো কিন্তু তরা কথা বলে না বা হাসে না। কাছে এসে গুলচ ওকে আদর করতে চাইলে ও দূরে সরে গিয়ে বলে— "এমনি স্নেহ করবে, এ-সব কোরো না।"

অবশ্য আজ পর্যন্ত অবাঞ্ছনীয় কোনো কাজ গুলচ করে নি। সর্বদা মনমরা হয়ে থাকা তরাকে মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করা ছাড়া ও আর কী করতে পারে? ওর অন্তরের ভালোবাসা সে ভাষায় বুঝিয়ে বলতে জানে না।

গুলচ একটু যেন মুশকিলে পড়ে, কারণ তরার মন বোঝা সত্যিই ভার। ও এত চুপচাপ থাকে যে কখন কী ভাবে, কখন কী বলে ভালো করে বোঝা দায়। গুলচ অতি সন্তর্পণে চলে, তরা যাতে মনঃকষ্ট না পায় এই ওর চেষ্টা।

আজকাল তিখর গুলচের বাড়ি প্রায়ই আসে। তিখরের সঙ্গে তরা বড়ো একটা কথা বলে না, কখনো প্রয়োজনে দু-চারটে কথা

বলে, এই যা। কপাহীর সঙ্গে কথা ব'লে তিখর চলে যায়। অবশ্য চলা-ফেরা, কথাবার্তার ধরন-ধারণ দেখে কপাহী বেশ বুঝতে পেরেছে যে তিখরের মন তরার দিকে একটু ঝুঁকেছে। আজকাল কপাহীদের বাড়ি আসার সময়ে সে বেশ সেজে-গুজে আসে। সিঁথি কেটে চুল আঁচড়ায়, সার্ট পরে, আর পকেট থেকে রঙচঙে রুমালটা সামান্য বের করে রাখে। সে অবশ্য তার মনের কথা এ-পর্যন্ত কাউকে বলে নি। কপাহীর সঙ্গে চাষ-বাস, গোরু-মোষের কথাই বেশি হয়।

ও মনে মনে একটা বুদ্ধি এঁটে রেখেছে। গুলচ মাঝে মাঝে ওদের বাড়ি যায়, চেনিমাইর সঙ্গে কথাবার্তা বলে, কখনো-কখনো কলাই-এর সঙ্গেও বলে। চেনিও কখনো কখনো কপাহীদের বাড়ি আসে। কথাটা ওর বৌদি চেনিকে বলবে। চেনি গুলচ আর কপাহীর মন বুঝে নিতে পারবে। তরার মনের কথাও ও বুঝে নিতে পারবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কথাটা চেনিমাইকে বলার সাহস ওর হয় নি। বৌদি কী করতে কী করে কে জানে! তিখর একটা কথা আঁচ করতে পেরেছে যে চেনিমাই কলাই-এর সঙ্গে ঘর করে সুখী হয় নি। উপায়হীন হয়ে এই সংসারে আছে। অতএব চেনিমাই তিখরের হয়ে কিছু করবে সে আশা বড়ো একটা নেই।

অপেক্ষা করতে তিখর রাজী, তরাকে ওর সঙ্গে বিয়ে না দেয়ার কোনো কারণ নেই। হয়তো একটু আলাপ করার সুযোগ পেলে ওকে ফুসলিয়ে দুজনে পালাতে পারত, কিন্তু সে সুযোগ এখনো পায় নি।

গত চৈত্রে বসিরত এসেছিল। গুলচের চাষবাসের খবরাখবর

নিয়েছিল। না চাইতে গুলচ তাকে দশটা টাকা দিয়েছিল আর নম্রভাবে বলেছিল যে মোষের দামটা সামনের বছর পুরো করে দেবে। সময়মত মোষের টাকাটা দিয়েছিল বলে সে বসিরতের কাছে কৃতজ্ঞ।

সামান্য দু-চারটে খবর-বার্তা নিয়ে বসিরত বিদায় নিয়েছিল। সেবার কপাহী ও তরার খবরও করেছিল। ওরা কেউ-ই বসিরতের সামনে বসে খোলাখুলি কথাবার্তা বলে নি। তরা অবশ্য বসিরতকে চা-জলপান খাইয়ে দিয়েছিল।

গুলচ বসিরতের খবরাখবর নিয়েছিল। বসিরত ধনশিরির মুখের দিকে বাড়িঘর করেছে, ওর কিন্তু কেউ নেই। মহাজনের সঙ্গে থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করে সে যথেষ্ট টাকাকড়ি করেছে। তবে বিয়ে-থা এখনো করে নি। বয়েস যদিও প্রায় পঁয়ত্রিশ।

—"বিয়েটা করে ফেলা উচিত ছিল।"—গুলচ বলেছিল।

শুনে বসিরত একটু হেসেছিল। তার অর্থ গুলচ বোঝে নি, বোঝবার চেষ্টাও করে নি; কিছু লোক আছে যারা বিয়ে-থা করে না।

একদিন চন্দ্র এসে খবর দিল যে গুলচের বাবার যায়-যায় অবস্থা। এবার বাঁচার আশা নেই।— "বড্ড সিরিয়াস হয়েছে, তুই একবার গিয়ে দেখে আয়।"

গুলচ এই বিষয়ে কপাহীর শলা-পরামর্শ নিল। কপাহী জহা চাল, বরা চাল, মাষকলাই ও রাঙাআলু একটা পৌটলায় বেঁধে দিয়ে বলল— "বাপের চাইতে গরবটাই বেশি হল! বেঁচে থাকতে থাকতে না গেলে তারপর বুড়োর কিছু একটা হয়ে গেলে বড়ো ভাই কি আর সম্পত্তির ভাগ দেবে? যাবে না কেন?"

পোঁটলাটা বাঁকে ঝুলিয়ে লজ্জা ও সংকোচ করে গুলচ ডালিম গ্রামে গেল।

ওর বাবার তখন কথা বলার শক্তি ছিল না, তবু ছোটো ছেলে ফিরে এসেছে দেখে বুড়োর মনটা একটু প্রফুল্ল হয়ে উঠল।

বাপ মারা যাওয়ার পর দুই ভাইতে গলা জড়াজড়ি করে হাউ-হাউ করে কাঁদল, মা-ও কাঁদল।

তিনদিনের কাজের পর গ্রামের লোকেরা পরামর্শ দিল: আপাতত বুড়োর সম্পত্তি এজমালি হয়ে থাকুক। ওপারের গ্রামে গিয়ে গুলচের অবস্থা ফিরেছে, এখানকার বাস্তুভিটের ভাগ চাওয়াটা ঠিক হবে না। তা ছাড়া বুড়োর অসুখে বড়ো ভাই অনেক টাকা খরচ করেছে। পরে কখনো বাপের জমি দু ভাইতে ভাগ করে নেবে। গুলচ শান্ত হল। বাবার কোনো রকম সেবা-শুশ্রূষা করতে না পারায় গুলচের মনে অনুশোচনা হয়েছিল। তাই বুড়োর জিয়ারতে (তিনদিনের কাজ) সে পনেরোটা টাকা খরচ বাবদ দিল। ডালিমের লোকেরা বুঝতে পারল এ গুলচ আর সে গুলচ নয়। এখন সে দু-পয়সা ছড়াতে পারে। মুখটা দেখলেই বেশ বোঝা যায়। গাল মুখ কেমন লাল হয়ে ঝুলে পড়েছে।

জিয়ারতের পর গ্রামের কয়েকজন বুড়ো এসে খবরাখবর জানতে চাইল যে, গুলচের বাবার সঞ্চিত ধন কতটা কী আছে? নগদ সাত কুড়ি তেরো টাকা বেরোল। অনেকে আশ্চর্য হল, বুড়ো বেশ টাকা জমিয়েছে। সবাইয়ের নির্দেশমত বুড়ীকে দেয়া হল একশো টাকা। এটা শেষ বয়েসে বুড়ীকে যে দেখবে সে পাবে। বুড়ী কি আর এ বয়সে গয়না গড়াবে। বাকী টাকার এক কুড়ি দিল

গুলচকে, বড়োভাই পেল এককুড়ি। গ্রামের লোকেরা বড়ো বউকে দিল তেরো টাকা— সে বুড়োর অনেক খেদমত করেছে।

বুড়ী বলল— "গ্রামের লোকেদের সামনে আমিও একটা কথা বলতে চাই। কর্তা তো গেল, আমার আর ক'টা দিন? বড়োর জন্য আমিই দেখেশুনে মেয়ে এনেছিলাম, এটার জন্য কিছুই করতে পারলাম না। আজ পর্যন্ত বউটাকেও দেখলাম না। আমারো গয়না পরার দিন গেল। আমার এই মিনে-করা বিরিটা, এই বড়ো-মণি ছড়া আর এই আংটি দুটো আছে। বড়োমণি ছড়াটা কর্তা কিনে দিয়েছিল, বেঁচে থাকতে এটা কাউকে দেব না। আমার দুটো আংটির মধ্যে একটা পাবে বড়ো বউ, একটা পাবে ছোটো ছেলে। আর এই বিরিটা আমি ছোটো বউকে দিলাম, ওর বিয়েতে কিছু দিতে পারি নি।"

গুলচ হাত পেতে নিল। কেউ কিছু আপত্তি করল না। আপত্তি করার কিছু ছিল না। মায়ের নিজস্ব জিনিস— যাকে খুশি দেবে, যাকে খুশি দেবে না।

বিরি, আংটি, টাকা কুড়িটা আর জিয়ারতের ছোলা আর নারকেল খানিকটা নিয়ে গুলচ বাড়ি ফিরে এল। কপাহীরা বুড়োর মারা-যাওয়ার খবরটা পেয়েছিল। সেজন্য চারদিন পরে গুলচ ফিরে আসায় কপাহী রাগ করল না। শ্বশুর মারা যাওয়ায় কপাহী কান্নাকাটি করার কোনো কারণ খুঁজে পায় নি। তবুও তার বিষয়ে এটা সেটা জিজ্ঞেস করে গুলচকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল। এদের সামনে মন খারাপ করাটা ঠিক হবে না ভেবে ও আর কান্নাকাটি করল না। কিন্তু বেঁধে রাখা মোষটাকে ছেড়ে দিয়ে যখন নদীর পারের দিকে গেল তখন একা একা হাউ-হাউ করে

কাঁদতে লাগল— ঠিক যেন বাচ্চা ছেলে। বাবার অভাব গুলচ আজ প্রথম অনুভব করতে পারল।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তরা বুঝতে পারল নদীর পাড়ে বসে গুলচ কেঁদেছে। কিন্তু কিছু বলল না।

রাত্রে সবাই শুয়ে পড়ল। আজকাল গুলচ, কপাহী আর তরা আলাদা আলাদা বিছানায় শোয়। কখনো কোনো অতিথি এলে গুলচ কপাহীর বিছানায় শোয়; তরা একা শোয় আলাদা ঘরে।

তখনো রাত বেশি হয় নি। সারাটা দিনের পরিশ্রমের পর বিছানায় শুলেই কপাহী ঘুমিয়ে পড়ে, আজও কপাহী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হল।

পা টিপে টিপে তরা বিছানা থেকে উঠে এল। লণ্ঠনটা নিবানোই ছিল, অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এসে সে গুলচের বিছানার পাশে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে থেকেই ঘুমন্ত গুলচের গায় হাতটা রাখল। গুলচের ঘুম আসে নি। সে তরার হাতের ওপর নিজের হাতটা রাখল। বুঝতে পাবল এই হাত কপাহীর নয়, তরার।

—"তরা—"

—"চেঁচিয়ো না।"

"কেন এলি! ঘুম আসে নি?" ফিসফিস কবে সে জিজ্ঞেস করল— ফিস ফিস করা কণ্ঠে কান্নার আদ্র‍্তা।

কোনো কথা না বলে তরা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। চোখ ও মুখের ওপর আদর করে হাত বুলাতে বুলাতে তরা বলল, — "কাঁদছ কেন? আজ সারাটা দিন কেঁদেছ, খুব কষ্ট হচ্ছে না?"

একটা অবুঝ, অনাথ শিশুর মতো গুলচ তরার কোলে মাথা রাখল। তরা ওর চুলের মধ্যে বিলি কেটে গা-মাথায় হাত বুলিয়ে

দিল! গুলচের মনে হল এ তো তরা নয়, ওর স্নেহময়ী মা। বুক ঠেলে ওর কান্না বেরিয়ে আসতে চাইল।

অনেকক্ষণ গুলচ একভাবে তরার কোলে মাথা রেখে পড়ে রইল আর তরা ওর গা-মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল।

ওর মুখের কাছে মুখটা নিয়ে তরা ফিসফিস করে বলল— "তোমায় মন খারাপ করে থাকতে দেখলে আমার খুব কষ্ট হয়। আর কান্নাকাটি কোরো না কেমন—"

সামনে ঝুঁকে থাকা তরার গলাটা গুলচ অসহায়ের মতো জড়িয়ে ধরল। ও সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে, কোথাও যেন একটু নিশ্চিত আশ্রয় খুঁজছে।

তরা বলল— "আমি তো আছি, এত চিন্তা করছ কেন?"

তরাকে কাছে টেনে এনে ওর গালটা গুলচ নিজের গালের ওপর চেপে ধরল। তরাও যেন কাছে থাকার পরম আশ্বাস দিয়ে ওর মনের দুঃখ ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

গভীর নিদ্রাতুর রাত। দুটি অসহায় প্রাণী যেন একজন আর-একজনকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে।

অন্য কোঠায় কপাহী তখনো গভীর ঘুমে অচেতন।

বিছানা থেকে নেমে গুলচের গালে নিজের গালটা আদর করে ঘষে দিয়ে তরা বলল— "মন খারাপ করে থাকলে কিন্তু আমিও কাঁদব—"

তারপর চুপ করে নিজের বিছানায় চলে এল।

গুলচ একটা বাচ্চা ছেলে।

গুলচ একটা অবুঝ শিশু।

মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত না করলে ওর কান্না থামবে না—শুয়ে শুয়ে তরা ভাবল।

পরের দিন কপাহীর হাতে বিরিটা দিয়ে গুলচ বলল—"এটা বৌটি তোকে দিয়েছে—"

তক্ষুনি কপাহী বিরিটা গলায় পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখটা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

—"দেখি তরা এদিকে আয়—"

মাথা নিচু করে নীরবে তরা এসে ওর পাশে দাঁড়াল।

—"এই আংটিটা তোর কোন্ আঙুলে লাগে দেখ্ তো। বৌটি আমায় এটা দিয়েছে। পুরুষমানুষের আর সোনার আংটি কেন?"

তরা আংটিটা পড়ল।

"মাসীকে দেখা গে যা—"

আজ গুলচের মনে আনন্দ। কপাহী ও তরা বংশের উত্তরাধিকার সূত্রে একটা করে গয়না পেল। সে বলল, কিছুদিন পরে মাকে নিয়ে আসবে। কপাহী আনন্দ প্রকাশ করল, তরা চুপ করে সরে গেল— কিছু বলল না।

তেইশ

সুযোগ পেয়ে গুলচ যখন এক কুড়ি তেরো টাকায় এঁড়ে বাছুরটা সমেত দুধেল মোষটা কিনে আনল, তখন তাকে জিজ্ঞেস না করেই এতগুলো টাকা দিয়ে মোষটা কেনার জন্য কপাহী গজগজ করে উঠেছিল।

গুলচ বলল— "একটা মোষ কিনব, সে-কথাও কি তোকে জিজ্ঞেস করে করতে হবে? কম বয়েসী এই মোষটা এক কুড়ি তেরো কেন, দুকুড়ি তেরোতেও পাবি না। গৃহস্থের টাকার প্রয়োজন ছিল বলে আদ্ধেক দামে দিল। আমাদের কম করেও দেড় কুড়ি লাভ হয়েছে।"

কপাহী কথাটা বুঝেও বলল— "মোষ-গোরু সব-কিছু আমার কাঁধে ফেলে রেখে এখন ধনশিরির পাড়ে জলকন্যার তপস্যায় থাকলেই হয়েছে। আমি গোরু দেখব, না মোষ দেখব, না সংসার দেখব?"

তরা মন্তব্য করল, "সংসারটা আমিও দেখতে পারব—"

—"হুঁ, তুই থাক্ ঘরের ভেতর আর আমি জংলী মোষটার পেছন পেছন ঘুরি। আর ওদিকে আর-একজন সারাটা দিন মোলোকার বাড়ি তামাক টেনে বসে থাকুক।"

গুলচ শুধু বলল—"বাছুরটাও এঁড়ে।"

তারপর মোষটাকে নিয়ে ওপারে চলে গেল।

খরার ফসল গুলচের ভালোই হয়েছিল। আলু, সর্ষে আর মাষ-কলাই বেচে অনেক টাকা পেয়েছে।

বসিরতের কাছ থেকে মোষ কেনার জন্য টাকাটা গুলচ নিজে নদীর ঘাটে গিয়ে দিয়ে এসেছিল। ওর মনটা হাল্কা লাগল, ধার শোধ না করা পর্যন্ত মনে অস্বস্তি লেগে থাকে। ওকে সাহায্য করার জন্য বসিরতকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলল— "বড়ো উপকার হয়েছে। মোষটা ভালোই আছে। মরে না গেলে আর কয়েকটা বছর লাঙ্গল টানতে পারবে। ভালো আউশ ধানের বীজ থাকলে দিতে পারেন?"

একদিন বসিরত নিজে এসে দুপুরা আউশ ধানের বীজ গুলচের উঠোনে ফেলে দিয়ে গেল।

সেদিন গুলচের নির্দেশমত কপাহী বসিরতকে ভেতরে বসিয়ে চা-জলখাবার খাওয়াল। কথাবার্তা অবশ্য বলে নি। বসিরত মাথা নিচু করে খাবার খেয়ে বেরিয়ে গেল।

এখানে করার মতো কোনো কাজ ছিল না তার।

একদিন নৌকো করে বসিরত চলে গেল, কপাহীর সঙ্গে দেখা করে গেল।

গুলচের এখন অনেক কাজ বেড়েছে। মোষটাকে দুইয়ে দুধ বিক্রি করা এক নতুন কাজ। কপাহী কিন্তু নেপালীদের খাটালে মোষটাকে রেখে আসার কথা বলেছিল, গুলচ রাজী হয় নি। মোষটা বড়ো শান্ত, বাচ্চাটাও সুন্দর। বেঁচে থাকলে দু-তিন বছর বাদে লাঙ্গল টানতে পারবে। নেপালীকে দিলে দুধ দুইয়ে দুইয়ে

বাচ্চাটাকে না খেতে দিয়ে মেরে ফেলবে। আর দুধের কি পুরো দামটা দেবে?

কখনো কখনো তরাও মোষটাকে চরিয়ে আনে। ওকে তরা খুব ভালোবাসে।

এদিক-ওদিক বেড়াতে গেলে কপাহী বিরিটা গলায় দিয়ে যায়। তরা কিন্তু আংটিটা পরে না। দিয়েছে তাই নিয়েছে, পরা না পরা তরার ইচ্ছে— গুলচ সেজন্য কিছু বলে না।

একদিন গুলচ দেখল তরা আংটিটা পরেছে। না দেখার ভান করে সে চলে যেতে চেয়েছিল। তরা ডাকল— "একটু দাঁড়াও—"

ভাঁজ করে আনা এক টুকরো কাপড় গুলচের হাতে দিয়ে ও চাপা সুরে বলল— "এই ক্ষেপে বোনা। আজই শেষ করেছি। এটা দিয়ে ঈদে একটা জামা করিয়ে নিয়ো।"

আনন্দে গুলচের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

—"ঈদের সময়ে আমিও ভাবছিলাম একটা ভালো জামা করাব।" ভাঁজ খুলে সে কাপড়টা দেখল, বেশ মিহি বুনটের মুগা রঙের থান কাপড়।

—"ঈদের জন্য তোর জামা-কাপড় আছে?"

—"আমার আছে, আর চাই না।"

অবশ্য কপাহী আর তরাকে দুটো ছিট কাপড়ের জামা দেয়ার ইচ্ছে গুলচের অনেকদিন থেকে ছিল। এখানে কাপড়ের তেমন ভালো দোকান নেই। মাত্র দুগজ কাপড় কেনার জন্য সে গোলায় যেতে প্রস্তুত নয়। কখনো যায় নি। দিশে পায় না। কেউ হয়তো ঠকাতেও পারে। একবার কিন্তু ও টাউনে যাবেই আর কম করেও এক কুড়ি টাকার জিনিসপত্র কিনে আনবে, অনেক কিছু।

সস্নেহ চোখে গুলচ তরার দিকে তাকাল। তরা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

কাপড়ের টুকরোটা তরার হাতে দিয়ে গুলচ বলল— "এখন তুই রেখে দে গে যা। কাল-পরশুর মধ্যেই দর্জিকে দিয়ে আসব।"

হাল্কা একটা মন নিয়ে বাইরে চলে গেল। তরা ওকে খুব ভালোবাসে। আজ পর্যন্ত ঈদ বা বকরিদে কেউ তাকে এক গাছা সুতো পর্যন্ত দেয় নি।

তরা ওকে খুব ভালোবাসে।

কী যে সব ওলট-পালট হয়ে গেল! নইলে--

ঝাঁ-ঝাঁ করছিল রোদ্দুর। সেঁউতিটা দিয়ে ডোবা একটা সেচে এক খালুই মাগুর আর ল্যাঠা মাছ এনে গুলচ উঠোনে দাঁড়াল। মাছ ধোয়া চালনীটা এনে তরা মাছগুলো ঢেলে দিল।

এমন সময় চারটে ছেলে সঙ্গে নিয়ে চন্দ্র এসে হাজির।

—"মাছ ধরলি নাকি?" চন্দ্র জিজ্ঞেস করল।

গুলচ বলল— "তরা, লোক এসেছে, বসতে দে। চন্দ্র, তোরা একটু বোস, আমি একটা ডুব দিয়ে আসি।"

ছেলেগুলোকে নিয়ে চন্দ্র উঠোনে মোড়ায় বসল।

—"ভালো আছিস তরা— আগের চেয়ে মোটা হয়েছিস।" চন্দ্র তরার দিকে চেয়ে বলল।

তরা মাথা নিচু করল। কখন যে কী বলতে হয় চন্দ্রটা ভেবে দেখে না।

—"তাই তো, এখন বাড়িঘরগুলো দেখতে সুন্দর লাগছে। আরে ফুলের গাছও পুঁতেছিস দেখছি। বাঃ ঘর-বাড়ি-বাগান সব মিলে সুন্দর লাগছে—" চন্দ্র বলল— "গার্ডেন একটা থাকা উচিত—"

বাড়ির সামনে, যেখানে গুলচ ফুল গাছ পুঁতবে ভেবেছিল, ঠিক সেখানটায় তরা দুটো গাঁদা ফুলের চারা লাগিয়েছিল। বড়ো জাতের গাঁদা— কয়েকটা ফুটেছে। পাশেই একটা সূর্যমুখী। লকলক করে বাড়ছে।

তাম্বুল-পানের বাটাটা এনে তরা চন্দ্রদের সামনে রাখল।

ইতিমধ্যে গুলচ পুকুর থেকে স্নান সেরে এল।

—"কোথায় চান করলি?"

—"পুকুরে, কেটেছি না একটা!"

—"ভালো করেছিস, ভালো কাজ করেছিস, নিজের বাড়ির পুকুরের জলের মতো আর কী হতে পারে? রিভারের জলগুলো—"

—'ঘোলাটে' শব্দের ইংরিজি খুঁজে পেল না বলে সে চুপ করে গেল।

অন্য একটা মোড়ায় গুলচ বসল।

চন্দ্র বলল— "একটা কাজে এসেছিলাম—"

"আগে তাম্বুল খেয়ে নে—"

তারপর চন্দ্র ওর আসার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করল: ওপারের গ্রামে কোনো স্কুল নেই। মানুষ তো কম হল না। এক এক করে বেশ কয়েক ঘর লোক এসে একটা পুরো গ্রাম বানিয়ে ফেলেছে। এখন একে আর পাম বলে ভাবলে চলবে না। কিন্তু গাঁয়ের এতগুলো ছেলেমেয়ের জন্য একটা পাঠশালা স্কুল পর্যন্ত নেই— সরকার আমাদের মানুষ বলেই গণ্য করে না। এখন গ্রামের সবাই নিজেরা মিলে একটা স্কুল গড়ে তোলা উচিত। নইলে চিরদিন ছেলেমেয়েরা অশিক্ষিতই থাকবে। ওপারের গ্রামে

ধনশিরির পাড়ে কাঠ, বাঁশ, খড়, বেতের অভাব নেই। জোয়ান-বুড়ো কেজো লোকেরও অভাব নেই। গ্রামের লোকেরা মিলে স্কুল ঘরটা বানিয়ে একদল ছেলেমেয়ে জুটিয়ে একজন মাস্টার জোগাড় করে দিতে পারলে বোর্ডের না নেয়ার কোনো কারণ নেই।—"তা না হলে আই শ্যাল সী। আমি নিজে গিয়ে ডি. আই.-কে ধরে নিয়ে আসব। আমাদের ভিলেজগুলো কি আর চিরদিন এভাবে ইল্লিটারেট হয়ে থাকবে। শহরে-নগরে ছেলেমেয়েদের ঘরের দুয়োরে দুয়োরে স্কুল। এডুকেটেড নেই বলে আমাদের সবাই নেগলেক্ট করে।"

সব শুনে গুলচ যেন একটু ভাবিত হয়ে বলল— "কথাটা ঠিক বলেছিস। কিন্তু এতে আমার কী করতে হবে?"

—"তোর? তোর অনেক কিছু করতে হবে। গ্রামে একটা সভা ডাকব। সেই সভায় গাঁয়ের লোকদের সব কথা বুঝিয়ে বলব। তুই সেখানে সভাপতি হবি।"

—"ওরে বাবা, না, না— সভায় ঢুকতেই আমি ভয় পাই। লেখাপড়া না-জানা মূর্খ মানুষকে সভাপতি করে মজা দেখতে চাস! ও-সব তাম্‌সা করিস না।"

"তাম্‌সা নয়, আমাদের এখানে তুই যা, অন্যেরাও তা-ই। এখন তোর দুটো পয়সা হয়েছে। তুই সভাপতি হয়ে দুটো কথা বললে সবাই মান্যি করবে; মানী অল রেসপেক্ট। টাকার সম্মান সর্বত্র।"

লজ্জায় লাল হয়ে গুলচ বলল— "কিন্তু আমি যে কিছুই জানি না —"

—"অন্যেরা জানেটা কী? তুই পারবি। তা ছাড়া আমি

তো তোর সঙ্গেই থাকব। আই এ্যাম্ উইথ ইউ। তোর সভাপতি হতে হবে। তা ছাড়া স্কুলের সভাপতিও তোকেই করব।"

—"স্কুলের আবার সভাপতি কি?"

—"আছে আছে, পরে বুঝবি। স্কুল করতে হলে ফাণ্ড-ও চাই। পাওয়া যাবে অনেক। তুই যা পারিস দে—"

এমন সময় চন্দ্রর সঙ্গের ছেলেগুলি সমস্বরে বলে উঠল— "সভাপতির কিন্তু পঁচিশ টাকা চাঁদা দিতে হবে।"

—"পঁচিশ টাকা! কোথায় পাব বাবা? ভালো কাজ করতে যাচ্ছ, আমি না-হয় একটা টাকা দেব—"

—"এক টাকা? তা হবে না, আপনি যদি এক টাকা দেন তো অন্যেরা কত দেবে—"

শেষে চন্দ্ররা স্কুলের জন্য গুলচের কাছ থেকে পাঁচটা টাকা আদায় করে বিদায় নিল। ও হাসিমুখে দিল।

ওরা চলে যাবার পর গুলচ কপাহীদেরবলল— "পাঁচটা টাকা এমন কিছু নয়। ভালো কাজের জন্য এসেছে, আমরা না দিলে দেবে কে? চন্দ্রটা আবার কি সভাপতি হওয়ার কথা বলে গেল, তাম্সা করল নাকি কে জানে?"

—"তাম্সা আবার করবে কেন! বলছে যখন, সভাপতি হোয়ো।"

—"সে তো ঠিকই—"

গুলচের কিন্তু সভাপতি হতে হবে ভেবে ভয় হচ্ছিল। কী যে করতে হবে, কী যে বলতে হবে! ওর যে ভয় করছিল সে-কথা কিন্তু কপাহীদের সামনে প্রকাশ করল না, করলে ওরা কি ভাববে? ভাগ্যে যা আছে হবে।

সন্ধেবেলা বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার পর কিন্তু গুলচের মন

আনন্দে উপছে উঠল। আজ তার রোজগার করা সার্থক হল। জীবনে যা কখনো করে নি এমন একটা কাজ ও আজ করল। আজ চাঁদা দিয়েছে স্কুল করার জন্য। পঁচিশ টাকা চেয়েছিল, ওর মনে হল দিলেই ভালো করত— যাক্, দেয়ার দিন পড়ে আছে। স্কুলটা যদি হয়, দরকার হলে না-হয় আরো দেব!

আজ পাঁচটা টাকাও একেবারে কম হয় নি। ওর মনের আনন্দের কথা অন্য কাউকে খুলে বলতে ইচ্ছে করছে। টাকা-পয়সা আর কিসের জন্য?

চব্বিশ

কলাই-এর অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। তেমন কোনো চিকিৎসাও হয় নি। জোয়ান ছেলে, সুস্থ হয়ে বেঁচে ওঠার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধির সঙ্গে একজোট হয়ে নিষ্ঠুর দারিদ্র্য যখন কাউকে নিঃশেষ করার জন্য ষড়যন্ত্র করে, তখন দারিদ্র্যের জয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে!

কলাই সবসময় প্রায় বিছানায় শুয়ে থাকে। আদার রস, তুলসীপাতা আর মধু দিয়ে ওষুধ খায়। কবিরাজের বড়ি খায়, কিন্তু সারে না। রোগটা একটু চাপা পড়ে থাকে এই যা। মোলোকা আর তিখর ওর আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছে।

কলাই-এর কথা চিন্তা করার সময় ওরা বড়ো একটা পায় না। দিনরাত ভাত-কাপড়ের চিন্তা করতেই সময় বয়ে যায়।

কলাই-এর প্রতি নিজের একটা দায়িত্ববোধ আছে বলে চেনিমাই মনে করে, আবার বিরক্তও হয়। একটি স্বাস্থ্যবতী তরুণীর পক্ষে চিররুগ্ণ একটা লোকের সেবা-শুশ্রূষায় আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া ও একরকম নিশ্চিত যে কলাই-এর এ রোগ সারবার নয়। ছেলেবেলার পুরানো রোগ এরকম চিকিৎসায় সারে না। ওর রাগ হয় সফিয়ত আর বাপের ওপর, মোলোকা ও তিখরের ওপর। কলাই-এর ওপর ওর রাগ নেই, আছে করুণা, একটু যেন দরদও। ও বেচারী করবে কি? সবাই মিলে বিয়ে দিল আর ও বিয়ে করল। গ্রামে কানা, খোঁড়া, কালা, বোবা সবাই তো বিয়ে করে। কলাই তো শুধু অসুস্থ।

তবু কখনো কখনো চেনিমাইর অপমানিত যৌবন বিদ্রোহ করে ওঠে। এক অসুস্থ রুগীর জন্য কষ্ট করতে মন চায় না। মাঝে মাঝে ভাবে কলাইকে ছেড়ে অন্য কারো সঙ্গে চলে যাবে—পালিয়ে নয়, সকলের চোখের সামনে। কেউ প্রশ্ন করলে বলবে: কলাই-এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। তোদের কারো দরদ উথলে উঠলে নিজেদের মেয়েদের কলাই-এর সঙ্গে বিয়ে দে গে যা; আমি আর থাকছি না।

কিন্তু অসহায় কাতর চোখে, দুর্বল ও বিবশ দৃষ্টি নিয়ে কলাই যখন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে তখন, কখনো-বা চেনিমাইর বুকটা স্নেহ-মায়া-মমতায় ভরে ওঠে। ও যেন কথা না-ফোটা একটা ছোট্ট শিশু, যেন চেনিমাইর বুকে আশ্রয় খুঁজে বেঁচে থাকতে চাইছে, চেনিমাই তাকে ছেড়ে চলে গেলে ও যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে

কেঁদেই মরে যাবে। তখন চেনিমাই আদর করে ওর হাত-পা বুলিয়ে দেয়, সর্ষের তেল গরম করে বুকে-পিঠে মালিশ করে আর মনোযোগ দিয়ে কচুর ঝাল রান্না করে খাওয়ায়। ওর সেবাযত্নে কলাই অনেক শান্তি পায়, শুকনো ফ্যাকাশে ঠোঁট দুটোতে কৃতজ্ঞতার বোবা প্রকাশ গুমরে ওঠে। ও চেনির হাতটা ধরে দুঃখ করে বলে—"আমার জন্য তোর খুব কষ্ট করতে হচ্ছে না চেনি! এত কষ্ট করছিস, কিন্তু আমি কি কখনো সেরে উঠব?" ওর প্রতি চেনির দরদ উপছে ওঠে। কষ্ট করতে হচ্ছে মিথ্যে নয়, কিন্তু তা বলে মানুষের রোগ কি আর সারে না? ওর মনে হয় টাকা-পয়সা যদি থাকত তা হলে কোনো বড়ো শহরের হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করালে হয়তো সুস্থ হতে পারত। ধারে কাছে কোথাও হাসপাতাল থাকলে কলাই হয়তো সেরে যেত, কিন্তু এটা যে একটা জঙ্গল, একটা অজ পাড়া-গাঁ। এখানে বাঘ, হাতী, মানুষ, রোগ সব একসঙ্গে বাস করে। একবার অসুখ হলে আর বাঁচার আশা নেই। তা না হলে কলাই-এর নিরাশার কোনো কারণ ছিল না।

রুগ্ণ কলাই-এর পাশে নিরুদ্‌বেগে ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করে চেনি নিজেকে প্রবোধ দেয়—কলাই যদি মরে যায় বা আমি যদি কোথাও চলে যাই সেটা আলাদা কথা, কিন্তু যতদিন আমি ওর সঙ্গে আছি ততদিন ও-ই আমার আপন মানুষ, আমি কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করব না। সম্পর্ক ছিন্ন হলে আলাদা কথা।

কিন্তু মাঠে বা অন্য কোথাও কাজের সময় যখন কলাই সামনে থাকে না— এই ভাবনা চেনির অর্থহীন মনে হয়। কলাই-এর সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক? আমি অন্য কাউকে দরদ দেখালে তাতে

দোষ কি ? এই ভাবে একা বুড়িয়ে যাবার অর্থ আছে ? তবু ও মনটাকে শক্ত করে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, স্বামী বেঁচে থাকতে পরপুরুষের দিকে নজর দেয়া অন্যায়, স্বামী অসুস্থ হলেও। বদ্‌নামে ওর ভয় নেই, যে বিয়েটা হয়েছে তার ও অবমাননা করতে চায় না। ততটা ও খারাপ নয়— হতে পারে না।

প্রয়োজন হলে ও গুলচদের বাড়ি যায়। এটা-ওটা চেয়ে নিয়ে আসে, কপাহী আর তরাও বাড়িতে থাকলে দেব না বলে না। সময় থাকলে চেনি-ও এদের বাড়িতে ঢেঁকিতে ছুটো পাড় দিয়ে যায়, ববিনে সুতো পরায়, কখনো কখনো উঠোনে শুকোতে দেয়া ধানগুলো পা দিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেয়, আবার কোনোদিন মাছ বেশি দেখতে পেলে ছুটো বেছে দিয়ে যায়— এ-সব কাজ করার কথা ওকে বলতে হয় না।

গুলচের সঙ্গেও ও কথাবার্তা বলে। গুলচ কারো সঙ্গে বেশি কথা বলে না, চেনিকেও ভালো-মন্দ ছু-চারটে ছাড়া অন্য কিছু জিজ্ঞেস করে না। অবশ্য তরাকে দিয়ে সে চালটুকু, মাছটুকু, শবজীটুকু আর কখনো কখনো ছু-চার আনা পয়সা দেয়ায়। হাত পেতে নিতে ওর ঠেকে না। গরিব মানুষের অহংকার করা সাজে না।

সময় পেলে গুলচ মাঝে মাঝে চেনিমাইদের বাড়ি যায়। চেনির, কলাই-এর আর ওদের সংসারের খোঁজ-খবর নিয়ে তাম্বুল খেয়ে চলে আসে। গুলচ ওদের বাড়ি গেলে চেনি সসম্মানে আদর-যত্ন করে, তাম্বুলের বাটাটা সামনে রেখে ছুটো সুখ-ছুঃখের কথা বলে। গুলচ এখন গ্রামের একজন হোমরাচোমরা লোক— গোলায় ধান, গোয়ালে গোরু-মোষ, বাগানে পান-সুপারীর গাছ। দরকার হলে

ট্যাঁক থেকে এক কুড়ির মতো টাকা তৎক্ষণাৎ বের করে দিতে পারে। এহেন গুলচ মোলোকার বাড়িতে পদার্পণ করাটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মোলোকারাও খুশি হয়।

কখনো কখনো কপাহীদের লুকিয়ে গুলচ বাড়ি থেকে একটু চা পাতা চিনি নিয়ে যায়। চেনির হাতে দিয়ে বলে— "একটু গরম জল কর দেখি— তেষ্টা পেয়েছে।"

মাঝে মাঝে নেপালীদের বাথান থেকে এক পো আধ পো ঘি বাঁশের চুঙায় করে এনে নিজেদের বাড়িতে না ঢুকে সোজা গিয়ে চেনিমাইকে দিয়ে আসে। কলাই হয়তো একটু খাবে। কখনো কখনো সিকিটা-আধুলিটা চেনির হাতে তুলে দেয়। দেবার সময় বলে— "এবার পাটে আল্লা কিছু লাভ দিয়েছে। নে এই চুয়ানীটা রাখ— দোয়া করিস—"

গুলচের প্রতি চেনির দরদ দয়।

একদিন রাত্রে চেনি গুলচকে উঠোনের একপ্রান্তে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বলল— "চন্দ্র না কে যেন ঐ যে লোকটা তোর কাছে আসে, ও কি একটু সুবিধে করে দিতে পারবে?"

—"কিসের?"

—"এই এর চিকিৎসার। এখানে থাকলে কি হবে, এখানে না আছে ওষুধ। না পথ্য। পাই-পয়সা নেই। কী দিয়ে চিকিৎসা করাব? গোলাঘাটের ওদিকে সরকারী হাসপাতালে যদি রাখা যেত তা হলে হয়তো সুস্থ হয়ে উঠত।"

গুলচ চুপ করে রইল।

ও-সব কথা ও জানে না, চন্দ্র জানে। ও হামেশাই শহরে গঞ্জে যায়।

—"চন্দ্র এলে একটু জিজ্ঞেস করে দেখিস—"

—"কিন্তু সেখানে রেখে এলে ওর দেখাশোনা করবে কে?"

—"ওখানকার ডাক্তারটাক্তাররাই দেখবে। খরচও নাকি লাগে না, আর যদি লাগে তো হাতে কানে যা আছে বেচে দেব। তোরাও দু-চার টাকা দিস—"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে গুলচ বলল— "তাই তো, চন্দ্র কখনো কখনো গ্রামেই একটা হাসপাতাল করার কথা বলত; আমি ভাবতাম এ বুঝি ওর পাগলামি। এখানে একটা হাসপাতাল থাকলে গ্রামের লোকের আর দুর্দশা ভোগ করতে হত না।"

গুলচ মনে মনে ঠিক করল : চন্দ্র যদি স্কুল করার মতো একটা হাসপাতাল করতে চায় তা হলে আমি এক কাঠা জমি দেব— দু-কুড়ি টাকাও দেব। গ্রামে একটা স্কুল আর একটা হাসপাতাল না থাকলে চলে না।

গুলচ চেনিমাইকে আশ্বাস দিল— "তুই চিন্তা করিস না, চেনি। চন্দ্র আসুক, যদি সেরকম সুবিধে থাকে তো চিকিৎসা করাতে হবে। টাকাপয়সা যা দরকার আমি দেব, তুই চিন্তা করিস না। সেদিন যেমন করে বললি, আমি তো অন্য কিছু ভেবে বসেছিলাম।"

চেনি বলল— "কখনো কখনো ভীষণ রাগ হয়, আমি কি রুগীর যত্ন করার জন্যই পৃথিবীতে এলাম। এদিকে পড়লাম এমন ঘরে যে ভাতমুঠোও লোকের বাড়ি থেকে চেয়েচিন্তে খেতে হয়। মরতে ইচ্ছে করবে কেন বল। তুই কাছে আছিস বলে সাহস করে আছি— তা না হলে কখন কী করে বসতাম নিজেই জানি না।"

চেনিমাইকে অযথা সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল না গুলচ। নিজের মানুষটার প্রতি দরদ থাকাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া সে অসুস্থ।

গুলচ চন্দ্রর অপেক্ষা করে রইল।

অনেকদিন পর পর সে আসে। কোথায় যে টইটই করে ঘুরে বেড়ায়। আজকাল সে আগের চেয়ে ভালো জামা-কাপড় পরে। সেবারে ফুট্-ফুট্ ফুলকাটা হাওয়াই সার্ট পরে এসেছিল। হাতে ছিল গোল একটা হাতঘড়িও। অল্প অল্প গোঁফ রেখেছে। ঘন নীল রঙের প্যান্ট, তলাটা আগের মতোই গুটিয়ে রাখা। কিন্তু হাঁটু অবধি চোর-কাঁটায় ভরা ছিল। মুখ-টুখ গুলোই যা রুক্ষ, খাওয়া-থাকার কোনো স্থিরতা নেই, চব্বিশটা ঘণ্টা তো ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কলাই-এর অসুখ হয়তো সেরে যাবে— তবে খরচ করতে হবে। সে সুস্থ হয়ে উঠলে চেনি সুখী হবে। ওদের সংসারটা আবার গড়ে উঠবে; তবে সরকারী খরচে হলেই ভালো। তা না হলে টাকা কোথায় পাবে চেনিমাই?

পরে যা হয় দেখা যাবে, হাসপাতালে ভর্তি করানোটাই আসল কাজ।

এবিষয়ে কপাহীর সঙ্গে পরামর্শ করার কথা সে দু-একবার ভেবেছিল, কিন্তু পরে ভাবল না করাই ঠিক। ও আবার কী ভেবে বসবে কে জানে? মেয়েলোকের মন বোঝা ভার। কপাহী অবশ্য তেমন নয়, চেনিমাইর স্বামী সুস্থ হলে কপাহীর দুঃখিত হওয়ার কারণ নেই। তা বলে সব কথা মেয়েদের না বলাই ভালো।

পঁচিশ

বৈশাখী বিহুর (চৈত্র সংক্রান্তি) আগে আগে গুলচ ডালিম গ্রামে গেল। আজকাল ও ডালিমে যাওয়ার তেমন সময় পায় না, তা ছাড়া সেখানে যাওয়ার বড়ো একটা প্রয়োজনও হয় না। ধীরে ধীরে ও এপারের গাঁয়ের বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছে।

দাদা, মা ভালোই আছে। গ্রামের অন্যেরাও ভালো। নিজেদের গ্রামে বাইরের লোকের মতো আসতে ওর মন্দ লাগে না। সবাই আদর-যত্ন করে খবরাখবর নিল: কপাহী কেমন আছে? সর্ষে এবছর কতটা পেল?

নিজের সুখ-সমৃদ্ধির কথা বলতে গুলচের ভালোই লাগল। সে ডালিম ছেড়েছে আজ তিন বছর। ওর অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ডালিম গ্রাম একই রয়েছে। দু-চারটে গাছের চারা যা-একটু বড়ো হয়েছে। দু-একটা কিশোর তরুণ, দু-একটি মেয়ে সদ্য তরুণী হয়েছে।

মা ও দাদার সঙ্গে সে একটা বিষয়ে পরামর্শ করল: ডালিম গ্রামের পৈত্রিক জমিটার কি করলে ভালো হবে? বিক্রি করার ওর তেমন ইচ্ছে নেই। অবশ্য ভালো দাম পেলে বেচতে আপত্তি নেই। সম্ভব হলে ওর দাদাই নিক, বাড়ির ব্যাপার। এখন ওর

দাদা আধিতে চাষ করছে, কিন্তু এ ক'বছর গুলচ ধান নেয় নি। মা এখানে আছে, দাদার সংসারটাও বড়ো। আল্লা তাকে দুমুঠো দিয়েছে, এখানকার ধান না নিলেও চলে।

তা বলে পৈত্রিক সম্পত্তির ভাগ হাতছাড়া করতে সে রাজী নয়— তা এক কাঠাই হোক। বাবার কপালের ঘাম যে জমিতে মিশে আছে তার সঙ্গে একটা আত্মীয়তা গড়ে উঠেছে। বাবা নেই— বাবার সম্পত্তি তো আছে— ছাড়ব কেন?

তবে বিক্রি করতে চাইবার দুটো কারণ। ওপারের গ্রামে এক টুকরো ভালো জমি আছে। দাম কম নয়, তবে জমিটা ভালো, বন্যার ভয় নেই, বাঘ-ভালুকের উপদ্রব নেই। ওদিকটায় দিন দিন গ্রামের শ্রীবৃদ্ধিও হচ্ছে। এখন কিনে রাখতে পারলে ভবিষ্যতে লাভ। দ্বিতীয় কারণ, অতটা দাম দিয়ে জমি কেনার লোক গ্রামে কেউ নেই। আটশো টাকা চেয়েছে, জমি পাঁচ পুরা মতো হবে, হাতে ওর ওর শ' পাঁচেক টাকা। আরো তিনশো পেলে হয়ে যায়। জমির টাকায় জমি কেনা— মন্দ না। তা ছাড়া ওপারের গ্রামে 'ধনীর বাড়ি' বলতে গুলচকেই বোঝায়। আটশোতে জমিটা নিতে না পারলে লজ্জার কথা হবে।

গুলচ একবার বসিরতের কথা ভেবেছিল। তবে, বসিরত লোক ভালো হলেও গুলচ ধারে টাকা নিতে রাজী নয়। মোষটা নিয়েছিল যেচে দেয়ার জন্য। তা ছাড়া তখনকার কথা আলাদা।

মা অবশ্য ডালিমের জমিটা বিক্রি করতে বারণ করেছিল: অন্য কোনো উপায়ে টাকা জোগাড় করে জমিটা নে গে যা। ছেড়ে দিস না। তা বলে এখানকার জমি বেচাটা ঠিক হবে না। পিতৃ-পুরুষের সম্পত্তি বিক্রি করলে লক্ষ্মী চলে যায়।

দাদা অবশ্য বলল, "বিক্রি যদি একান্তই করতে হয় তবে অন্য কাউকে দিস না, আমিই ধার-কর্জ করে কিনব। যেমন করে পারি এখন কিছুটা টাকা দিয়ে দিই। কিছুটা পাট হয়েছে, গুড়-ও পেয়েছি কয়েক কলসী— সেগুলো বেচে টাকা দেব। দরকার হলে তুই আবার কিনে নিতে পারবি।"

গুলচ বলল— "বোশেখ এসে গেল, এখন শ দুয়েক টাকা বায়না দিই। বাকি টাকা আশ্বিন-কার্তিকে দিলেও হয়তো রাজী হবে। তুই এই জমিটা নিলে শ্রাবণ-ভাদ্রের মধ্যেই আমায় টাকাটা দিয়ে দিস।"

তবে দুকূল রক্ষা করে মায়ের পরামর্শ-মতো গুলচ দু টুকরো রূপিত জমি (শালি ধানের জমি) বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিল। বাগানটা আর কয়েক টুকরো রূপিত জমি আপাতত বিক্রি না করাই ঠিক করল।

দাদা আশ্বাস দিল যে শ্রাবণের শেষের দিকে বসিরতের আসার কথা। সে পাট কেনে, তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে পুরো দামটা দিয়ে দেবে।

গুলচ রাজী হল।

মায়ের ইচ্ছে ছিল গুলচের সঙ্গে গিয়ে ওর ঘর-সংসার একবার দেখে আসে। গুলচ কিন্তু মাকে নিয়ে যাওয়ার কথা উচ্চারণই করল না। একবার নিতে চেয়েছিল— যায় নি। এখন যদি যেতে চায় তো নিজেই যাবে, সে সাধবে না।

কিন্তু মুখে ফুটে সে কিছু না বলায় মা-ও মনের কথা খুলে বলল না। নিজে থেকে যদি না বলে তবে আমার কি আর না গেলে চলবে না!

গুলচ সফিয়তের বাড়িও গেল।

অন্যান্য কথাবার্তার ফাঁকে সফিয়ত চেনিমাইর খবর দিয়ে বলল, —"দেখেশুনে চেনিকে বিয়ে দেয়া উচিত ছিল। ওটা একটা শ্বাসের রোগী, পরিবারটাও হতদরিদ্র, এবেলা খেয়ে ওবেলা উপবাস করে।

"বাড়িতেই বদনাম বেরনো মেয়েকে আর কোন্ রাজা-বাদশা বিয়ে করবে ?" বলে সফিয়ত কথার ইতি টানল। "তারপর, তোর ছেলেমেয়ে কি ?"

গুলচ মাথা হেঁট করল। সফিয়ত বুঝল কোনো সন্তান নেই। আধবয়েসী কপাহীকে নিয়ে ঘর করছে, কোথায় আর সন্তান হবে!

—"চিন্তা করিস না, ভাগ্যে থাকলে হবে, তা না হলে অন্য একটিকে আনিস। তোর হাতে এখন দুপয়সা হয়েছে, কতলোকে চেংড়ি মেয়ে যেচে দেবে—"

কিছুক্ষণ বাদে বুড়ো জিজ্ঞেস করল : "তরাও তো তোদের সঙ্গে থাকে। ওর কোনো সম্বন্ধ আসে নি ?"

ঢোঁক গিলে কোনোরকম করে গুলচ বলল— "এখন পর্যন্ত তো আসে নি।"

—"আমাদের হাবাটার জন্য আনতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বজ্জাত মাগী রাতেই পালিয়ে গিয়ে তোদের বাড়ি পৌঁছল। দেখি কোন্ রাজপুত্তুর ওকে নেয়। ভালো করে নজর রাখিস। অল্পবুদ্ধি মেয়েমানুষ, কোন্দিন টাকা-পয়সা, জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দেবে।"

গুলচ মাথা হেঁট করে চুপচাপ বসে রইল, তরাকে অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে দেয়ার কথা সে কখনো ভাবে নি। সফিয়তের কথা শুনে মনে হল ওর বুকে বুঝি কেউ শেল হানল। মুখটা ওর শুকিয়ে গেল। বলবার মতো কোনো কথা খুঁজে পেল না।

মাথা নিচু করে চুপচাপ থাকতে দেখে সফিয়ত একটু নরম সুরে বলল—"যদি কোনো সম্বন্ধ না এসে থাকে তবে এখনো সময় আছে, আমাদের হাবাটাকেই দে। মায়ের মত ছিল। মেয়েটাই সেবার এল না। এখন তুইই মেয়ের অভিভাবক, তোর কথাই শেষ কথা। তুই রাজী হলে সে কি আর না করতে পারবে!"

গুলচের অসহ্য মনে হল। একটু সময় নীরব হয়ে থেকে সে ঘপ্ করে উঠে দাঁড়াল।—"এবার আমি যাই দদাই, অনেক দেরি হয়ে গেল। আলো থাকতে থাকতে নদী পার হতে পারলে হয়। বোশেখের বৃষ্টিতে এবার ধনশিরিতে বড়ো বান এসেছে।"

—"আচ্ছা যা, তবে কথাটা মনে রাখিস। আমরা কি আর নতুন কুটুম? আমরা আগের থেকেই তোদের নিজের লোক। তরাকে আমাদের ঘরে দিলে এই সংসারটাও তোদেরই বলে মনে করতে পারবি।"

গুলচের মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আসছিল। কোনো কথা না বলে সে বেরিয়ে এল। আর একমুহূর্ত ডালিমগ্রামে না থেকে সে বাড়ি রওনা হল। চন্দ্রর খোঁজে একবার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ওর আর সেখানে থাকার প্রবৃত্তি হল না। পিতৃপুরুষের জমি-সম্পত্তি বিক্রি করতে নেই— লক্ষ্মী ছেড়ে চলে যায়। তোর ছেলেমেয়ে কজন? হবে, হবে— না হলে অন্য একটিকে আনিস। অন্য একটিকে আনব? চেংড়ি মেয়ে যেচে দেবে।...চেংড়ি মেয়ে!! আর একটি।... তরাকে আমাদের হাবাটাকে দে— তরাকে হাবাটার জন্য! কপাহী তরাকে হাবাটার সঙ্গে বিয়ে দিতে চেয়েছিল? আটশো টাকায় পাঁচ পূরা রূপিত জমি। পাঁচ পূরা।

ছেলে মেয়ে কি ? ছেলে মেয়ে! না হলে আর একটিকে আনিস। তরাকে দে আমাদের হাবাটাকে···

গুলচের মনে হল ওর মাথাটা ঘুরছে। কথাগুলো ও যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারে নি। সব এলোমেলো হয়ে গেছে। সারাটা পথ ও এই আদি-অন্তহীন কথাগুলো ভেবে ভেবে আসছিল।

ধনশিরির জল খুব বেড়েছে, অনেক বছর এমন ঢল আসে নি, শ্রাবণ-ভাদ্রে ধনশিরি কী মূর্তি ধারণ করবে বলা যায় না। ছোটো-খাটো ঢল একটা এক্ষুনি এলে মন্দ ছিল না, তা হলে খেনো জমিতে কিছু পলি পড়ত। তা না হয়ে যদি ভর চাষের মাঝখানে এসে যায়! যদি আসে তাকে বন্ধ করার তো কোনো উপায় নেই। ধনশিরিকে বাধা দেবে কে ?

আমাদের হাবাটাকেই দে। এখন তোর কথাই কথা, তুই তো অভিভাবক।

হবে, হবে ছেলে পেলে, না হলে— অন্য···একটিকে আনিস।

গুলচ ঠিক করল সে ডালিমগ্রামে আর কখনো পা দেবে না। এক দিনেই ওকে অনেক কথা শুনতে হল। মনটাকে ওলট-পালট করে দিল, বুকের ভেতর ছটফটানি নিয়ে এল। যে কথা সে কখনো ভাবে নি, সে-সবই আজ ওকে শুনতে হল। না। না। ডালিমগ্রামের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক নেই। সেখানে ও কষ্টের মধ্যে দিন কাটিয়েছিল ; আবার ফিরে গেলে কষ্ট বাড়বে। আজ মিছেমিছি ডালিমে এসেছিল বলে ওর মনটাই তেতো হয়ে গেল। ডালিমের জমি-জমা সে সব বেচে দেবে। ডালিমের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এখন ও এপারের গ্রামের বাসিন্দা ; ধনশিরির পশ্চিম পাড়ে থাকলে ওর মঙ্গল হবে না। ধনশিরির পুব পাড়

তাকে নিশ্চিত আশ্রয় দিয়েছে, তাকে মানুষ করেছে। দুটো পয়সার মুখ দেখতে পেয়েছে সে।

তোকেই স্কুলের সভাপতি হতে হবে। স্কুলের জন্য পঁচিশ টাকা চাঁদা দিতে হবে—

চাঁদা দিতে হবে!

গুলচ চাঁদা দেয়, নতুন স্কুল হয়।

ডালিমগ্রামে ওর জন্য কিছু নেই।

বাড়ি পৌঁছেও গুলচের বিমর্ষ ভাব গেল না।

"সবাই ভালো আছে তো—?" কপাহী জিজ্ঞেস করল।

—"হুঁ—"

—"বৌটি ভালো আছে?"

—"হুঁ—"

—"সফিয়ত বুড়োর বাড়িতে?"

—"কেউ মরে নি, চুপ করে থাক্।"

ছাব্বিশ

সে-রাতে গুলচের ভালো ঘুম হয় নি। ঐ গরমে সারাটা দিন রোদে ঘুরেছে। চা-ও খেয়েছে কয়েক বাড়ি। ঘুমাতে চেষ্টা করল, কিন্তু নানা চিন্তা এসে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাল। ঘুম আর এল না।

মুর্গীর ডাক শুনেই ও বিছানা থেকে উঠল। পুবের আকাশে তখন ঘোলাটে ফর্সার ক্ষীণ আভা। ঘরের ভেতরে সামান্য আলো। শুকতারাটা তখনো নিস্তেজ হয়ে পড়ে নি। আলোটুকুতে সামান্য লালচে রঙ ধরেছিল মাত্র। পশ্চিম আকাশটা তখনো ধোঁয়াটে অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

ও দরজা খুলে নিঃশব্দে বাইরে এল। নদীর পাড়ের দিক থেকে ঠাণ্ডা জলো হাওয়া বইছে; শরীর যেন জুড়িয়ে যায়।

উঠোনটা সামান্য ভিজে ভিজে। ধুলো-ভরা উঠোনটাতে চৈত্র-শেষের শেষরাতের হাল্কা শিশির। উঠোনে পা দিতেই গুলচের শরীরটা জুড়িয়ে গেল। চাষের মরসুমে এমন সময়ে লাঙল বাইতে ওঠে, কিন্তু তখন দাঁড়ানোর মোটেও সময় থাকে না। লাঙল, গোরু নিয়ে মাঠের দিকে হুড়মুড় করে দৌড়তে হয়। এখন তাকে আর মাঠে যেতে হয় না। আকাশ ও পৃথিবীর দিকে তাকাবার একটু সময় পেয়েছে।

তখনো কেউ ঘুম থেকে ওঠে নি। একবার ডাক দিয়ে মুর্গীগুলো আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। সূর্যের আলো নেই, তারার আলোও নেই। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে ধূসর নীলরঙা আকাশের এক নিজস্ব আলো— সাদা-নীল ধোঁয়াটে-হলুদ। এটা আকাশের নিজস্ব রঙ, মাটির নিজস্ব রঙ, পৃথিবীর আদিম রঙ। মনের বিমল আনন্দে বিস্মিত হয়ে ও চারদিকে তাকিয়ে দেখল। পৃথিবীটা যেন ছোটো হয়ে ওর কাছে ধরা দিতে চাইছে। মনটা এখন খুব হাল্কা লাগছে। অনির্বচনীয় একটা আনন্দে ওর মনটা ভরে উঠল। ইচ্ছে হল এই আনন্দের কথা কাউকে বুঝিয়ে বলে। চারদিকে তাকাল— কেউ নেই।

উঠোনের একধারে মোষগুলো বাঁধা— ওরাও ঘুমিয়ে। একটা ঘুমন্ত মোষের গায়ে অকারণে হাত বুলাল। মোষটা চোখ মেলে একবার গুলচের দিকে চেয়ে আবার চোখ বুজে শুয়ে পড়ল। গোয়াল ঘরে ঢুকে দেখল গোরু-গাইগুলো পিঠে মাথাটা ফেলে ঘুমোচ্ছে। লাল দামড়াটার মাথায় চাটি মেরে ও সরে গেল।

আবার চারদিকে তাকাল, পুবের আকাশ ক্রমে পরিষ্কার হয়ে আসছে। শুকতারাটা আরো নিস্তেজ। এক ঝলক হাওয়া যেন আলোগুলোকে কোন্‌খান থেকে এনে চারদিকে ছিটিয়ে দিয়েছে।

গুলচের চোখের সামনে সূর্যমুখী গাছটা। একটু কাছে এসে ও একটা ডেলা-বাঁধা কুঁড়ির দিকে চেয়ে রইল। সূর্যমুখীর এ গাছটা একসময় তরা পুঁতেছিল। এখন মাথা-সমান উঁচু। হঠাৎ চেয়ে থাকতে থাকতে দেখল চোখের সামনেই সূর্যমুখীর ডেলাটা ফট্‌ করে খুলে গেছে। ডেলাটা একটা ফুল হয়ে গেল। ও কখনো ফুলফোটা দেখে নি; দেখেছিল ফোটা ফুল। ফুল এ ভাবেই ফোটে—ও নিজেকে বলল। চোখের সামনে ফুল ফুটতে দেখে এক নির্মল আনন্দ অনুভব করেছিল। ও ভাবল তরাকে ডেকে এনে ফুলটা ফুটেছে দেখালে খুব খুশি হবে। আরো কিছুক্ষণ ফুলটার দিকে চেয়ে থেকে ও দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াল।

আবার আকাশের দিকে তাকাল। ক্রমে পুব আকাশের বুকের সাদা মেঘগুলোতে সূর্যের সিঁদুরে রঙের আভা লেগেছে। শুভ্র, শান্ত আলোতে পৃথিবী ছেয়ে গেছে।

আকাশটা কী সুন্দর দেখাচ্ছে!

পৃথিবীটা কী সুন্দর দেখাচ্ছে!

তরাকে গিয়ে জাগাই—

আনন্দে চপল হয়েই ও ভেতরে এসে তরার শোবার ঘরে চলে গিয়েছিল। মাঝের কোঠায় কপাহী তখন গভীর ঘুমে। ওর বিছানার পাশ দিয়েই ও তরার কোঠায় গেল, কিন্তু ওর চেতনা নেই। নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। ভোররাতের মিষ্টি ঘুম।

হঠাৎ তরার বিছানার পাশে এসে ও থমকে দাঁড়াল।

তখন নিচু বেড়াটার ওপর দিয়ে আর ছোটো জানালাটার মধ্য দিয়ে ভোরের সিঁদুরে আলো ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। তরার বিছানায়, তরার শরীরে সেই শান্ত সুমধুর আলো। গুলচ স্তব্ধ হয়ে তরার দিকে তাকাল।

তরা তখন ঘুমচ্ছে। ও চিত হয়ে শুয়ে আছে। হয়তো গরমের জন্য রাতে জামা খুলে শুয়েছিল। ওর সাদা ধপধপে দেহটা উন্মুক্ত। হাতির দাঁতের মতো সাদা নিটোল বুক জোড়া নিশ্বাসের তালে তালে ওঠা-নামা করছে। ওর গোল-গোল বাহু দুটো বিছানার ওপর আলতো ভাবে রাখা, একটা হাত বিছানা থেকে ঝুলছে।

তরার পরনের কাপড়টা হাঁটু থেকে অনেকটা ওপর পর্যন্ত উঠে আসায় সাদা মসৃণ নিটোল উরু দুটো অনাবৃত।

গুলচ স্তম্ভিত হল!

বুকটা ওর দুরু দুরু করে উঠল। এত রূপ, এত উন্মুক্ত যৌবন, শরীরের এত অকুণ্ঠ বিকাশ ও আগে কখনো দেখে নি। তরার দুধের মতো সাদা শরীরটার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে হাজার স্বপ্নের মদিরা, হাজার কামনার আহ্বান।

বাইরের পৃথিবীর আলো ক্রমে বেড়ে এসে তরার চোখের পাতা আলতো করে ছুঁয়েছে। তরার লাল ঠোঁটে আধো আধো মিষ্টি

হাসির ছোঁয়া। দুটি পদ্মকলির আকাশ-মুখী বন্দনায় হাজার রাতের চেতনা হারানোর উন্মাদনা!

গুলচ তরার আরো একটু কাছে এসে একবার সারাটা শরীরের দিকে তাকাল। তারপর বিছানা থেকে ঝুলে পড়া হাতটা আলতো করে তরার বুকের ওপর রাখতে চাইল।

ওর ঘুম ভেঙে গেল। ও অলসভাবে চোখ মেলে তাকাল।

গুলচ ভয় পেয়ে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কপাহীর নাক ডাকার শব্দ তাকে কিছুটা আশ্বস্ত করল।

হাঁটুর নিচ পর্যন্ত মেখেলাটা টেনে নিয়ে তরা সহজভাবে বিছানায় বসল। ওর চোখে মুখে যেন একটা লজ্জা-কোমল ঢেউ দোলা দিয়ে গেল।

অবুঝ দুটো চোখ মেলে গুলচের মুখের দিকে শান্ত ভাবে চেয়ে থেকে বালিশের তলা থেকে জামাটা টেনে এনে সন্তর্পণে গায়ে দিল।

হতবাক্ হয়ে গুলচ দাঁড়িয়ে রইল।

চোখের ইশারায় তরা জিজ্ঞেস করল— 'মাসীর ঘুম ভেঙেছে নাকি?'

গুলচ মাথা নাড়ল— ভাঙে নি।

চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বিছানা থেকে নেমে তরা চোখের ইশারায় গুলচকে বাইরে যেতে বলল।

খুব সাবধানে গুলচ বেরিয়ে এল।

পেছন পেছন তরাও এল।

দুজনে কপাহীর দিকে তাকাল— তখনো ও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

গুলচ উঠোনের সূর্যমুখী গাছটার পাশে এসে দাঁড়াল।

তরা ওর ডান পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল।

পুবের আকাশে তখন ঊষার আলো স্পষ্ট হয়ে এসেছিল। গুলচ একবার আকাশের দিকে তাকাল। তরাও তাকাল। উন্মুক্ত আলোয় চারদিকের পৃথিবীটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

মুখ তুলে তরা গুলচের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় ফিসফিস করে বলল— "কি হল?"

মুখে কিছু না বলে গুলচ সূর্যমুখী ফুলটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল।

ফোটা ফুলটা দেখে তরার মুখ খুশিতে ভরে গেল।

আকাশের আলো এসে ফুলটাকে ছুঁয়েছে। চারদিকের হাওয়া সামান্য একটু উষ্ণ হয়ে আসছিল।

—"আমার কাছে কেন এসেছিলে?" ফিসফিস করে তরা জিজ্ঞেস করল।

ফিসফিস করেই গুলচ বলল—"আমার চোখের সামনেই ফুলটা ফুটল, তোকে দেখাবার জন্য ডাকতে গিয়েছিলাম।"

মিষ্টি করে হেসে তরা বলল— "তাই বলো, আমি আবার ভাবলাম বুঝি অন্য কিছু—"

গুলচ একবার তরার দিকে তাকাল। লজ্জা ও আনন্দে ও লাল হয়ে গিয়েছিল।

এরপর তরার কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গুলচ বলল— "এত বড়ো হয়েছিস, শুতেও শিখলি না।"

লজ্জায় লাল হয়ে তরা একই সুরে বলল— "কে আর আছে ঘরে? শুধু তো তুমিই আছ।"

গুলচ আর-কিছু বলতে পারল না।

—"মাসী উঠেছে বুঝি— যা—"

তরা এবার একটু জোরে বলল— "এত বেলা পর্যন্ত কেউ কি ঘুমোয় ?"

একটা হাল্কা, আনন্দ চঞ্চল মন নিয়ে গুলচ কপাহীর ঘরে ঢুকল।

চারদিকে তখন ফটফটে আলো। ভোর হয়েছে। কপাহীর কিন্তু ঘুম ভাঙে নি। হয়তো গরমে রাতের প্রথম দিকে ঘুম আসে নি।

ও কপাহীর কাছে গেল।

কাত হয়ে সে ঘুমোচ্ছে, একটা ঠোঁট একটু বেঁকে ঝুলে পড়েছে। ওর গা থেকেও কাপড়টা আলগা হয়ে এসেছিল। তরার মতো কপাহীর গায়ের রঙও লালচে ফর্সা। তবে কপাহীর শরীটা তরার মতো এতটা মসৃণ ও আঁটো-সাটো নয়। গাল ও কপালের দু-একটা জায়গা কুঁচকে গেছে। মুখে বয়েসের স্পষ্ট ছাপ।

ওর বুক দুটোর বাঁধুনিও দৃঢ় ও বড়ো বড়ো বড়ো, কিন্তু একটু লম্বাটে হয়ে ঝুলে পড়েছে, যৌবনের সৌন্দর্যকে অটুটভাবে ধরে রাখতে পারে নি।

কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে কপাহীকে ও জাগাল।

—"এই— কত ঘুমোস, ওঠ, বেলা দু-প্রহর হল যে।" কপাহী ধড়মড়িয়ে উঠল, সাধারণত এত বেলা পর্যন্ত সে কখনো শুয়ে থাকে না।

—"হাঁস-মুর্গীর খুপরিগুলো খুলে দিয়েছিস তরা ?" চোখ কচলাতে কচলাতে বিছানা থেকেই কপাহী চেঁচিয়ে বলল। তরা তখন বাসন মাজতে পুকুরপাড়ে গেছে, মাসীর কথা শুনতে পেল না। শুনলেও না শোনার ভান করল।

নির্মল প্রভাত, গুলচের মনটাও নির্মল। গতকাল ডালিমগ্রাম থেকে আনা বিমর্ষতাটুকু একেবারে মুছে গেছে। কিছু অস্পষ্ট আশা ও স্পষ্ট আনন্দ গুলচকে উৎফুল্ল করে তুলেছে। গোয়াল ঘরের দরজাটা খুলে দিয়ে সে দুধেল গাইটা ছেড়ে দিল। বাচ্চা-গুলো লেজ তুলে তুলে নদীর দিকে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

কপাহীদের আঙিনা আনন্দের রঙে উপচে উঠল।

কপাহী গুলচের চোখমুখের খুশি খুশি ভাবটুকু লক্ষ করল, কিন্তু তার কোনো কারণ খুঁজে পেল না। তবু গুলচের আনন্দোচ্ছল মুখটা দেখে ওর ভালো লাগল। লোকটা ভোর না হওয়া থেকে পেঁচার ডাক না শোনা পর্যন্ত জানে শুধু কাজ করতে। কখনো হাসি-ঠাট্টা করা বা কথাবার্তা বলার কথা ওর মনে পড়ে না। আজই শুধু ওর মনে রঙ লেগেছে।

তার মধ্যে কোনো বাহ্যিক পরিবর্তন কপাহীর নজরে পড়ল না। মেয়েটাও গুলচের মতোই হয়েছে। শুধু মাথা নিচু করে কাজ করতে জানে। মুখে রা নেই, হাসিও নেই। এরা কেমন ধারা যুবতী মেয়ে?

মাঝে মাঝে কপাহী যে তরার মনটা বোঝার চেষ্টা করে না তা নয়।

তরার বিয়ের বয়েস হয়েছে, দেখতে দেখতে সতেরো বছর বয়েস হল, এখন আর ছোটোটি নেই। তা ছাড়া বাড়িতে অন্য আর একটিও জনপ্রাণী নেই। সে মন খুলে কার সঙ্গেই বা কথা কইবে? মাসী-পিসীও নেই যে একটু ঘুরে আসবে। অন্য সবাইয়ের সঙ্গে সভ্য আলাপ। তা ছাড়া যুবতী মেয়েদের বাড়ি বাড়ি আড্ডা মেরে বেড়ানো ঠিক নয়, দশজন দশ কথা বলার সুবিধে পায়।

গুলচও তেমনই। তরার বিয়ের যে চিন্তা করতে হয় সে খেয়ালই নেই। বাড়িতে বসিয়ে রেখে কি আইবুড়ো করাটা ভালো দেখায়? তরার কোনো একটা ব্যবস্থা করতে না পারলে ওর মুখে হাসি ফুটবে কি করে? এভাবে বসিয়ে রাখাটা আর ঠিক হবে না। গুলচের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করতে হবে।

আজই কথাটা পাড়তে হবে। আজ গুলচের মনটাও খুশি খুশি। অন্য সময় মনের যা অবস্থা! এই ধরনের কথাবার্তা বলতেই ভয় করে। তবে লোকটার বুদ্ধি আছে, নইলে অবস্থার কি আর এই পরিবর্তন আনতে পারে? মনে মনে নিশ্চয় কিছু ঠিক করে রেখেছে। দেখে শুনে ভালো ঘরে দিতে পারলে আর চিন্তা থাকে না।

সেদিন আর কথাটা পাড়ার সুযোগ হল না, তরা সারাটা দিন ঘরেই ছিল। ওর সামনে এ-সব কথা তোলাটা ঠিক নয়। বিকেলে কপাহীর সঙ্গে গুলচ অন্য দু-চারটে মাত্র কথা বলল।

বিহুর এই দিন ক'টায় এ-সব আলোচনা করার সময় পেল না। তখন গুলচ নানারকম কাজে ব্যস্ত। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ডালিম-গ্রামেই যাওয়া হল না। ওপারের গ্রামের আশেপাশেই নদীর পাড়ে, ওদের নিজেদের মাঠে অকারণে ঘুরে বেড়াল।

আকাশ মেঘে ছেয়ে গেছে। ঝুলে পড়া মেঘগুলো বিহুর ঢোল-পেঁপার শব্দে নিচে নেমে এসেছে। হাওয়ায় কেতকী-টগরের গন্ধ ভেসে আসছে। ধনশিরির বুকে স্রোতের দেওধনি নৃত্যের তাল। ফোটা শিমুল তুলোগুলো বাতাসে উড়ে গিয়ে লোকের বাড়ি ও আঙিনায় ছড়িয়ে পড়েছে। ভেসে বেড়ানো মেঘ আর উড়ে বেড়ানো তুলোর মধ্যে যেন একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে।

শুকনো মাঠের বুক চিরে মাটির তলা থেকে ঘাস ও জঙ্গলের কচিপাতাগুলো মাথা তুলে উঁকি মারছে। বাতাসের সঙ্গে সজীব বনানীর প্রাণবন্ত সুগন্ধ মিশে রয়েছে। অজস্র জীবনের অজস্র প্রাণধারার প্রাচুর্য ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে বাতাসে।

বাড়ির বাঁধন গুলচের উড়ু উড়ু মনকে বেঁধে রাখতে পারল না। মনের পাখা গজিয়েছে, পাখায় রঙ লেগেছে; রঙে সৌরভ মিশেছে, সেই সৌরভে জীবন্ত অরণ্যের প্রাণ-স্ফুরণ।

ঘুরে বেড়াতে গুলচ ভালোবাসে। বন্ধনমুক্ত প্রাণপক্ষী নীড়-হারা হতে চায়; ঘাটের পানসী ঘাট থেকে ছুটে গিয়ে মাঝ-দরিয়ায় ভেসে যেতে চায়; বৈশাখের পৃথিবী পুরানো সব-কিছু ভুলে যাওয়ার আহ্বান জানায়। সব-কিছু নতুন, গুলচের মনের মধ্যে একটি নতুন মানুষের ঘুম ভেঙে যায়। বিরিণার কচি পাতাগুলো সবুজ হয়ে ওঠে, কচি ঢেঁকি শাকের সরু হয়ে আসা ডগা কোঁকড়া চুলের মতো হয়। মনের বাঁকে হিঙ্গুল-হরিতালের রঙের ছোঁয়া লাগে।

গুলচের ইচ্ছে হয় ও যেন সাতটা ঢোল বাজিয়ে নাচে। হাত-তালি দিয়ে কপাহী, তরা ও গ্রামের অন্য ঝিউড়ী-বউড়ীদের যেন সাত বিহু নাচাবে। ওদের পা বেয়ে দর দর করে ঘাম ঝরে পড়বে। ওর পেঁপার শব্দে যেন বউ-কথা-কও পাখির বুক কেঁপে উঠবে। ধনশিরি একমুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে ওদের গাঁয়ের বিহু নাচ দেখে যাবে।

গুলচ বিহু নাচতে যায় নি। কিন্তু ওর মনের ভেতর সাত বিহুতলার ব্যস্ততা, মনটা ওর নেচে নেচে ওঠে।

কল কল করে বয়ে যাওয়া ধনশিরিকে ও বলে— একটু দাঁড়াতে পারিস না। দিবারাত্রি বয়ে গিয়ে কী পাস? বোশেখ এসে গেছে,

বিহু হচ্ছে, একটু দাঁড়িয়ে একবার যদি নেচে যেতিস! তুই জানিস শুধু চলে যেতে। তোর কোন্ লালমুখো ভাতার তোর জন্যে অপেক্ষা করে আছে রে? যা— চলে যা, তোকে একবার নাচাতে পারলাম না, মনে খেদ থেকে গেল। তোর পাড়ে একদিন নাচব, সময় পেলে একবার দেখে যাস—

আরো অনেক কথা, ওর মন কী বলে সে নিজেই বোঝে না। ধনশিরি ওর মনের কথা হয়তো বোঝে, হয়তো বোঝে না, ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। নাচতে ইচ্ছে করলে নাচতে হয়, গাইতে ইচ্ছে করলে গাইতে হয়, বিহুতে আনন্দ করার ইচ্ছে হলে আনন্দ করতে হয়।

মনটাই আসল।

বরদৈচিলা হও, ধনশিরি হও আর ফাটা শিমুল তুলোই হও— ভেসে বেড়াও, পাড় ভেঙে বয়ে যাও, সব-কিছু তছনছ করে ভেঙে চলে যাও— সে-ই জীবন, সে-ই বিহু।

গুলচের মনের মণিকোঠায় এই বিহুরই রক্তিমা লেগেছে। আর-কিছু সে বলতে পারে না।

সাতাশ

আষাঢ় শেষ হয়ে এল, নিচু জমিগুলোতে বুনবার জন্য গুলচ শেষ বীজটুকু ছড়াচ্ছিল। নদীর পাড়ে খানিকটা জমি আছে, আশ্বিনে সেখানে চারাধান লাগানো যাবে। এর আগে সেখানটায় জল জমে থাকে। এই জমিটায় লাগানোর জন্য তাই বীজও দেরি করে ছড়ানো হয়।

কোথা থেকে চন্দ্র এসে মাঠেই গুলচের সঙ্গে দেখা করল।

—"এখন পর্যন্ত বীজ ছড়ানোই হল না নাকি রে গুলচ! বড্ড লেট করলি যে—"

—"এগুলো পরে বুনবার জন্যই। কোত্থেকে এলি?" বীজতলার আলের উপর উঠে গুলচ বলল।

—"এদিকে খবর কেমন?"

—"ভালোই। এলি কোত্থেকে?"

—"ডালিমের খবর পাস নি?"

—"তেমন কিছু তো পাই নি। অনেকদিন যাওয়া হয় নি, কেন, কী হয়েছে?"

চন্দ্র দুটো বিড়ি বের করে একটা গুলচকে দিল।

চন্দ্রর বিড়িতে নিজেরটা ধরিয়ে গুলচ টান দিতে লাগল।

—"ওদিকে এপিডেমিক লেগেছে।"

—"কী লেগেছে?" এপিডেমিক শব্দের অর্থ গুলচ বুঝতে পারে নি।

ধীরে ধীরে ধোঁয়া ছেড়ে চন্দ্র বলল— "কলেরা হয়েছে। পুরানো ডালিমের দিকে দু-চারজন মরেওছে।"

ওর গলার স্বর নির্বিকার!

—"কলেরা হয়েছে! আমরা তো কিছুই জানি না। এখন সব কেমন আছে!"

—"আর কয়েকটাকে না মেরে কি আর যাবে? আমাদের কথা ওরা উড়িয়ে দেয়। হোয়াই নট ডাই? পুকুরের পচা জল খাচ্ছে। নদীর জলটুকু এনে খেতে পারে না। তা ছাড়া ওরা কি আর মানুষ। জানোয়ারের মতো বাস করে, উঠোন-ঘর পরিষ্কার করে রাখার নিয়ম নেই ওদের। অল ডার্টি, বাড়ির চারদিকে ডার্টি আর ডার্টি। জল গরম করে খেতে বললাম— হেসে উড়িয়ে দেয়। আষাঢ় মাসে গরম জল! আমরা পৌষ মাসেও ঠাণ্ডা জল খাই। মর এবার ঠাণ্ডা জল খেয়ে! আমি খবর পেয়ে ছুটে গেছি— এত করে বললাম—নো লিস্‌ন্—অল লাফ। গোলাঘাটে এস. ডি. ও.-কে বলে সরকারী ডাক্তার আনালাম, ইনজেকশন নেবে না। যারা নেয় নি তারা না মরে কি আর বেঁচে থাকবে! লেট দেম ডাই।"

চন্দ্র বিড়িটা জোরে জোরে টানতে লাগল। ডালিমের লোকের ওপর ভীষণ চটা সে, ওরা ওর কথা শোনে না, ডাক্তারের পরামর্শ-মতো চলে না।

—"যাক— ডাক্তার তবু এসেছে"— গুলচ বলল।

—"কোথায় আসত, ডালিমে ডাক্তার আসবে? আমি গিয়ে

নিয়ে এলাম। আজ চারদিন হয় ওখানেই আছে। ইনজেকশ্যন দিয়েছে, আর কারো হয় নি। তবে নাহরটা গেছে।"

—"কে মরেছে?"

—"নাহর— সেই যে কপাহীকে আগে বিয়ে করেছিল। জোয়ান ছেলে, ইয়ং ম্যান, কিন্তু তা হলে কি। ডেথ কিলিং এভরিবডি।"

নাহরের মৃত্যু সংবাদে গুলচ খুশি হবে কি দুঃখিত হবে ঠিক করতে পারল না; মনে হয় সে খুশিই হয়েছে— নাহর আর নেই।

গুলচ হঠাৎ জিজ্ঞেস করল— "সফিয়তদের দিকে কারো হয় নি?"

—"না ওদিকটায় কারো হয় নি। আগেই সুঁই নিয়েছিল কিনা। কয়েকজন নিয়েছে। পিভেনশ্যন বেটার ছ্যান কিওর।"

কথাটা গুলচের মনঃপূত হল না। কলেরা হয়ে সফিয়ত বুড়ো, হাবাটা, চেনির বাবা— সব ক'টার মরা উচিত ছিল। যাদের মরা উচিত তারা মরে না।

চন্দ্র বলল— "এদিকের খবর নিতে এলাম। লোকেরাও আয় আয় করে। এখানেও হতে পারে। কলেরা স্প্রেড করে।"

মাঠ থেকে দুজনে গুলচের বাড়ির দিকে পা বাড়াল। এই আষাঢ় মাসেও চন্দ্র পেছন দিকে ফিতে-আঁটা স্যাণ্ডেল পরেছে। প্যান্টটাকে হাঁটু অবধি গুটিয়ে নিয়েছে। চোখে একজোড়া কালো চশমা। দাড়িগুলো বড়ো বড়ো হয়েছে, বেশ ক'দিন কামায় নি। বোধহয় সময় পায় নি।

পথে গুলচের একটা কথা মনে পড়ল। শুধোল— "ডাক্তারকে এদিকে আনতে পারিস?"

—"ডাক্তারকে? কেন?"

—"চেনিমাইকে মনে আছে? সেই যে—"

—"মোলোকার ছেলের বউ? সেই যে তোর তখনকার— ?"

—"হুঁ, ওর স্বামীর অসুখ, অনেকদিন হল। ডাক্তার এসে যদি একটিবার দেখে যেত।"

—"সে তো এপিডেমিকের ডাক্তার। হয়েছে কি?"

—"কি এক কাশির অসুখ, শ্বাসের রোগ না এজমা কিছু একটা—"

—"ডাক্তার এসে দেখে গেলেও চিকিৎসা তো করতে পারবে না। এসেছে কলেরার জন্য।"

—"দরকার হলে চিকিৎসা পরে করানো যাবে। গোলাঘাটের হাসপাতালে নিয়ে না গেলে এখানে ওর অসুখ সারার আশা আছে বলে মনে হয় না। ডাক্তার এসে দেখে-টেখে যদি ওকে গোলাঘাটে নেয়ার ব্যবস্থাটা করে দেয়—"

ওরা গুলচদের উঠোনে এসে পৌঁছল।

—"তরা, আরে এই তরা—" চন্দ্র ডাকল।

ভেতর থেকে তরা বেরিয়ে এল।

—"ও— ককাইটি—"

—"ককাইটি না হয়ে কি আর তোর জন্য কোনো রাজপুত্তুর এসেছে ভেবেছিস? একবাটি চা খাওয়া দেখি। গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে—"

চোখ বড়ো বড়ো করে চন্দ্রর দিকে তাকিয়ে তরা তাড়াহুড়ো করে রান্নাঘরের দিকে ছুটল। গুলচেরও রোদে থেকে তেষ্টা পেয়েছিল।

গুলচ বলল— "একটু বোস, আমি হাত-পায়ের কাদাগুলো ধুয়ে আসি। তরা, একটু জলপান চায়ের সাথে দিস।"

আর-একটা বিড়ি ধরিয়ে চশমাটা খুলে রেখে চন্দ্র জিজ্ঞেস করল— "তোর মাসী নেই নাকি, তরা?"

রান্নাঘর থেকে তরার উত্তর এল— "আমার হাতে চা-জলপান অচল নাকি?"

চন্দ্র বলল— "হুঁ, রিপ্লাই দিতে শিখেছিস। তাই তো, এত গুণের না হলে কি আর বাড়িতে আইবুড়ো হয়ে বসে থাকতে হত?"

—"তা হোক, তুমি নিজে গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে করে কত ছেলে-মেয়ের বাপটা হয়েছ। কথাটা বলতে তোমার লজ্জা করা উচিত ছিল।"

—"আচ্ছা, আর বছর দুয়েক ওয়েট কর। দেখবি শহর থেকে রাজকন্যে নিয়ে এসেছি।"

—"এইজন্যই বুঝি গ্রামে আর মন বসে না। আমরা কিন্তু আগেই বুঝতে পেরেছি—"

গুলচের গলা খাঁকারি শুনে তরা চুপ করল।

একটু পরে তরা ওদের জন্য চা-জলপান নিয়ে এল।

তরার দিকে তাকিয়ে একটু গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে চন্দ্র বলল— "তরার বিয়ের কিছু চেষ্টা করছিস নাকি, মেয়েটা মস্ত বড়ো হয়ে গেল দেখছি—"

ওর প্রশ্ন শুনে জলপানের গ্রাসটা গুলচের হাতেই রয়ে গেল। অসহায়ভাবে সে চন্দ্রর মুখের দিকে চাইল।

চন্দ্র বলল— "যেখানে-সেখানে বিয়ে দিস না যেন। মেয়ে হলে আমরা জানি বিয়ে দিতে হয়। মেয়ের মতামত নেয়ার কথা আর ভাবি না। ভালো বাড়িঘর দেখে, ভালো ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিবি! ওর জন্য ভালো ছেলে নিশ্চয়ই পাবি।"

গুলচ অর্ধেকটা জলপান খেল, অর্ধেকটা ফেলল, চাটুকু কোনো রকমে গলা দিয়ে নামাল। ঢোঁক গিলে আমতা আমতা করে বলল—"দেখি, বিড়ি একটা দে। এই তরা, একটু আগুন আন্ তো—"

বেড়ার ওপাশে উৎকণ্ঠিত ভাবে তরা দাঁড়িয়ে ছিল। ওর বুকটা ঢিপ ঢিপ করছিল। গুলচের উত্তরের অপেক্ষায় ও ফাঁসীর আসামীর মতো উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিল। গুলচের নীরবতা তাকে নির্ভয় করতে না পারলেও কিছু আশ্বস্ত করল।

মাথা নিচু করে ও একটুকরো জ্বলন্ত কাঠখড়ি কোনোমতে এনে গুলচের হাতে দিল।

চন্দ্র বলল—"ভয়ের কোনো কারণ নেই তরা। আই এ্যম্ ইয়োর ব্রাদার। তোকে যেখানে-সেখানে বিয়ে দিতে পারবে না, খুব ভালো ছেলের সঙ্গে তোর ম্যারেজ দেব বুঝলি—"

—"যাঃ"—চাপা স্বরে এইটুকু বলে তরা ভেতরে চলে গেল।

চন্দ্র গম্ভীর হয়ে গুলচকে বোঝানোর চেষ্টা করল—"আগের যুগে আমাদের হিন্দু মেয়েদের নাকি স্বয়ম্বর হত। পছন্দমত পাত্র খুঁজে মেয়েরা তার গলায় মালা দিত। আজকাল ইয়োরোপ-আমেরিকার দিকে নাকি ছেলেতে মেয়েতে মনের মিল হলে তবে বিয়ে হয়। আমাদের এই গ্রামগুলোতেই শুধু মেয়েদের ধরে বেঁধে কানার মতো করে যার-তার সাথে বিয়ে দেয়। এখন সে-সব নিয়ম উঠে গেছে। তরাকেও বিয়ে দিস। তবে ওর মন বুঝে, ওকে জিজ্ঞেস করে তবে দিস। ধরে বেঁধে দিস না কিন্তু। এই গ্রামগুলোতে কেউ কেউ যে পালিয়ে যায়, সেটাও মন্দ নয়, বুঝলি। মনের মিলই হল খাঁটি ম্যারেজ।"

মাথা নিচু করে গুলচ চন্দ্রের কথাগুলো শুনছিল, কিন্তু কথাগুলোর কোনো অর্থ সে বুঝতে পারে নি।

তরাকে বিয়ে দিতে হবে।

তরার জন্য ভালো ঘরবাড়ি আছে এমন একটি সুপাত্র খুঁজতে হবে।

চন্দ্রর কথায় গুলচ চিন্তিত হয়ে পড়ল। তরার বিয়ের কথা ভাবতে তার কষ্ট হয়। এতখানি নিষ্ঠুর সে কী করে হবে? তরাকে কী করে ছেড়ে থাকবে? দূরে সরিয়ে দেবে?

কিন্তু যদি তরা যেতে চায়।

ভালোবাসার আগুন যত সহজে জ্বলে তত সহজে নিবে যেতে চায় না। নেবাতে চাইলে বেশি জ্বলে ওঠে।

চন্দ্র যেতে চাইল।

—"আমি আবার ডালিমে যাচ্ছি, তুই চিন্তা করিস না। পরশু নাগাদ ডাক্তারকে নিয়ে আসব। চেনিমাইদের বাড়ি আমরা যাব— ডাক্তার যদি অ্যাডভাইস দেয় তা হলে তাকে টাউনে নিয়ে যাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট করব। তুই চিন্তা করিস না। আমি আছি।"

চন্দ্র যেতে চাইল।

ভেতর থেকে তরা বেরিয়ে এল।

—"ককাইটি, চলে যাচ্ছ?"

—"চলে না গিয়ে তোদের এখানে আড্ডা মেরে থাকলে কি চলবে! এগেইন্ ডালিম গ্রামে যেতে হবে। আচ্ছা, আবার আসব। যাই, হ্যাঁ তরা—"

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে গুলচ বলল—"আচ্ছা চন্দ্র, একটা কি হাসপাতাল খোলা যায় না?"

চন্দ্র গুলচের দিকে তাকাল।—“কে বলেছে যায় না? হু সেইজ্? গ্রামের লোকের ইচ্ছে থাকলে এটা কী একটা কাজ? আমি তো অনেকদিন থেকে ভাবছি। কিন্তু মুখটাই আমার একমাত্র সম্বল, টাকা পয়সা থাকলে তবে কাজ হয়। তুই যদি এগিয়ে আসিস তো আমি এ কাজে হাত দিতে পারি। সত্যি, হাসপাতাল একটা নেসেসারী হয়ে দাঁড়িয়েছে।”

—“হুঁ”— সংক্ষেপে গুলচ উত্তর দিল। আবার একত্র হয়ে এই বিষয়ে আলোচনা করার আশ্বাস দিয়ে চন্দ্র চলে গেল।

গুলচ একবার চোখ তুলে তরার মুখের দিকে তাকাল। তরাও তাকাল।

গুলচ মাথা হেঁট করল।

মনে হল ও ভয় পেয়েছে, কোনো এক অদৃশ্য ষড়যন্ত্র যেন তাকে তরার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে।

আঠাশ

চাষের ভর মরসুম, অন্যদিকে চোখ ফেরাবার সময় নেই। কয়েক দিনের মধ্যেই চারা ধানগুলো লাগিয়ে ফেলতে হবে। একটা দিন দেরি করলেই প্রচণ্ড ক্ষতি।

কপাহী আর তরা দুজনেই খুব ভালো রুইতে পারে— হাত খুব

দ্রুত চলে। দু বিঘা কাদা মাটিতে একবেলায় রোয়া শেষ করে। তরাও জলে-ডোবা বীজতলার চারাধান একবেলায় কুড়ি-বাইশ আঁটি তুলতে পারে— কোনো ক্লান্তি নেই।

সুন্দর আবহাওয়া। প্রায় সারাটা আষাঢ় জুড়ে বৃষ্টি পড়েছে। শ্রাবণের এপক্ষে রোদ। মাটি গলে যাওয়ায় খুব কাদা। জোর বৃষ্টি মামার আগেই শুকনো দিনকটার মধ্যেই চারাগাছগুলো লাগিয়ে ফেলতে হবে। চারাগুলো একবার দাঁড়িয়ে উঠলে আর ভয় নেই।

কাক-মুর্গীর ঘুম ভাঙার আগেই গুলচ মাঠে যায়। কপাহী আর তরাও তখনই ওঠে। গোরু মোষ দুইতে হয়, উনুনে জলপান বসায়, ঢেঁকিতে এক গড়া চাল ভানে, তারপর গুলচের জলপানের পুঁটলিটা হাতে নিয়ে দুজনে মাঠে যায়। ওরা কখনো লাঙলের সীতায় বা মই-এ আটকানো ল্যাঠা বা পুঁটি মাছ ধরে। কখনো হাত দিয়ে, কখনো জাকই দিয়েও ধরে। তারপর রোয়া বা তোলায় লেগে যায়। কোনো কোনো দিন কপাহী বাড়িতে থাকে— মাঠে তেমন কাজ নেই, তরা একাই পারবে। ঘরে রান্না করে, ফাঁক পেলে একটু তাঁত বোনে।

রোদের ঝাঁঝে গোলাপ ফুলের মতো লাল হয়ে ওঠা তরার মুখটার দিকে তাকিয়ে গুলচ মনের আনন্দে লাঙল বায়, মই দেয়, আর তরার সঙ্গে এটা ওটা কথা বলে। গায়ে বেশি রোদ লাগলে মাঠের মধ্যে আম বা অশ্বত্থ গাছের নিচে দুজনে বসে। গুলচ একটা বিড়ি জ্বালিয়ে টানে, মাটিমাখা চাদরের আঁচলটা দিয়ে তরা ঘষে ঘষে মুখটা মোছে, একবাটি জল খায়, তারপর আবার ওরা ধানক্ষেতে চলে যায়।

কখনো তরা বাড়িতে থাকে, কপাহী মাঠে যায়।

সেদিন খুব চড়া রোদ। লাঙল বাইতে থাকা মাঠটায় কাদা-জল গরম হয়ে উঠেছিল, গোরু-মোষগুলো আর নড়তে চাইছিল না। রোদের ঝাঁজে সব পুড়ে যাচ্ছিল।

গুলচ ও কপাহী দুজনে মাঠ থেকে উঠে এল। এই খাঁ খাঁ করা রোদে আর মাঠে থাকা যায় না।

ওরা ছাতিম গাছটার নিচে এসে বসল। গুলচের উলঙ্গ পিঠটা রোদে পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। ও কপাহীর দিকে পিঠটা পেতে দিয়ে বলল — "ঘামাচিগুলো একটু গেলে দে দেখি।"

কাছে এসে কপাহী গুলচের ঘামাচিগুলো গালতে লাগল। ওপাশের বাঁশবন থেকে ওদের অজান্তে একটু হাওয়া বইছে। ওদের শরীর জুড়োল, অসহ্য ভাবটাও একটু কমল।

অর্ধেকেরও বেশি জমিতে এখনো ধান বোনা হয় নি। কতগুলো জমিতে দ্বিতীয়বার চাষ দেয়াও বাকি। গুলচের এ আর-এক চিন্তা।

—'রোপা-তোলা করার জন্য আরো দু-চারটি মেয়েকে আনতে না পারলে শ্রাবণ মাসের মধ্যে কাজ শেষ করা যাবে না। নতুন জমিগুলো এখনো পড়ে রয়েছে—'

—'শুধু রোপা-তোলার জন্য আনলেই কি হবে? বলদ জোড়া এমনি বসে আছে। দিন পনেরো বা একমাসের জন্য আর-একটি ছেলেকে লাঙল বাইতে আনালে হয়। একা একা আর কত করবে—'

—'অন্যের হাতের চাষ আমার পছন্দ হয় না। কেউ কেউ মাটির ডেলাগুলো না ভেঙেই ফেলে রাখে। তবে একজনকে না আনলে হবে না মনে হয়।'

ঘামাচি গালার সময় গুলচের মনটা বুঝবার চেষ্টা করে কপাহী বলল— "একটা কথা বলব ভাবছি—"

"কি ?"

—"এই মোলাকার ছেলে— তিখর— আমাদের বাড়ি একটু যাওয়া-আসা করছে। নিজেদের ক্ষেতে চাষ তো নামমাত্র। তাকে আনলে মনে হয় মন্দ হত না।"

গুলচ মাঠের দিকে চেয়ে রইল, কিছু বলল না।

একটু থেমে থেকে কপাহী আবার বলল, "আর-একটা কথাও ছিল—"

তখনো গুলচ চুপ করে রইল, শুধু কপাহীর কথা শোনার জন্য কান খাড়া করে রাখল।

—"তুমি একা একা চাষ-বাস, ভেতর-বার কতদিক আর সামলাবে। আমি ভাবছিলাম— তিখরকে আমাদের তরার জন্য ঘরজামাই করে আনলে কেমন হয়— ছেলেটা তো মন্দ না।"

—"কি !"—গুলচ খেঁকিয়ে উঠল।

ওর ধমকে কপাহী ভয় পেলেও চুপ করে রইল না। বলল, —"আমরা ছোটো ভাবলেও তরা কি আর ছোট্টটি হয়ে আছে ? আজ না হয় কাল বিয়ে দিতেই হবে। তিখরকে পছন্দ না হলে অন্য কাউকে খোঁজো। তুমি আবার এ-সব চিন্তা-ভাবনার ধার-কাছ দিয়েও যেতে চাও না।"

ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে গুলচ গর্জন করে উঠল— "চুপ করে থাক্। যদি ইচ্ছে হয় তো তোর জন্যই নিয়ে আয় যাকে মন চায়, ভেবেছিস আমি কিছুই জানি না। সেবার সফিয়তদের হাবাটার সঙ্গে দিতে চেয়েছিলি না তরাকে ? এবার খুঁজে পেলি

মোলোকার বেটা তিখরকে। যা— তোরা দুজনে চলে যা— যেখানে খুশি যা, যার কাছে যাওয়ার ইচ্ছে যা— পারি তো চাষবাস নিজে করব, না হলে নয়। মরগীয়া না, বন্ধকী না, একেবারে সোজা ঘরজামাই। ঘরজামাই এসে আমায় আর চাষবাস করে খাওয়াতে হবে না।"

ও মাঠে নেমে চলে গেল। গাছের ছায়ায় বিশ্রামরত মোষটার পিঠে শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে সপাৎ সপাৎ করে কয়েকটা ঘা বসাল। মোষটা আচমকা ভয় পেয়ে জোয়াল-মই সমেত ছুটতে লাগল।

ওর সঙ্গে সঙ্গে কপাহীও মাঠে নেমে এসেছিল। ভয় পেয়েছিল ঠিকই তবুও ও গুলচের কাছে গিয়ে জোর গলায় বলল, "কী এমন দোষের কথাটা বললাম। ঘরজামাই করার কথা বলে এমন কী আর অপরাধ করে ফেললাম? মোষটাকে মারছ কেন, না হয় আমাকেই দু'ঘা মারো—। কথাটা তুলতে না তুলতে তিরিং করে চটে উঠবার কি হল?"

দুজনে নীরবে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। গুলচের মুখটা বিমর্ষ, কপাহী লক্ষ করল। রাগ ও দুঃখে লোকটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ওর মুখে কোনো কথা নেই।

চাপা স্বরে কপাহী বলল— "আমি বুঝতে পেরেছি— আজকাল দিন দিন আমি তোমার চোখের কাঁটা হয়ে আসছি। জানি না কী করেছি।"

গুলচ এবারও কিছু বলল না। দুজনে নীরবে এসে বাড়ি পৌঁছল।

তরা কথাবার্তা কম বলে।

এদের সংসারটায় যেন জীবন্ত কোনো মানুষ নেই।

তরা ভাত বেড়ে দিল, দুজনে নিঃশব্দে খেয়ে উঠল। গুলচ স্নান করল না, হাত-পায়ের কাদা কোনোরকমে এক ঘটি জলে ধুয়ে নিল।

তরা একবার গুলচ আর একবার কপাহীর দিকে তাকিয়ে অবস্থাটা আঁচ করার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুই আন্দাজ করতে পারল না। শুধু এটুকু বুঝল যে মাঠে ওদের কিছু একটা খোটাখুটি লেগেছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর মোষটাকে স্নান করিয়ে গুলচ ও-ভাবেই বিছানায় সটান হয়ে শুয়ে পড়ল। কপাহীও উঠোনে চাটাই পেতে ছাঁচতলার ছায়ায় শুয়ে রইল।

তরা কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করল না।

কিছুক্ষণ বাদে কপাহী উঠে কাউকে কিছু না বলে মুখে একটা তাম্বুল পুরে মাঠের দিকে পা বাড়াল।

বাড়ি থেকে আধ মাইলেরও বেশি দূরে মাঠ। তরা চেয়ে দেখল সামান্য হেলে-পড়া সূর্যটার খাঁ খাঁ রোদ্দুর মাথায় নিয়ে কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা মাঠের দিকে কপাহী চলে যাচ্ছে। একটু পরে ভালুক বাঁশ বনটার পেছন দিকে কপাহী অদৃশ্য হয়ে গেল।

তখন খাঁ খাঁ করা রোদ, চারিদিক ঝিমিয়ে পড়েছে— নিস্তব্ধ, নীরব। নীল আকাশের বুক থেকে রোদ্দুর গলে গলে নিচে পড়ছিল। হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো একটু একটু কাঁপছে।

উঠোনে দাঁড়িয়ে তরা চারদিক তাকাল। কেউ নেই। চারদিক নিথর শূন্য, শুধু রোদ আর শ্রাবণের ধান ক্ষেত। আর কিছু নেই, কেউ নেই।

তরা ঘরে ঢুকল। একটু দাঁড়াল।

তারপর নিঃসংকোচে গুলচের বিছানায় গিয়ে ওর অনাবৃত পিঠটায় হাতটা রাখল। একটুও নড়াচড়া না করে গুলচ আগের মতো বালিশে মাথাটা গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল।

গুলচের পাশে বিছানাটার এক ধারে তরা বসল। একটু ঝুঁকে গুলচের মুখের কাছে মুখটা নিয়ে স্নেহভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল— "কি হয়েছে আজ— কথা নেই, বার্তা নেই— কি হল?"

গুলচ একভাবে পড়ে রইল।

মাথাটা ধরে গুলচের মুখটা তরা নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল। ওর চোখ দুটো ভিজে।

—"গাটা কি গরম। শরীর ভালো না?"

ফ্যাল ফ্যাল করে গুলচ তরার দিকে তাকাল। তরাও চেয়ে রইল।

মাথায় ঝাঁকুনি দিয়ে তরা জিজ্ঞেস করল— "এই, কী হয়েছে? আমাকেও বলবে না, থাক্ তা হলে—"

তরা উঠে দাঁড়াতে চাইল।

পাশ ফিরে গুলচ বিছানায় চিত হয়ে শুল। নির্বাক, গভীর দৃষ্টি নিয়ে তরার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

—"মুখের দিকে চেয়ে কী দেখছ? কী আছে আমাব মুখে?"

গুলচ তরার হাত দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বলল— "তুই, তুই কি আমায় ছেড়ে চলে যেতে পারবি?"

—"কি জানি কি বলছ! আমি তোমায় ছেড়ে কোথায় আবার যাচ্ছি? আমার আর কে আছে যে যাব?"

—"যদি তোকে নেয়ার কোনো লোক বেরয়?"

কথাটা শুনে তরার মুখটা শুকিয়ে গেল। মাথা নিচু করে ও বসে রইল।

কিছুক্ষণ বাদে গুলচ বলল—"তোর মাসী তোকে—তোর জন্য একটা ঘরজামাই আনতে চাইছে।"

সরল, গভীর চোখ দুটো দিয়ে, বেদনাহত চোখ দুটো দিয়ে তরা কিছুক্ষণ গুলচের দিকে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ দু-হাতে গুলচের গলা জড়িয়ে ওর বুকে মুখটা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

গুলচ তরাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ওর পিঠে আদর করে হাত বুলাতে বুলাতে বলল— "আমার আর কেউ নেই। তুই যদি যেতে চাস তো আমি তোর বিয়ে দেব। ভালো ঘর-বাড়ি দেখেই দেব—"

এবার তরা ওর হাতের তালুটা দিয়ে গুলচের মুখটা চেপে ধরল। গুলচের থুতনীর তলায় মুখটা রেখে ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে গুলচের বুকের ওপর পড়ে রইল। তরার চুলের ভেতর দিয়ে আঙুল চালাতে চালাতে গুলচ বলল— "তুই কেন কাঁদছিস ? চল মাঠে যাই, তোর মাসী একা রুয়ে শেষ করতে পারবে না। অনেকটা জায়গা কাদা করে রাখা আছে।"

কিন্তু ওর কথায় কান না দিয়ে অসহায় ভাবে তরা গুলচের বুকটা জড়িয়ে ধরে তন্দ্রাচ্ছন্ন একটি ছোট্ট মেয়ের মতো পড়ে রইল।

তরা কাঁদছিল, ঝর ঝর করে বয়ে আসা ওর চোখের জলে গুলচের বুক ভিজে যাচ্ছিল। গুলচ ওর বুকের ভেতর অনুভব করছিল কোনো সদ্য ভাঙা পলি-পড়া মাঠের কাঁচা বনানীর নিবিড় গন্ধ। সাদা দুপুরটা তখন কাঁদছে।

উনত্রিশ

গোলাঘাট থেকে চন্দ্র একদিন খবর নিয়ে এল— সরকারী হাসপাতালে কলাই-এর জন্য একটা জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চন্দ্রর চেষ্টায় আর ডালিমগ্রামে আসা ডাক্তার কলাইকে দেখে গিয়ে প্রস্তাবটা সমর্থন করায় এই সুবিধেটা পাওয়া গেল।

ভাদ্রের দশ তারিখে একটি রুগী চলে গেলে সেই জায়গাটা কলাইকে দেয়া হবে। সেইদিনই রুগীকে হাসপাতালে পৌঁছতে হবে, তা না হলে অন্য রুগীকে ভর্তি করাতে পারে।

চন্দ্র ও গুলচ দুজনে গিয়ে খবরটা মোলোকা ও চেনিমাইকে দিয়ে এল। চেনিমার মনটা খুশিতে ভরে উঠল। কিন্তু ওর আর-এক চিন্তা, কী করে কলাইকে গোলাঘাট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়। খরচপত্র পাবে কোথা থেকে— ওর হাতে তো একটা ফুটো পয়সাও নেই।

নিজেদের জমিতে ধান রুয়ে তিখর গেছে ডালিমে, অন্য কারো জমিতে হাল বাইছে। ওকে একমাসের জন্য নিয়েছে। আশ্বিনের প্রথম পক্ষে ফিরবে। মোলোকার দেবার মতো নিজস্ব কোনো মতামত নেই।

চন্দ্র বলল— “সরকারী হাসপাতালে থাকলেও কিছু টাকা-কড়ির

প্রয়োজন হবে। ডাক্তার-নার্সদের একটু খাতির না করলে চিকিৎসা ভালো হয় না। কম করেও যাওয়া-আসা সব মিলিয়ে ফিফটি-সিক্সটি মতো লাগবে— অর্থাৎ তিন কুড়ির মতো। রোগীর হাতেও দুটো পয়সা থাকা ভালো। নো মানী, নো লাইফ। ওষুধপত্রও কিনতে হবে।"

অসহায়ভাবে চেনিমাই বলল— "আমার হাতে একটা কানাকড়িও নেই তোমরা জান। তিন কুড়ি টাকা খরচ করার মতো সামর্থ্য থাকলে কি আর আমি এভাবে পড়ে থাকি?"

একটু ভেবে গুলচ বলল—"খরচের ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে। তুই বেশি চিন্তা করিস না। মানুষটাকে কোনোরকম করে এখন গোলাঘাটে নিয়ে যেতে পারলেই হয়—"

চন্দ্র অভয় দিল— "সে ব্যবস্থা আমি করব। আমার মনে হয় এখান থেকে ডালিমের ঘাট পর্যন্ত গোরুর গাড়ি করে নিয়ে সেখান থেকে নৌকো করে বড়ো ঘাটে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে। তারপর বাসে যেতে হবে। এখান থেকে বড়ো সড়ক পর্যন্ত একটানা গোরুর গাড়িতে গেলে কলাই-এর কষ্ট হবে। ওর শরীরে হাড় আর চামড়া ছাড়া তো আর কিছু নেই।"

চেনিমাই আর গুলচ ওর কথা সমর্থন করল। ভাদ্রমাসের আট তারিখে এখান থেকে রওনা হওয়ার দিন ঠিক হল। বসিরতের মার-নৌকো বড়োঘাটের দিকে উজিয়ে যাওয়ার কথা। বলে কয়ে সেই নৌকো করে ডালিমঘাট থেকে বড়ো ঘাট পর্যন্ত কলাইকে নিয়ে যাওয়া যাবে। বসিরত লোক ভালো, তা ছাড়া গুলচের সঙ্গে আলাপ আছে, চন্দ্রর সঙ্গে তো বন্ধুর সম্পর্ক।

ভাদ্রমাসের প্রথম সপ্তাহে বসিরত আসছে ডালিমগ্রামে।

চন্দ্র বলল, এর মধ্যে সে আর এদিকে আসতে পারবে না। নেপালীগ্রামে গোরু-মোষের খুরিয়া হয়েছে, অনেকে চাষ করতে না পেরে হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে। কি ভাবে ওদের সাহায্য করা যায় ও গিয়ে দেখবে।

আমাদের গ্রামে গোরু-মোষের হাসপাতালও একটা দরকার। নইলে এখানে মানুষ, গোরু কারো বাঁচার আশা নেই।

চন্দ্র বিদায় নিল। ওদিককার সব ব্যবস্থা করে সময়মতো সে এখানে আসবে। যদি যাওয়া হয় তা হলে গুলচরা যেন অন্যান্য ব্যবস্থাও করে রাখে।

চন্দ্র চলে যাবার পর গুলচ আর চেনিমাই এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করল। প্রথম প্রয়োজন কিছু টাকার। টাকা জোগাড় করতে পারলে অন্য সব ব্যবস্থা চন্দ্র করবে, চিন্তা করার কিছু নেই। কিন্তু আড়াই-তিন কুড়ি টাকা পাবে কোথায়?

গুলচ টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে বলে চন্দ্রকে বলেছে ঠিকই, কিন্তু এখন সে-ও চিন্তায় পড়েছে। তিন কুড়ি বললে কি হবে, কম করেও একশো-টা টাকা হাতে নিয়ে বেরতে হবে। চট করে জোগাড় করবে কোথা থেকে?

জমি কেনার জন্য আলাদা করে রেখে দেয়া টাকাটা ছাড়া ওর হাতে আর তো কোনো টাকা নেই!

তবু গুলচ চেনিকে অভয় দিয়ে বলল—"সব ঠিক হয়ে যাবে, তুই চিন্তা করিস না—"

চেনি বলল—"মানুষটার জামা-কাপড় কিছু নেই! বাড়িতে কোনো-রকমে চলে যায়, কিন্তু শহর-নগরের কথা। একপ্রস্থ বদলে না পরলে চলবে কি করে? জামা-কাপড়ের একটা ব্যবস্থাও করতে হয়।"

এবার গুলচ চেনির মুখের দিকে তাকাল।

সে হয়তো নিশ্চিত হয়ে ভাবছে গোলাঘাটে গেলেই কলাই সুস্থ হবে। ওদের একটা সুখের দাম্পত্য জীবন গড়ে উঠবে। তা না হলে মৃতপ্রায় এক রুগীর জন্য ওর এতখানি করার কী দরকার?

গুলচ বলল— "আচ্ছা আমি তোকে ক'টা টাকা দিয়ে দিই —তুই জামা-কাপড় কী করাতে চাস করিয়ে নিস। কিন্তু এনে দেবে কে?"

—"টাকা পেলে যেমন করে হোক আনাব—"

"আমার আর গিয়ে ফিরে আসার সময় নেই। যদি যেতে চাস তো আমার সঙ্গে আয়-এক্ষুনি। পয়সাটা নিয়ে আসবি—"

কথাবার্তা বলে, চা-জলপান খেয়ে গুলচদের বাড়ি থেকে ফিরতে ফিরতে চেনির সন্ধে পার হয়ে গেল।

চেনিকে গুলচের একটু এগিয়ে দিতে হল।

পথে চেনি বলল— "তোদের সংসারটাও আমাদেরই মতো চুপচাপ। বাড়িতে একটা বাচ্চা না থাকলে কেমন জানি খালি খালি লাগে।"

—"সে তো ঠিকই" —গুলচ বলল।

—"তরাটা আছে বলে তবু কিছুটা মানায়, ওর বিয়ে হয়ে গেলে তোদের বাড়িতে ঢুকতেই ইচ্ছে করবে না।"

গুলচ চমকে উঠল। চেনিমাইও তরার বিয়ের কথা বলে। কোনো কথা না বলে সেও গটগট করে এগিয়ে গেল, চেনিমাই পেছন পেছন যেতে লাগল।

—"কথা একটা বলব ভাবছিলাম, সুবিধে হয়ে ওঠে নি। মানে কথাটা হল কি—"

—"হুঁ—"

—"তরার জন্য কি কেউ এসেছে? যদি এখনো কিছু হয় নি তো আমি বলছিলাম কি আমাদের তিখরটার সঙ্গেই দে—"

হঠাৎ গুলচ ঘুরে দাঁড়াল।

চেনিমাই তখন হাঁটছিল। গুলচ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ায় ওর গায়ের ওপর চেনিমাই প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল।

কর্কশ কণ্ঠে গুলচ বলল— "তিখরের জন্য যদি এত দরদ তো নিজেই যাস না কেন? আধমরা মানুষটার হাত-পা ডলে মরছিস কেন?"

—"কী বললি?" একই রকম কর্কশ স্বরে চেনি চেঁচিয়ে উঠল।— "তুই, তুই আমায় এ-কথা শোনালি! চলে যা— আমায় আর বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে না। মরুক গে মরাগুলো, ভিক্ষে করে আর বাঁচতে হবে না—"

চেনি টাকাগুলো গুলচের দিকে এগিয়ে দিল।

রাতের অন্ধকারে পথের মাঝখানে অভাবনীয় ভাবে ওদের ঝগড়া বেধে গেল।

রাগে দুজনে কাঁপছিল।

হঠাৎ ওর দিকে এগিয়ে দেয়া হাতটা ধরে গুলচ চেনিকে বুকের ভেতর টেনে নিল, চেনিও ওর বুকে ঢুকে পড়ল। ধীরে ধীরে গুলচ বলল, "তরার বিয়ের কথা তুই বলিস না চেনি। সে-ই আমার সব। ছেলে-মেয়ে একটা নেই— ওকে বিয়ে দিয়ে বের করে দিলে আমি কি করে থাকব?"

অভিমান ও অভিযোগ মেশানো সুরে চেনি বলল— "তা সে-কথা না বলে কি এত খারাপ কথা বলতে হয়? কি করব?

আমি এখন অন্য একজনের হলাম, ইচ্ছে থাকলেও প্রকাশ্যে তোকে দরদ দেখাতে পারি না।"

ছোটো ছেলের মতো গুলচ বলল— "তরা আমায় খুব ভালোবাসে, সে না থাকলে আমি থাকতে পারব না। তুই রাগ করলি?"

"তা করব না কেন? ভাগ্যে ছিল, ব্যারামীটার হাতে পড়লাম। দেখি চেষ্টা করে, সারে যদি সারবে, মরে তো মরবে। তুই আছিস, যদি পারিস তো ভালোবাসিস, তা না হলে কোথাও চলে যাব। তবে নিজের লোকটা বেঁচে থাকতে অন্য কারো কথা ভাবব না।"

আরো কিছুক্ষণ গুলচ চেনিকে বুকে ধরে রাখল। দাম্পত্য জীবনের সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েও চেনিমাই রুগ্‌ণ স্বামীর আরোগ্য কামনা করছে! কথাটা শুনে গুলচ খুশি হল।

সে ধীরে ধীরে চেনিকে বন্ধনমুক্ত করল।

চেনি কিন্তু সরে এল না, গুলচের কাঁধে হাত রেখে মুখের দিকে চেয়ে বলল— "তোর প্রতি আমার আগের ভালোবাসা একটুও কমে নি। কিন্তু কপাহী কিছু ভাববে বলে ভয় পাই।"

কথাটা বলে চেনি গুলচের মুখটা নিজের মুখের কাছে এনে একটা চুমু খেল। গুলচ তাকে আবার দু-হাতে বুকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল, কিন্তু চেনি সরে এসে বলল, "কেউ এসে পড়বে, চল যাই—"

ওরা এগিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ নীরবে আসার পর চেনি বলল— "পয়সা-কড়ি থাকলে আমিও গোলাঘাটে যেতাম। শহর দেখাও হত আর লোকটার কী ব্যবস্থা হয় দেখে আসতাম।"

গুলচ বলল— "আমিও কখনো গ্রামের বাইরে যাই নি। একবার বেরোনর ইচ্ছে আছে। দেখি কলাই-এর সঙ্গে যেতে পারি কি না, তুই-ও কি যাবি?"

—"টাকা-পয়সাই আসল, যেতে চাইলেই কি আর যাওয়া যায়? তবে তুই নিয়ে গেলে যাব—"

—"আচ্ছা, ভেবে দেখি। তা ছাড়া আমার কাজও আছে। ডালিমের জমিটা বেচে দেব ভাবছি। যদি বেচতে পারি তো রেজেস্টারী করার জন্য গোলাঘাটে যেতে হবে। দেখা যাক, যদি দুটো কাজই একসাথে হয়ে যায়।"

আরো অনেক আলাপ-আলোচনার পর বেশ রাত করে গুলচ বাড়ি ফিরল।

ত্রিশ

অনেক কাজের ফাঁকে একটু সময় বাঁচিয়ে গুলচ একদিন কয়েকটা কাস্তে হাতে নিয়ে ডালিমে গেল। ওদের বাড়ির আশেপাশে প্রায় সব জমিতে ধান রোয়া হয়ে গেছে। কিন্তু নতুন করে বের করা জমিটার সবটা বাকী। ভালো করে এখনো জল শুকোয় নি। অবশ্য অন্যান্য বছরেও আশ্বিনের প্রথম দিকেই সে এই জমিটাতে ধান রোয়। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। তাড়াহুড়ো করে তেমন লাভও হয় না।

জমিটা পড়ে থাকলেও তিখরকে দিয়ে সে লাঙল বাইবে না— এটা নিশ্চিত। রূপাহী ও চেনি যা বলল তারপর তিখরকে ওদের উঠোনে পা দিতে দিলে ভুল করবে। তিখর তরার দিকে তাকালে গুলচ সহ্য করতে পারবে না।

ভীমের সঙ্গে পরামর্শ করে এক মাসের জন্য একটা নেপালী ছেলেকে মাঠের সব কাজ শেষ করার একটা ব্যবস্থা করবে। চাষের পর ভীমের কাছে গোরু-মোষগুলো রেখে আসবে।

দ্বিতীয় কাজ, দাদার সঙ্গে জমি বিক্রি নিয়ে আলোচনা করা। ওর দাদা যদি বেশ কিছুটা টাকা এখনই দিতে পারে তবে এখনই শহরে গিয়ে সে বিক্রির দলিল রেজিস্টারী করিয়ে দেবে। একই কাজের জন্য বার বার ও আর ডালিমে যেতে পারবে না, ওর অন্য কাজও আছে।

তৃতীয় কাজ, যে করে হোক চন্দ্রর সঙ্গে একবার দেখা করবে। শ্রাবণ প্রায় শেষ হয়ে এল। কলাইকে নেওয়া যদি ঠিক হয় আর সে ও চেনি যদি যায় তাহলে চন্দ্রর সঙ্গে সমস্ত পাকা করে আসতে হবে। আর বেশি দিন বাকী নেই।

চতুর্থ কাজ— যদি সম্ভব হয়, বসিরতের সঙ্গে এটা নিয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করতে হবে।

অন্য সব কাজ সে যেভাবে ভেবেছিল সে ভাবেই হল।

বিকেলে চন্দ্রর খোঁজে ওদের বাড়ি গেল।

চন্দ্রর জ্বর, শুয়ে আছে।

—"কবে এলি গুলচ ?"

—"সকাল বেলাই এসেছি। কবে থেকে তোর জ্বর ?"

—"আজ দুদিন হয়। খুব রোদ লেগেছিল কিনা। কাল খুব জ্বর ছিল। হানড্রেড থ্রির মতো হয়েছিল—"

—"কী করছিলি ?"

চন্দ্র বিছানায় উঠে বসল।

—"একটা স্টেজ বানাচ্ছি—"

—"স্টেজ ? সেটা আবার কি ?"

—"থিয়েটারের স্টেজ। টাউনে বড়ো বড়ো স্টেজ আছে। ভালো ভালো থিয়েটার হয়। অন্যান্য গ্রামেও স্টেজ আছে। আমাদের এখানেও একটা থাকা উচিত।"

কিছু না বুঝেই গুলচ বলল—"তা তো ঠিকই।"

"—গ্রামের লোকেরাও তাই বলে। বাঁশ কাঠ সব জোগাড় করেছি।"

—"খরার সময়ে এ-সব কাজ করতে হয়—"

—"ধেৎ, কাজের আবার সময় অসময় কি ? এখন বাঁশ-কাঠ জোগাড় করতে পারলে তবে তো উইন্টারে স্টেজ তৈরি করা যাবে। তারপর তোর চাষের আর কত বাকী ?"

গুলচ চাষের খবরাখবর বলল, আজ এখানে আসার কারণটাও বলল।

—"বেশ ভালো কথা গুলচ, তুইও চল, শহর-নগর না দেখে বুড়ো হওয়াটা ঠিক নয়। তা ছাড়া তুই চিন্তা করিস না— রেজিস্টারী দলিল আমি করিয়ে দেব—"

একটু পরে চন্দ্র বলল—"আচ্ছা, একটি কথা। তুই ডালিমের রূপিত জমিটা তো বেচতে চাস, না ?"

—হুঁ—"

—"ভিটে আর বাগান ?"

—"ভাবছি এখন বেচব না।"

—"একটা কথা বলব ভাবছি—" চন্দ্র বলল।

—"কী কথা রে?"

—"তুই আমাদের একটা ডোনেশন দে—"

—"ডোনেশন? সে আবার কি?"

—"আমাদের স্টেজটার জন্য তোর এখানকার বাগানের এক-টুকরো জমি আমাদের দে।"

একটু চিন্তা করে গুলচ বলল—"গ্রামের লোক যদি চায় তো দেব না কেন?"

চন্দ্র বলল—"যাদেব আছে তারা যদি না দেয় তা হলে গ্রামের উন্নতি হবে কি করে? তোরা তো জানিসই আমার কিছু নেই। শুধু মানুষটাই আছি। লেখাপড়াও হল না। তাই নিজের গতর খাটিয়ে কাজ করে দিই। অন্যলোকেরা গালাগাল দেয়, দিক, কি বলিস?"

—"তোকে কে গালাগাল দেয়? দশজনের জন্য কাজ করছিস, গ্রামের লোক প্রশংসা না করলেও আশীর্বাদ করবে—"

—"যে যাই করুক, আই ডু মাই ডিউটি। তুই তা হলে বাগানটা দিবি।"

—"বললামই তো। পড়ে থাকা বাগানটা এমনি থাকার চাইতে গ্রামের ছেলেমেয়েরা স্ফূর্তি করবে—"

গুলচ বেশ বুঝতে পারল যে জমি কেনার চাইতে দেওয়ার আনন্দ বেশি। একটা স্কুল হবে, হাসপাতাল হবে, একটা স্টেজ হবে— একটা সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান হবে। তুমি চিরদিন থাকবে না, কিন্তু প্রতিষ্ঠানটা থাকবে। এই রকম দানের অধিকারী হতে পারা গর্ব ও আনন্দের কথা।

তা ছাড়া আমার জিনিস আমার খুশিমত দান, বিক্রি, হস্তান্তর করতে পারাটাই তো স্বাধীনতা। গুলচ এই স্বাধীনতার আস্বাদ অনুভব করতে পারল তার সামান্য দানের মহৎ প্রতিশ্রুতিতে।

অবশ্য দাদার কাছে বিক্রি করা জমির দাম সে এক পয়সাও কমাল না। দরকার হলে দুটো টাকা দান করব সে আলাদা কথা, তা বলে দাম কমাতে পারবে না। দাদা জানে গুলচের কথার নড়-চড় হয় না, তাই বেশি দাম দর করল না।

ঘাটে বসিরতের সঙ্গে ও দেখা করল। বসিরতের নৌকো করে কলাই ঘাট পর্যন্ত যেতে পারবে। বড়ো নৌকো, কোনো চিন্তা নেই, ছই দেয়া আছে। রোদ-বৃষ্টির চিন্তা নেই।

নির্ভয়ে গুলচ শহরে যাওয়ার জন্য মনস্থ করেছে, এই কথা বসিরতকে বলে সে আনন্দ পেল।

বসিরত বেশ আন্তরিকভাবে গুলচের পরিকল্পনাকে অভিনন্দন জানাল। যেতে হয়, শহর-নগরে যেতে হয়। গোলাঘাট আর কতদূর— একবেলার পথ।

গুলচ বিনয় ভাবে বলল— "অন্য কোনো চিন্তা নেই। বাড়িতে মেয়েদের এই ভর বর্ষায় একা ফেলে রেখে যাচ্ছি। সম্ভব হলে আপনি একটু খবর নেবেন।"

বসিরত সম্মতি জানাল, সময় ও সুবিধে হলে নিশ্চয় যাবে। কত আর দূর? গুলচ নিশ্চিন্ত হল।

কিন্তু সন্ধেবেলা বাড়িতে একা ফিরে আসবার সময় গুলচের মনটা কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে গেল। চেনি মিথ্যে বলে নি। ছেলেমেয়ে না থাকা বাড়িতে ঢুকতে ইচ্ছে করে না; কেমন জানি খালি খালি লাগে। গুলচের সংসারে কবে একটি শিশু

থপ্ থপ্ করে হাঁটবে! ওর যদি একটা পুত্র সন্তান হ'ত তা হলে লাঙল বাওয়া লোকের খোঁজে ডালিমের নেপালী পাড়ায় আর আসতে হ'ত না। ছেলে বড়ো হয়ে লাঙল ধরবে, সে মোষ দিয়ে চাষ করবে, গুলচ গোরু দিয়ে করবে, সে আনাচ-কানাচগুলো নিড়াবে, গুলচ মই দেবে, দু-চাষ বাইবে, সে নতুন জমি বের করবে, গুলচ সেই জমির জন্য নতুন বীজ ছড়াবে।

কিন্তু গুলচ এপর্যন্ত তার কোনো আশা দেখতে পাচ্ছে না। কপাহী এসেছে আজ তিন বৎসর হল, এপর্যন্ত ছেলেপেলে হল না, আর বোধহয় হবে না।

একটা ছেলেই যদি হল না তবে শরীর পাত ক'রে, রক্ত জল করে সম্পত্তি করায় লাভ কি? আমার পরে এই সম্পত্তি কে খায় কে জানে! কপাহী আমার চাইতে বয়েসে বড়ো, তা বলে সে তো আর বুড়ো হয় নি। ওর চাইতে বড় মেয়েদেরও তো ছেলেমেয়ে হচ্ছে।

গুলচ ভাবল ওদের ছেলেপেলে হওয়ার কোনো আশা আছে কি না কপাহীকে জিজ্ঞেস করবে। যদি নেই—যদি নেই তো সে কি করবে? গুলচ আর কিছু ভাবতে পারল না।

একত্রিশ

সমস্ত ব্যবস্থা করে চন্দ্র ঠিক সময় এল। ইতিমধ্যে তৈরি কয়েক টুকরো জমিতে গুলচ ধান বুনল। নেপালী ছেলেটা বেশ স্বাস্থ্যবান। রোয়া, তোলা, চারাধান বয়ে নেয়া ইত্যাদি অনেক কাজে সাহায্য করল। কপাহী আর তরাও দিবারাত্র পরিশ্রম করে চারাধান লাগাল। চেনিমাই তিনদিন এসে ওদের কাজে সাহায্য করল। আবহাওয়া ভালো ছিল, দুদিন আগে রোয়া শেষ করতে পারলে সকলেরই লাভ।

কয়েক টুকরো নিচু জমি আর বীজতলা গুলোতে আর বোনার সময় হল না। গুলচের মনটা হাল্কা হল। সে উপস্থিত না থাকলেও এই জমিগুলো নেপালীটা ও কপাহীরা মিলে বুনে শেষ করতে পারবে।

আঠারো দিন বৃষ্টি হয় নি। ভাদ্রমাসের খরা। সহ্য করা যায় না। রোদ খাঁ খাঁ করছে। কিন্তু সেদিন দক্ষিণ দিকের আকাশটার দিকে তাকিয়ে গুলচ দেখল, ধীরে ধীরে সেদিকটায় মেঘ জমছে। হয়তো আর দু-চারদিনের মধ্যে প্রচণ্ড বৃষ্টি নামবে। অনেক দিন বৃষ্টি হয় নি, একবার নামলে সহজে থামবে না। লক্ষণ বেশি ভালো নয়। একটানা খরার পর জোর বৃষ্টি ও বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা।

যেন না হয়।

গুলচের বেশির ভাগ জমি নদীর পারে, নিচু জায়গায়। বানের জল এলে রক্ষা করা যাবে না।

তবে গত ছ' বছর ধনশিরিতে বড়ো বান আসে নি। এদিকটায় আবার বাঁধও নেই।

বন্যা যেন না হয়!

অবশ্য গুলচের বাড়িটা উঁচু জায়গায়। সমস্ত গ্রাম জলে ডোবার পর ওর ভিটেয় জল উঠবে। চারিদিক ঢালু এমন এক মাঠের মাঝখানে টিলার মতো একটুকরো জমির ওপর ওদের বাড়ি।

আর যদি বন্যা হয়?

হলে কি আর শুধু ওর বাড়িতেই আসবে? সবখানে আসবে। রোদ, বন্যা ও ঝড়কে বাধা দিতে পারে কে?

ভাদ্রের আট তারিখ রোববার।

তার আগের শুক্রবারে অনেক ভেবেচিন্তে ভোরবেলা থেকে সেজে-গুজে গুলচ ওপারের গ্রামের মসজিদে নামাজ পড়তে গেল। নামাজ পড়ার সব নিয়ম-কানুন ও জানে না। তবু কখনো কখনো ঈদ বা বকরিদের সময়ে ও মসজিদে গিয়ে জামাতের সঙ্গে ওঠা-বসা করে। অবশ্য গত তিন বৎসরের ভেতর ও ঈদের নামাজ ছাড়া অন্য নামাজ একটি বারও পড়ে নি। ওর তো মনেই পড়ে না।

মসজিদে নিয়ে যাওয়ার জন্য ও দুটো মোমবাতি কিনল। গোলাঘাটে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি করা নতুন জামাটা আর নতুন কেনা ধুতিটা পরল।

ভাদ্রমাসে মসজিদে বেশি লোক আসে না। জোয়ান ছেলেদের

মধ্যে আর-কেউ আসে নি— শুধু ও এসেছে। আর যে বুড়োরা মাঠে কাজে যেতে পারে না তাদের কয়েকজন।

ওজু করে মসজিদে ঢুকে সে মোমবাতি দুটো মিম্বরের সামনে সসম্মানে রাখল। নিজের অজান্তে চুপি চুপি প্রার্থনা জানাল :

: গোলাঘাট যাচ্ছি। কখনো যাই নি। বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা কোরো আল্লা।

: চেনিমাইও যাচ্ছে, ওর যেন কোনো বিপদ না হয়। ওর স্বামীকে হাসপাতালে রাখতে যাচ্ছে।

: আমার কোনো সন্তান নেই। আমায় একটি ছেলে দাও। একটা ছেলে হলে আমার আর কোনো কষ্ট থাকবে না।—

: দুটো মোমবাতি মসজিদে দিলাম! তুমি আমার প্রার্থনাগুলো শুনো—আল্লা—

অবশ্য নামাজ করে মসজিদ থেকে বাড়ি ফেরার সময়ে গুলচের মনে একটা সন্দেহ বাড়ল।

: আল্লা কি আমার সব আর্জি মঞ্জুর করবে? যে-কোনো একটা চাওয়া উচিত ছিল। এতগুলো একসঙ্গে চাওয়া বোধহয় ঠিক হল না। তবে আর-কিছু হোক না হোক আমার একটা ছেলে চাই। দরকার হলে মসজিদে আর দুটো মোমবাতি দেব। সিন্নিও দেব।

চারাধানগুলোতে গোছ এসেছে। আগে যেগুলো রোয়া হয়েছিল সেগুলোর রঙ ঘন সবুজ হয়ে আসছে। কপাহীদের হাতে লক্ষ্মী আছে। ওদের হাতের রোয়া সাতদিনের পুরানো চারাধান গুলোও লক লক করে বাড়ে।

গাছগুলো বেশ রোদ পাচ্ছিল। ধানের পোকারা এবার আর

ক্ষতি করতে পারবে না। জহাধানের মাঠগুলো থেকে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে।

নিজের মাঠগুলোর দিকে তাকাতেই গুলচের মন আনন্দে নেচে উঠল।

এগুলো সব আমার, এগুলো সবই আমার— জমিও, ধানও। ওদিকের ডাঙা জমিটায় একটু লালচে রঙ ধরেছে। দু-টুকরির মতো গোবর ফেলতে হবে। মই দেয়ায় এক দিকের কোণায় একটু কাদা জমেছে।

কলাই-এর আরোগ্য কামনা করে চেনিমাই মসজিদে দু-ফানা কলা পাঠিয়েছিল, নামাজের পর কলাই-এর জন্য জামাত যেন একটু মোনাজাত করে দোয়া করে। গ্রামের লোক দোয়া করল: কলাই অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য শহরে যাচ্ছে। ওর অসুখ সারিয়ে দিয়ো— আল্লা।

সকলেরই শেষ আশা ও আশ্রয় আল্লা।

সবাই একত্র হয়ে প্রার্থনা করলে সান্ত্বনা পাওয়া যায়, আত্মবিশ্বাস পাওয়া যায়।

কলাই-এর আরোগ্য কামনা করে আজ গুলচও প্রার্থনা করল। অবশ্য কলাই মরে গেলেও ও দুঃখিত হবে না। তবে চেনিমাই যখন কলা দু-ফানা পাঠিয়েছে, এইটুকু না করে পারল না। করতেই হল।

অন্যদের সঙ্গে ও সরলভাবে দোয়া করল: কলাই ভালো হলে চেনি সুখী হবে। ওর-ও ছেলেপেলে হবে, একটা সুন্দর সংসার গড়ে উঠবে। কলাই আরোগ্য লাভ করুক।

মসজিদ থেকে আসার পরদিনও সে মাঠে কাজ করল। এর পরদিন ভাদ্রমাসের সাত তারিখ।

সকালবেলা চন্দ্র এল।

কলাইকে মোলোকাদের বাড়ি থেকে ডালিমের ঘাট পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য তিখর বাড়ি এল।

কপাহী চেনিদের বাড়ি অনেকটা সময় হাতে নিয়ে গেল। কলাই-এর সঙ্গে চেনিমাই গোলাঘাট যাবে, কম কথা নয়। সঙ্গে যাচ্ছে চন্দ্র ও গুলচ। কপাহী বোঁচকা-বুঁচকি বাঁধায় একটু সাহায্য করল।

ঘরে গুলচ একা ছিল। তরাকে বলল—"তোরা কোনো চিন্তা করিস না। সম্ভব না হলে মাঠে যেতে হবে না। নেপালীটা-ই সব করবে। তুই আর মাসী ঘরে থাকিস। গোরু-মোষগুলোর দেখাশোনা করিস।"

—"সেখানে ক'দিন থাকবে?"

—"বলতে পারছি না। কলাই-এর জন্য যা করার চন্দ্র করবে। আমার কাজ কাছারীতে— দলিল করাতে হবে। একদিনের মধ্যে হয়ে গেলে তো ভালোই ছিল, তা না হলে দু-তিন দিন দেরি হতে পারে। দিনের গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না, গুমোট লাগছে। আজ বিকেলে বৃষ্টি নামতে পারে।"

—"বেশি দেরি কোরো না যেন। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ না হলে চলে এসো, দরকার হলে আবার যেয়ো—"

—"দেরি করব কেন? সেখানে কি আর আমার মামাবাড়ি যে হাত-পা ছেড়ে পড়ে থাকব?"

তরা একটা জলখাবারের পুঁটুলি বেঁধে গুলচের হাতে দিল।

জামা-কাপড়গুলোও ভাঁজ করে দিল। এরপর দিল উপদেশ—"শহর-নগরের কথা; সাবধানে থেকো—"

গুলচ বলল—"আচ্ছা—"

তাম্বুলের পুঁটুলিটা বেঁধে দিয়ে তরা বলল—"আমি কিন্তু খুব চিন্তায় থাকব, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।"

তরার হাতটা ধরে গুলচ বলল—"আসব রে আসব। তোকে না দেখে আমি কি আর বেশিদিন দূরে সরে থাকতে পারব?"

উঠোনে এসে আকাশটার দিকে তাকিয়ে গুলচ বলল—"আকাশের গতিক ভালো দেখছি না। আজ বৃষ্টি নামবেই। অনেকদিন ধরে রোদ দিচ্ছিল, ঝড় না এলেই হয়। ভয় করিস না। আসি কেমন তরা—"

দরজা ধরে তরা ওর যাওয়ার দিকে চেয়ে থাকল।

শুকোতে শুকোতে কলাই অস্থিচর্মসার হয়ে গিয়েছিল। কোনো-রকমে ধরে ধরে ওকে গাড়িতে তোলা হল। চেনি কপাহীর গলা জড়িয়ে একটু কেঁদে বিদায় নিল। কলাই-এর কোটরে ঢোকা চোখের কোনেও দুফোঁটা তপ্ত অশ্রু জমতে দেখা গিয়েছিল।

মোলোকা শুধু বলল—"আল্লা আছে, যা—"

ধনশিরির ঘাট পর্যন্ত ছোটোখাটো একটা শোভাযাত্রা বেরিয়ে এসেছিল। ওপারের গ্রামের আরো দু-চারজন এল কলাইদের বিদায় দিতে।

কেউ কেউ ফিসফিস করে বলাবলি করল: ফিরে আসাটা আর হয়েছে, কবরের মাটি টানছে।

কেউ বলে: জোয়ান ছেলে, শহরের বড়ো বড়ো ডাক্তারেরা

দেখলে ভালো হয়ে যেতেও পারে। অন্য অসুখ তো আর নেই, শুধু কাশি— কাশি কি আর সারে না!

রুগ্‌ণ হলেও স্বামীর প্রতি চেনির খুব টান। আর ক'টা মেয়ে এভাবে ওর মতো সঙ্গে যাবে, এই ব্যারামীটার সঙ্গে? মেয়েটার কপাল খারাপ— কেউ কেউ বলল।

কিন্তু চন্দ্রর কথায় সবাইয়ের মুখ বন্ধ হল। সে বলল— "গ্রামের একজন লোক শহরে মরতে যাচ্ছে দেখে এখন দুঃখটা করে কি হবে? আমাদের গ্রামেই যদি একটা হাসপাতাল থাকত তা হলে এভাবে জোড়াতালি দিয়ে কি আর টাউনে যাওয়ার প্রয়োজন হত? কলাই যদি সেরে উঠতে না পারে তো সেজন্য তোমরাই দায়ী হবে— ইউ আর রেসপনসিবল্। কিন্তু দেখবে, সে সুস্থ হয়েই ফিরে আসবে— উই গো!"

চন্দ্রটা খামখেয়ালী। ওর কথায় প্রতিবাদ করে লাভ নেই।

তিখর গোরুর গাড়ির পাশে পাশে ঘাট পর্যন্ত এসেছিল। কলাইকে নৌকোয় তুলে দিয়ে সে চোখের জল আর ধরে রাখতে পারল না। কোনোরকম করে গুলচকে বলল— "আমি ভাই হয়ে ভাইয়ের জন্য কিছু করতে পারলাম না। তোমাদের হাতেই সঁপে দিলাম।"

তারপর বৌদি চেনিকে বলল— "নবৌ, গুলচ কাইটি আর চন্দ্র যখন যাচ্ছে তোমার কোনো চিন্তা নেই। যদি প্রয়োজন মনে কর তো আমায় খবর না দিয়ে থেকো না।"

এর অর্থ সবাই বুঝল, কিন্তু ক্ষুণ্ণ হল না কেউ। সে কোনো অসম্ভব কথা বলে নি। কলাই-এর যদি কিছু হয় তো ভাইকে খবর দেয়ার প্রয়োজন নিশ্চয়ই হবে।

গুলচ ভেবেছিল কপাহীদের খোঁজখবর নেয়ার কথা তিখরকে বলবে, কিন্তু বলল না। তিখর আর কপাহী মিলে গুলচের অনুপস্থিতিতে যদি তরার কিছু একটা করে ফেলে। বিশ্বাস কি!

অবশ্য তরার ওপর গুলচের আস্থা আছে। সে কাউকে কিছু বলল না। দুজনে একসাথে বেশ থাকতে পারবে।

দশটা নাগাদ নৌকো ছাড়ল।

ভাদ্র মাসের ধনশিরির নতুন স্রোত। নদীর জল পাড় ছুঁই ছুঁই করছে। ঘোলা জল, গুমোট আকাশ, নৌকোর ভেতরে কলাই, চেনি, গুলচ আর চন্দ্র।

এ যেন মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের যাত্রা। স্রোত যায় ভাটির দিকে, আর নৌকো উজান বেয়ে।

একজন মাঝি আকাশের দিকে চেয়ে বলল, "বৃষ্টি নামার আগে বড়ো ঘাটে গিয়ে পৌঁছতে পারলে হয়। আকাশ কালো হয়ে আসছে। নদীতেই বৃষ্টি নামলে আমাদের এগোনো কষ্ট হবে।"

চন্দ্র, গুলচ আর চেনি তিনজনে আকাশের দিকে তাকাল। কলাইর ভাগ্য হয়তো খারাপ, দিনটা বেইমানি করবে। হাতে তালি বাজিয়ে কি আর মেঘ সরানো যায়? দীর্ঘ খরার পর আজ গুলচরা এল বলেই কি আর বৃষ্টি নামবে না?

তবু যত জোরে সম্ভব নৌকো এগিয়ে চলল।

বত্রিশ

বৃষ্টি থামে নি। এক নাগাড়ে ঝম ঝম করে পড়ছে। সাতটা পাহাড়ের মেঘ আকাশে জমে রয়েছে। কবে যে বৃষ্টি থামবে কেউ বলতে পারে না।

সেদিন নৌকো বড়ো ঘাটের ধারে আসতে না আসতেই বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটা পড়তে শুরু করেছিল। ঘাটে এসে নৌকো বাঁধতে না বাঁধতেই প্রচণ্ড বর্ষণ শুরু হল।

কলাই আর চেনি নৌকোর ছই-এর তলায় রইল। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে চন্দ্র আর গুলচ পাড়ে উঠে এল। আজ বাস পাওয়ার আর কোনো আশা নেই। ঘাটের চালাঘরটাতে কোনো রকম থাকতে হবে। রাত্রে ভাত খাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না; জলখাবার খেয়ে পড়ে থাকবে। শুধু বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেলেই হয়। রুগ্ণ কলাইটা বৃষ্টির জলে ভিজে না গেলেই রক্ষে, তা না হলে সে মরে যাবে।

সে রাতটা সেখানে কাটিয়ে পরের দিন বৃষ্টির মধ্যেই ওরা সবাই বাসে করে গোলাঘাট পৌঁছল। এর পরের দিন ভাদ্র মাসের ১০ তারিখ। সেদিন চন্দ্র ও গুলচ কলাইকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিল। এখন চেনিমাইর জীবন ডাক্তার ও আল্লার হাতে।

ডাক্তার অবশ্য দেখে বলল ভয়ের বিশেষ কোনো কারণ নেই। কথাটা চন্দ্র ও গুলচের বিশ্বাস হল না। ওপারের গ্রাম থেকে এপর্যন্ত আসতেই কলাই আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে। হাসপাতালে পৌঁছতেই ওর যা অবস্থা হয়েছিল! যে-কোনো মুহূর্তে কোনো দুর্ঘটনা হতে পারে ভেবে ওদের ভয় হয়েছিল। চেনিমাই কিন্তু আশা ছাড়ে নি। ডাক্তার কি আর এমনি বলেছে, হয়তো কলাই সুস্থ হয়ে উঠবে।

চন্দ্রের মুখে প্রথম শোনা কথাটা চেনিমাইর মনে পড়ল। সে গুলচকে একদিকে ডেকে নিয়ে বলল— "শুধু লোকটাকে এখানে রেখে গেলেই কি হবে? ডাক্তারকে কি কিছু দিতে হবে না? তা ছাড়া সেই মেয়ে দুটিকেও তো মনে হয় কিছু দিতে হবে।"

কোমরে গুঁজে আনা জালি-জালি থলিটা চেনিমাই-এর হাতে গুলচ এগিয়ে দিল।

—"একশো দশটাকা ছিল। নৌকোতে-বাসেতে কত খরচ হয়েছে জানি না। কত দিতে হবে ওখান থেকে নিয়ে দিয়ে আয় গে যা—"

—"আমি আর জানি কি?"

টাকাগুলো সে চন্দ্রর হাতে দিল।

গ্রামে ফট ফট করে বেড়ালেও বাইরের বড়লোকদের সামনে সে কিছুটা নম্রভাবে চলে। অবশ্য চেনিমাই আর গুলচের সামনে কোনো দুর্বলতা প্রকাশ করল না। দুজনকেই সে বলল— "এটা সরকারী হাসপাতাল, সরকার ডাক্তারকে মাইনে দেয়। তবে রোগীকে কষ্ট করে দেখবে যখন, তাকে একটু খাতির করে না চললে কেমন হবে? শুনতে পাই বড়ো বড়ো হাসপাতালগুলোতেও উপরি না দিলে মানুষ মরে গেলেও নাকি ডাক্তাররা ফিরে তাকায়

না। এ-সব বন্ধ করতে হবে। এভাবে দেয়াটা নট গুড— তবে এটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

গুলচ বলল— "একটা মানুষের জীবনের চাইতে টাকাটা বড়ো নয়। সম্মানার্থেও তো কিছু একটা দেয়া যেতে পারে।"

চেনি মনে করিয়ে দিল যে গুলচের টাকার প্রয়োজন হবে। দলিল না কি একটা করানো বাকি, সেখানে আবার কাকে কতটা দিতে হবে কে জানে!

—"আমার হয়ে যাবে, এবার না হলে আবার আসব। আগে রোগীর কথাটা ভাব দেখি—" গুলচ বলল।

—"এদিকে এখনো শহর দেখা হয় নি। থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও করতে হবে—" চেনি বলল।

—"সে সব হবে। কিন্তু তোরা কি এখানে দু-একদিন থেকে যেতে পারবি?"

—"কেন?"

"দিন তিনেক আমার এখানে থাকতে হবে। যদি তোরাও থাকিস তো একসঙ্গে ফিরতে পারব। তা না হলে তোরা দুজন চলে যাস— আমার আর তোদের সঙ্গে যাওয়া হবে না।"

চেনি গুলচের দিকে আর গুলচ চেনির দিকে তাকাল।

চেনি বলল—"এখানে বাসে বসিয়ে দিলে বড়ো ঘাটে নেমে আমরা বাকি পথটা চলে যেতে পারব। তবে একই সঙ্গে ফিরতে পারলে ভালো হত।"

গুলচের দলিল রেজিস্টারী হল না— দুপক্ষই হাজির থাকতে হয়। গুলচের দাদা এসে পৌঁছায় নি। তাতে গুলচের কোনো খেদ নেই। জমিটা ওর দাদা পেয়েই গেছে, কিছু আগাম টাকাও

দিয়েছে। এবার হল না, আরেক বার হবে। শহরে আসার পথ তো সবে চেনা হল।

একটা হোটেলে চন্দ্র, গুলচ আর চেনিমাই দুপুরের ভাত খেয়ে নিল চন্দ্রর ভালো লাগলেও গুলচ আর চেনির তেমন ভালো লাগে নি, তরকারীতে খুব ঝাল। ডাল-ভাত আর সামান্য মাছের ঝোল খেতে তিনজনের খরচ হল পাঁচ টাকা চার আনা।

অবশ্য চায়ের দোকানে রসগোল্লা দিয়ে চা খেয়ে ওরা তৃপ্তি পেল। শহরে চা করার পদ্ধতিই আলাদা, চিনি-দুধ মিশিয়ে করে। খেয়ে নেশা না হলেও স্বাদ আছে। মিষ্টি খেয়ে গুলচের খুব ভালো লাগল। আরেকটা করে লালমোহন আর প্যাঁড়া খেয়ে নিল। পয়সা অনেক বেরিয়ে গেলেও দুঃখিত হয় নি। শহরে এসেছি, খরচ তো হবেই।

বৃষ্টির জন্য ওরা তেমন বেড়াতে পারল না। তবু চন্দ্র দুটো রিক্সা ডাকল। একটাতে নিজে বসল আর অন্যটাতে গুলচ আর চেনিকে বসিয়ে শহরটা দেখাল— কাছাড়ী, হাইস্কুল, বরুয়ার বাড়ি, যমুনা, ডস্ কোম্পানি আরো কত কি।

গোড়ার দিকে চেনি আর গুলচ বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল; কৌতূহলী চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে কৌতূহল থাকলেও বিস্ময় রইল না। মনে হল সব যেন ওদের চেনা, ওরা যেন কতকাল থেকে শহরেই আছে।

চন্দ্র অবশ্য অনুশোচনা প্রকাশ করল :

—"তোদের ভাগ্য খারাপ, রোদ থাকলেও বেড়িয়ে খুশি হতিস। তোরা এলি আর এমন জোর বৃষ্টি শুরু হল যে কিই-বা বেড়াবি, আর কিই-বা দেখবি।"

গুলচ বলল— "যা হবার হয়েছে, দেখলাম-ই তো, শহর আমাদের গ্রামের মতোই। কয়েকটা লোক আর গোটা দুয়েক দোকান বেশি, এই যা। আর কি আছে? আমি আবার ভেবে-ছিলাম শহর মানে অন্য কিছু বুঝি। একদিনেই আমার অরুচি ধরে গেছে।"

গুলচের অন্য আরেক চিন্তা :

তরার কথা ওর বার বার মনে পড়ছিল। বাড়িতে কপাহী আর তরা একা আছে। এদিকে আজ তিনদিন হয় জোর বৃষ্টি নেমেছে। দিনের অবস্থাও ভালো নয়। বৃষ্টি হোক, কিন্তু ধনশিরিতে বান এলেই মরণ। গোরু-মোষগুলোকেও ফেলে রেখে এসেছে। জল যদি বাড়ে তো রাত-বিরেতে একা দুটি মেয়েমানুষ কি করবে? অবশ্য ওর বাড়িটা উঁচু জায়গায়— সে পর্যন্ত জল যেতে সময় লাগবে।

রাত্রেও ওরা হোটেলে ভাত খেল।

গুলচ চন্দ্রকে বলল— "এখন রাতটা কোনোরকমে কোথাও কাটানোর ব্যবস্থা করো। কাল ভোরেই আমি চলে যাব, কেমন কেমন লাগছে—"

চন্দ্র বলল— "কোনো চিন্তা করিস না। আমার পরিচিত কয়েকটা ছেলে এখানে থাকে। আমি এলে ওদের ওখানেই রাতটা কাটাই। ওরা মেস করে থাকে, আমরাও ওখানে থাকব।"

—"জায়গা হবে?" গুলচ বলল।

—"হবে, তবে একটু অসুবিধে হবে আর কি। খড়ের ছোট্ট কুঁড়ে ঘর, জায়গা কম। তবে তোরা দুজনে কষ্ট পাবি না। আমি নিজের একটা ব্যবস্থা করে নেব—"

রিক্সা করে এসে ওরা শহরের এক প্রান্তে একটা নিচুমতো কুঁড়েঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। লণ্ঠন হাতে একটা ছেলে বেরিয়ে এল।

—"এরাই বুঝি?"

ভেতরে গিয়ে চন্দ্র বলল— "হুঁ, কিন্তু কি রকম ব্যবস্থা করলি?"

ছেলেটা বলল— "এই তো বিছানা করাই আছে। তুই আর আমি রমেশদার ওখানে যাব। ওখানে যদু একা আছে, একটা বিছানা এমনি পড়ে রয়েছে। আমরা সেখানে শুতে পারব।"

গুলচ বলল, "আমাদের সঙ্গেও কিছু কাপড়-চোপড় আছে।"

ছেলেটা বলল— "আপনারা এখানে থাকুন, কোনো চিন্তা করবেন না। আমরা পাশেই থাকব, রাতে দরকার হলে ডাক দেবেন।"

সব বুঝিয়ে দিয়ে চন্দ্র রমেশদের মেসে শুতে চলে গেল। চেনি আর গুলচ কে কিভাবে শোবে সে চিন্তা আর করল না।

একটা তক্তাপোশে বিছানা পাতাই ছিল। অন্যটাতে বিছানা নেই, এমনি পাতা রয়েছে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে গুলচ বলল—"তুই ওটাতে শো, আমি এখানে কোনোরকম শোব।"

—"অন্যের বিছানায় শুতে আমার ভালো লাগে না বাপু। তুই-ই এখানে শো— আমি ওটাতে শুই।"

"দরকার নেই— তুই ওখানে শো, এখানে শুধু চাদরটা পেতেছি, শক্ত লাগবে।"

চেনি কিন্তু পেতে রাখা বিছানাটাতে শুতে গেল না।

—"যা করিস কর"—বলে ক্লান্ত গুলচ সেখানে সটান হয়ে শুয়ে পড়ল।

একটানা বৃষ্টি পড়ছিল। বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর-কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। একটু শীত শীত করছিল। কুঁড়েঘরটার বেড়াগুলো ভালো করে মাটি দিয়ে লেপা নেই। তাই বেড়ার ফাঁক দিয়ে কনকনে হাওয়া একটু একটু ভেতরে আসছিল।

পোঁটলা খুলে চেনিমাই একপ্রস্থ রিহা মেখেলা বের করল। গায়ের জামা-কাপড়গুলো শুকোবার জন্য মেলে দিয়েছিল। বৃষ্টির জলে জামা-কাপড়গুলো ভিজে গিয়েছিল। তারপর ও সাথে করে আনা চাদরটা গুলচের তক্তাপোশটার অন্য এক দিকে পেতে বলল— "অন্যের বিছানায় শুতে পারি না বাপু, দেখি একটু ওদিকে সরে যা—"

শুয়ে লণ্ঠনটা নিবিয়ে দিল।

কিছুক্ষণ ওরা নীরবে শুয়ে থেকে ঘুমাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কারো ঘুম এল না।

—"চেনি— !"

—"হুঁ— ?"

কাল আমাদের যেতে হবে— কি প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছে। আমাদের ওদিকে যে কী হচ্ছে জানি না—।

—"তাই তো— নদীতে বান না এলেই রক্ষে—"

সে গুলচের দিকে পাশ ফিরে শুল।

—"তুই আমার জন্য খুব কষ্ট করছিস, না— ?"

গুলচ কিছু বলল না, সে-ও চেনির দিকে মুখ করে পাশ ফিরল।

—"তোর টাকাগুলো সব আমার পেছনে খরচ করছিস। সে কি সত্যিই ভালো হবে ?" চেনির কণ্ঠে শঙ্কা।

—"কি করে বলি ? হতেও পারে," গুলচ বলল।

—"আমার মন কিন্তু বলছে ভালো হবে না। লোকটার কিন্তু বেঁচে উঠবার বড় আকাঙ্ক্ষা ছিল।"

—"সে তো ঠিকই," গুলচ এমনি বলল।

কিছুক্ষণ দুজনে চুপ করে থেকে ঝম ঝম করে পড়া বৃষ্টির দিকে মন দিয়ে শুয়ে রইল। নিচু স্বরে চেনি বলল— "আমরা যে এভাবে আছি চন্দ্র কিছু ভাবছে না তো।"

—"সে কিছু ভাবছে না। মানুষটা একটু আলাদা", গুলচ বলল।

—"সত্যি ?" চেনি বলল। তারপর গুলচের গা ঘেঁষে শুয়ে বলল, "ভাবলে ভাবুক গে।"

তেত্রিশ

বড়োঘাটের কাছে বাস থেকে নেমেই ধনশিরির মূর্তি দেখে গুলচদের বুক কেঁপে উঠল। দুকূল-ছাপানো ফেনিল জল, পাড়-বাঁধ প্রায় ভাঙে ভাঙে। আজ বৃষ্টি একটু কম। এভাবে থাকলে জল আর বাড়বে না। কিন্তু ওপরে পাহাড়গুলোর দিকে যদি বৃষ্টি হয় তা হলে এবার ধনশিরি পাড় ভাঙবেই— কোনো সন্দেহ নেই।

নদী-পথে ভাটির দিকে ডালিমঘাট পর্যন্ত যদি যাওয়া যেত তা হলে ওরা তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌঁছতে পারত। কিন্তু সে

উপায় নেই। ছোটো নৌকোয় যাওয়া বিপদ। বড়ো নৌকো ঘাটে নেই। বসিরতের নৌকোও ফিরে গেছে।

চন্দ্র থাকলে ভেবে-চিন্তে একটা ব্যবস্থা করে দিত। ওর সাহস আছে, বুদ্ধিও আছে। এমনিতে কি আর শহরে গ্রামে মাতব্বরী করে বেড়াতে পারে?

কিন্তু সে তো থেকে গেল শহরে। কার সঙ্গে যেন দেখা করার কথা। ওপারের গ্রামের নতুন স্কুলটার জন্য গ্রাণ্টের খোঁজে কার· সঙ্গে নাকি দেখা করবে। ওর আরো কত কি কাজ রয়েছে! হয়তো পরশু নাগাদ ফিরবে। আমাদের পেছন পেছন লেগে থাকলে কি আর দশজনের কাজ করতে পারবে?

গুলচ আর চেনি দুজনে হাঁটতে লাগল, পথ প্রশস্ত নয়। দূর-ও যথেষ্ট, খরার সময় ছ-সাত মাইল। কিন্তু এখন বর্ষাকালে ঘোরা পথে দশমাইলের কম হবে না। দশমাইল হাঁটা গুলচের পক্ষে নতুন কথা নয়। হয়তো চেনিমাইর একটু কষ্ট হবে, তা ছাড়া পথঘাট সব কাদায় ডুবে গেছে।

ভোরবেলা হাসপাতালে গিয়ে ওরা কলাই-এর সঙ্গে দেখা করে এসেছিল। গুলচ বলেছিল—"ডাক্তার বলেছে তুই ভালো হয়ে যাবি, কোনো চিন্তা করিস না—" তারপর কলাই-এর হাতে পনেরোটা টাকা দিয়ে বলেছিল—"বিপদ-আপদে লাগতে পারে, রেখে দে।"

দুফোঁটা চোখের জলে কলাই ওর অব্যক্ত কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল।

চেনিমাই কলাই-এর কপালটায় হাত দিয়ে দেখে হাত-পা একটু বুলিয়ে দিয়েছিল। শেষে বলেছিল—"এখানে থাকার কোনো সুবিধে নেই। সবাই অপরিচিত। খরচও লাগবে অনেক। তা না হলে আমি থেকে যেতাম—"

দুর্বল ক্ষীণ স্বরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কলাই বলেছিল—"এখানে থাকতে হবে না। খাবি কোথায়? থাকবি কোথায়? গুলচ কাইটির সঙ্গে চলে যা।"

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার বলল—"আমাদের সংসারটায় কিছু নেই। বুড়ো তোকে কোত্থেকে খাওয়াবে পরাবে? তিশর কি করবে জানি না। আমার যদি কিছু হয় তোকে গুলচ কাইটি দেখবে। আমার কাছ থেকে তুই একটুও সুখ পেলি না। গুলচ কাইটি তোকে স্নেহ করবে।"

কথাগুলো বলেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ওর চোখের কোণে জল জমেছিল। গুলচ আর চেনি অল্পক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু ওর চোখে জীবনের কোনো আলো দেখতে পেল না। ওদের মনে হল কলাই যেন ক্রমে কোনো মৃত্যুর দেশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। চেনির চোখদুটোও ছলছল করে উঠেছিল।

হয়তো ওর স্বামী বলে নয়, বেঁচে ওঠার আকাঙ্ক্ষা থাকা এক জোয়ান পুরুষের অসহায় অবস্থা দেখে।

তারপর ওরা হাসপাতাল থেকে চলে এসেছিল।

বড়োঘাট থেকে রওনা হতেই ওদের প্রায় দুপুর হয়ে এল।

যত পারে জোরে জোরে পা ফেলে ওরা হাঁটছিল। তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছতে পারলে হয়। তা না হলে বাড়ি পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে।

কাদায় হাঁটার অভ্যেস দুজনেরই আছে। দুজনেই সুস্থ-সবল, বয়েসও কম— সাতাশ বছরের গুলচ আর একুশ বছরের চেনি। বন-জঙ্গল বিরিণাতলার মধ্য দিয়ে ওরা গট-গট করে এগিয়ে চলল।

দক্ষিণের আকাশে তখন প্রচুর মেঘ জমে রয়েছে। বর্ষার মেঘের কোনো বিশ্বাস নেই। হুড় হুড় করে যদি মাঝপথে বৃষ্টি নামে তা হলে মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকুও পাওয়া যাবে না। ভিজে নেয়ে উঠবে।

জনহীন পথে একা একা একটি পরিচিত যুবতীকে পাশে নিয়ে, দুপুরের নীরবতা ভেঙে নীরবে চলায় আনন্দ আছে। দুজনার অন্তরে অনেক কথা জমে রয়েছে— কিন্তু মুখ ফুটে বলবার কোনো প্রয়োজন নেই। আজ গুলচই চেনির আশ্রয় ও অবলম্বন— সে ওর ওপর নির্ভর করবে— সে চেনিকে সবরকম বিপদ-আপদের হাত থেকে সমস্ত শক্তি দিয়ে রক্ষা করবে।

গুলচ অবশ্য চেনির সঙ্গে ওর যে কি সম্পর্ক বুঝে উঠতে পারে নি। কলাই এখনো বেঁচে, হয়তো বেঁচেও থাকবে। সেক্ষেত্রে ওর তেমন চিন্তার কারণ নেই। কিন্তু কলাই যদি না বাঁচে। ভরণ-পোষণ, খরচ-পত্র সে চেনিকে দিতে পারবে। কিন্তু ওদের সামাজিক সম্পর্কটা কী দাঁড়াবে? কপাহী আছে— একটা সমাজ আছে—

গুলচের চিন্তায় বাধা দিয়ে চেনি জিজ্ঞেস করল—"কী ভেবে ভেবে হাঁটছিস? আমার কথা বেশি ভাবিস না—"

গুলচ বলল—"না ভাবলে কি করে হবে?" চেনি বলল—"ভেবে কি হবে? আমার কপালে যা হবার আছে হবে।" একটু থেমে আবার বলল—"যদি কিছু হয় আমার হবে, তুই ভাবিস না।"

—"কিন্তু তুই কি করে চালাবি?"

—"কপাহী আছে বলে তুই কি আমায় স্নেহ করছিস না? এ ভাবেই করবি, আমার আর কি চাই। তুই যতদিন আমায় ভালোবাসবি আমি কোনো কিছুকে ভয় পাব না।"

চেনি একদিন ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল গুলচের সংসারে গৃহিণী হবার আশায়, জীবনসঙ্গী হওয়ার সংকল্প নিয়ে। সে আশা, সে কল্পনা সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ওদের জীবনের স্রোত অন্য দিকে বয়ে চলেছে। আবার ঘটনাচক্রে চেনি ওর জীবনের কাছাকাছি এসেছে। কিন্তু কাছে এলেও চেনিকে আপন করে নেবার, আপন করে পাওয়ার পথ আজ বন্ধ। আকস্মিকভাবে ওর জীবনে এসে পড়েছে কপাহী। কপাহীর সঙ্গে ওর স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে— সামাজিক স্বীকৃতির দ্বারাই।

তা ছাড়া কলাই এখনো বেঁচে।

চেনি হয়তো সন্তানের স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু পৃথিবী যা খুশি ভাবুক, গুলচ জানে চেনির যদি কখনো সন্তান হয় তা হলে তার বাপ কলাই হবে না, হবে সে নিজে।—অবশ্য যদি কখনো হয়।

কপাহী হয়তো তাকে পিতৃত্বের সম্মান দিতে পারবে না।

কিন্তু অন্তরের গভীরতম স্থানে সে একটা কথা তীব্রভাবে অনুভব করল : চেনি ও কপাহী— এদের দুজনের একজনকেও সে চায় না। ওরা তার জীবনে না থাকলেও কোথাও কোনো অপূর্ণতা থাকবে না— ওদের সাথে সামাজিক বা অন্য যে-কোনো প্রকার সম্পর্ক থাকুক-না কেন।

অনেক ভেবে সে উপলব্ধি করল কপাহী বা চেনি কেউ ওর প্রাণ যা চায়, অন্তর যা চায়, সেই পূর্ণতার অনুভূতি দিতে পারবে না। সে ওদের চায় না, ওরা না থাকলেও ওর চলে যাবে! গুলচ অস্বস্তি অনুভব করল।

কালো মেঘগুলো নিচে নেমে আসছিল। তখন কিছু বেলা থাকলেও, মনে হয়েছিল সন্ধে।

একটা বিড়ি ধরাতে গুলচ একটু দাঁড়াল। একটা বটগাছের শিকড়ে বসে চেনিও তাম্বুলের পুঁটুলিটা খুলল।

ওরা কোনো-এক গ্রামে এসে পৌঁছেছে।

বিড়িটা মুখে দিয়ে গুলচ সামনের দিকে তাকাল। দেখতে পেল— যতদূর দৃষ্টি যায় এক সবুজ প্রশস্ত ধানক্ষেত। পাতাগুলো গাঢ় সবুজ। চারাধানগুলোর গোছ বেরিয়েছে। হাওয়ায় ধান-গাছের কাঁচা পাতাগুলো ঝিরঝির সিরসির করে নাচছে। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু সবুজ ধানক্ষেতের উন্মুক্ত বিস্তৃতি।

মুহূর্তের মধ্যে গুলচের মনের অস্বস্তির ভাব কোথাও হারিয়ে গেল। মনটা ওর এক অভাবনীয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। পৃথিবীর সব-কিছু ভুলে নিষ্পলক দৃষ্টিতে একান্তমনে ধানক্ষেতটার দিকে চেয়ে রইল। চেনিও চাইল।

—"ধানক্ষেতটা দেখেছিস, বড়ো সুন্দর হয়েছে—" স্বপ্নাবিষ্টের মতো গুলচ বলল। ওর চোখ ধানক্ষেতের ওপর।

—"আমাদের দিকেও এবার হয়েছে—" গুলচের দিকে তাকিয়ে চেনি বলল।

মনের আনন্দে গুলচ চারদিকে তাকাল, হঠাৎ কী একটা দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর হন্তদন্ত হয়ে একটা মাঠের দিকে পা বাড়াল।

—"ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস?" চেনি চিৎকার করে উঠল, কিন্তু গুলচের কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

উঠে দাঁড়িয়ে চেনি গুলচ যাওয়ার দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকিয়ে রইল।

একটু পরে নাকে বাঁধা দড়িটা ধরে টেনে টেনে গুলচ একটা মোষ নিয়ে এল।

—"এটা আবার কোথাকার মোষ?" চেনি জিজ্ঞেস করল।

—"জানি না কার মোষ! দড়ি ছিঁড়ে ধানক্ষেতে ঢুকে জানি না কার মাঠের অনেকটা ধান খেয়ে ফেলল। গাছগুলো মোষকে খাওয়ালে ধান হবে কোত্থেকে? চল এবার যাই—"

মোষটা একবার অভিযোগভরা চোখদুটো তুলে গুলচের দিকে তাকাল। তারপর ঘাসে মুখ দিল।

—"শুধু চাষ করলেই কি হয়? মানুষের একটু নজর থাকা দরকার। গোরু-মোষেতে খেয়ে যদি শেষ করে তবে মানুষের জন্য থাকবে কি?" গুলচ বলল।

এর পর বাকি পথটায় গুলচ চেনির সঙ্গে বেশি কথা বলে নি।

বেলা ডোবার সঙ্গে সঙ্গে চেনিকে ওদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গুলচ নিজেদের বাড়ির দিকে জোরে পা ফেলে চলতে লাগল। কলাই-এর বিষয়ে মোলোকাদের কিছু বলার থাকলে চেনি-ই বলবে।

গুলচ সঙ্গে করে নেয়া টাকা থেকে আসা-যাওয়া খরচ, চন্দ্রর হাত দিয়ে ডাক্তার নার্সকে দেয়া খরচ, কলাইর হাতে দিয়ে আসা খরচ আর হোটেলের চা-ভাতের দাম বাদ দিয়ে মোট সাতাশ টাকা ফিরে এসেছে। থলি থেকে টাকাগুলো বের করে নিজের জন্য সে সাত টাকা রাখল। বাকি কুড়ি টাকা চেনির হাতে দিয়ে বলল— "কয়েকটা দিন চালিয়ে নিস। তোদের এদিকে আবার কবে আসব জানি না। দরকার হলে যাস—"

চেনি টাকা ক'টা হাত পেতে নিয়ে অন্ধকারেই ওর মুখের দিকে একবার তাকাল। ও আর দাঁড়াল না।

ঘরে পা দিয়েই দেখল সামনের দিকে তিখরের সাথে বসে কপাহী কথা বলছে। সে একবার দুজনের দিকে তাকাল। তিখর করল— "এলে ?"

ওর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে গুলচ সোজা পেছনে চলে গিয়ে ডাকল— "তরা—"

ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে এসে তরা ওর হাত থেকে পোঁটলাটা নিয়ে পা-হাত ধোয়ার জন্য একঘটি জল এনে দিল।

বাইরে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। লণ্ঠন আর ঘটিটা হাতে করে গুলচ উঠোনে বেরিয়ে এল।

ঘটিটা উঠোনে রেখে লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে সে গোয়ালঘরের কাছে গেল। লণ্ঠনের আলোয় সব ক'টা গোরু-মোষকে এক এক করে দেখে যেতে লাগল।

"গোরু কটা চরিয়েছিলি তরা ? মোষটা বোধহয় পেটভরে খেতে পায় নি। একটু খাস কেটে দিস নি বুঝি ? ধলা বকনাটা —আছে আছে—"

লণ্ঠনটা নিয়ে যাওয়া দেখে মোষটা উঠে দাঁড়াল। গুলচ ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিল। মোষটা কালো চোখ জোড়া মেলে গুলচের দিকে তাকাল, স্নেহভরা চাউনি।

ঘটিটা নিয়ে সে ডানপায়ে সবে জল ঢালছিল, হঠাৎ কী যেন মনে হওয়ায় সে চুপ করে রইল। ঘটিটা সেখানে রেখে উঠে এল। দা-টা নিয়ে সে কয়েকটা বাখারি কেটে একটা মশাল বানাল। সেটা জ্বালিয়ে মাঠের দিকে পা বাড়াল।

—"এখন আবার কোথায় যাচ্ছ ?" তরা জিজ্ঞেস করল।

—"মাঠটা একবার দেখে আসি। নদীতে জল খুব বেড়েছে।

পাড় যদি কোনোভাবে ভাঙে তো সব যাবে”— বলতে বলতে হাতে মশালটা নিয়ে সে মাঠের দিকে চলল।

কপাহী তিখরকে বলল— “ঘরে পা দিয়েই ছুটল সোজা ক্ষেত দেখতে। ধানক্ষেতটা রাতটার মধ্যে আর যাবে কোথায়? ভোরবেলা গিয়ে দেখলে কি আর হতো না? আমরা দুটো প্রাণী এখানে আছি, একটা কথাও জিজ্ঞেস করল না, ছুট দিয়েছে ধানক্ষেতে। মানুষটার কি আর অন্য চিন্তা আছে?”

তরা কিন্তু গুলচের যাওয়ার দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে ওর খাবারের ব্যবস্থা করতে চলে গেল।

চৌত্রিশ

পরদিন।

ঘন কালো মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গেছে। রাতের প্রচণ্ড বৃষ্টির পর শেষরাতের দিকে বৃষ্টি থামল। কিন্তু আবার বৃষ্টি নামার পুরো প্রস্তুতি থেকে গেল আকাশের বুকে। দক্ষিণ দিকে অনবরত মেঘের গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে সমানে। সারাটা পৃথিবী এক অভাবনীয় দুর্যোগের সম্মুখীন। হয়তো আর কিছুক্ষণ বাদে মুষলধারে বৃষ্টি নামবে।

এইভাবে একনাগাড়ে প্রচণ্ড বৃষ্টির পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে।

সাধারণত চাষের মরসুমে গুলচ যে সময়ে ঘুম থেকে ওঠে, সেরকম সময়েই উঠোনে এল। একবার চারদিকে চাইল। আজ আর লাঙল বাওয়ার আশা নেই। নদীর পাড়ের জমিগুলো বৃষ্টির জলে প্যাচপেচে হয়ে গেছে। নদীর জল এখনো ঢোকে নি, কিন্তু বৃষ্টির জল জমে মাঠগুলো সব রুপোর পাতের মতো হয়েছে। মাঠে কোমর-সমান জল।

অসহায়ের মতো গুলচ কিছুক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইল। তারপর কোদালটা হাতে করে নদীর পাড়ের দিকে বেরিয়ে গেল।

কপাহী বা তরা কেউ কোনো কথা বলতে সাহস করল না। গুলচের মুখটাও আকাশটার মতো থমথমে, ঝুলে-পড়া। কাল ঘরে ঢোকার পর থেকে এ পর্যন্ত সে কারোর সঙ্গে কথা বলে নি। কপাহীরা কিছুই বুঝতে পারল না।

মাঠে গিয়ে গুলচ দেখল গ্রামের অন্যান্য সবাই দা-কোদাল নিয়ে নদীর পাড়ে এসেছে। সবাই মিলে আসন্ন বন্যার হাত থেকে চাষের মাঠগুলোকে রক্ষা করার জন্য নদীর পাড়ে মাটি দিয়ে বাঁধ তৈরি করে জলকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করছে। আশেপাশের গাছ-পালা কেটে এনে তার ওপর মাটি ফেলে এখনই যদি একটা বাঁধ খাড়া করা না যায় তা হলে আজ রাতে বন্যার কবল থেকে গ্রামটাকে রক্ষা করার আশা কম।

ওপারের গ্রামের জোয়ান বুড়ো সবাই ব্যগ্র, অধৈর্য হয়ে উঠেছে। কোদাল, দা, খন্তা, হাত— যে যেমনভাবে পারে নদীর পাড়ে মাটি ফেলছে। কোনোরকমে একহাত মতো উঁচু করে মাটির বাঁধটা তৈরি করতে পারলে হয়তো বিপদ কেটে যাবে। ওদিকটায় নদীর পাড় উঁচু— খাড়া পাড়, চট করে ভাঙতে পারবে না। মাঝখানে এই

আধমাইল খানেক জায়গার পাড়টা নিচু। গ্রামে বিপদ ঢোকার পথ এটাই।

প্রাণপণ চেষ্টা করে, কেউ কারো দিকে না চেয়ে, ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত সবাই মিলে নদীর পাড়টা মোটামুটি বেঁধে ফেলল। কাঠ বাঁশের খুঁটি পুঁতে, বিরিণা খাগড়া কেটে তার ওপর মাটি ফেলে দিয়ে একটা বাঁধ খাড়া করল। জোর বৃষ্টি না নামলে বাঁধটা টিকে থাকবে, গ্রামে বানের জল ঢুকতে পারবে না।

অন্যরা চলে যাওয়ার পর গুলচ আরও কিছুক্ষণ থেকে নিজের জমির পাশটায় নদীর পাড়ে আরও কিছু মাটি ফেলল। বান এলে নদীর পাড়ে ওর নতুন জমিটারই ক্ষতি বেশি হবে। অবশেষে খুব খিদে পাওয়ায় মাঠের দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে তাকাতে ও বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

তখন সূর্য ঢলে পড়েছে।

কপাহী ও তরা ব্যগ্র হয়ে ওর অপেক্ষা করছিল। পুকুরে ডুব দিয়ে এসে ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তরা ভাত দিল। সে চিন্তিতভাবে খেয়ে নিল।

ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু বিশ্রাম করার সময় ছিল না। খুঁজে পেতে একটা জামা গায়ে দিয়ে ও ঘরের চালে গুঁজে রাখা পাচনবাড়ি একটা টেনে বের করল।

তাম্বুলটা হাতে নিয়ে কপাহী জিজ্ঞেস করল—"আবার কোথাও যাচ্ছ নাকি?"

গুলচ কিছু বলল না।

—"তিখর কালও এসেছিল, আজও বসে ছিল—"

কপাহীর কথা বন্ধ করে দিয়ে কর্কশ স্বরে গুলচ বলল— "কেন এসেছিস ? কেন সে আমার বাড়ি আসে—"

—"একটা মানুষ এলে এমন কি দোষ হয় ? কলাইকে শহরে রেখে এসেছ, খবরটা জানতেও কি আসতে নেই ?"

—"বাড়িতে ওর বৌদি নেই নাকি, তাকে জিজ্ঞেস করলে খবরটা বুঝি পাওয়া যায় না। এখানে তাম্বুল চিবিয়ে চিবিয়ে বসে থাকলে খবর মিলবে কলাই-এর। হতভাগাগুলোর কি কোনো কাজ আছে ! সারাটা গ্রামের লোক গেছে নদীতে বাঁধ দিতে আর এটা এসেছে এখানে আড্ডা মারতে !"

কপাহীও চটে উঠল। গুলচ কখনো এত শক্ত কথা ওকে বলে নি। সে-ও গজ গজ করে উঠল—"তুমি যেন আর লোকের বাড়ি আড্ডা মেরে বেড়াও না। ভেবেছ আমি কিছু জানি না। দিনটার ভেতর চেনিদের বাড়ি একটা চক্কর না মারলে শান্তি পাও না। ট্যাকের পয়সা খরচা করে কলাইকে গোলায় নিয়ে রেখে আসতে কিসের ঠেকাটা পড়েছিল—"

কর্কশ স্বরে গুলচ চেঁচিয়ে উঠল—"কপাহী, আজ তোর দিন খারাপ, আমার টাকা আমি নষ্ট করি, নদীর জলে ভাসিয়ে দিই, তুই বলবার কে ? চাপনীর মুখে বড়ো বড়ো কথা—"

—"আমি যদি চাপনী, তুই কি চপনীয়া নস্। পরের বউকে শহর-গঞ্জে নিয়ে গিয়ে ঢলাঢলি করে বেড়ানোয় কোনো লজ্জা নেই। এদিকে গাঁয়ের লোক ছি ছি করেছে।"

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে গুলচ রুদ্রমূর্তি ধরল। হাতের পাচন বাড়িটা দিয়ে সপাৎ সপাৎ করে কপাহীর গায়ে কয়েক ঘা বসিয়ে দিল। "—চাপনী, শয়তানী, যা আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা।"

কপাহী নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে কাঁদল না, চেঁচাল না। শক্ত হয়ে বলল—"মার, যত খুশি মার। এখন আমাকে মেরে তো তাড়াবিই। কলাইকে যমের বাড়ি পাঠানোর জন্য তো রেখেই এসেছিস, এবার চেনিকে এনে ঘরে তুলতে পারবি—আমি এক্ষুনি বেরিয়ে যাচ্ছি। আমিই তো তোদের পথের কাঁটা হয়েছি—"

—"যা যা, তোকে কে যেতে বাধা দিয়েছে। যেখানে খুশি চলে যা। আমি যদি তোকে ফিরিয়ে আনতে চাই তো কুত্তা বলিস। পথে বসিরতের নৌকো অপেক্ষা করে আছে— যা, সে বসে আছে তোর জন্য। আমিই যেন কিছু জানি না। নাহরের সঙ্গে বিয়ে বসে বসিরতের সঙ্গে পিরিত-করা মেয়েমানুষ তো তুই-ই।"

তরার উভয় সংকট অবস্থা। সে একবার অসহায়ভাবে গুলচের দিকে, একবার কপাহীর দিকে চেয়ে শুধু বলল—"তোদের আজ হল কি? কুলক্ষণে পেয়েছে মনে হয়— ঝগড়া কেন করছিস?"

ভোঁস ভোঁস করে গুলচ ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। বেঁধে রাখা গোরু-মোষগুলোকে সে চেনিমাইর বাড়ির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেল।

একটুক্ষণ কপাহী দাঁড়িয়ে রইল। নিজেকেই নিজে বলল—"ভেসে বেড়াচ্ছিল। আমি এসে সংসারটা পাতলাম। এখন আমি হলাম চাপনী। থাকব না আর চাপনী হয়ে। বসিরতের সঙ্গেই চলে যাব। যার সাথেই যাই-না কেন চলে যাব কোনোখানে। হাত দুটো রয়েছে—খেটে খাব— তা নাহলে সারাটা পির্থিবি রয়েছে, ভিক্ষে করে খাব—। তোরাই রাজপাট খা—"

ছোটো একটা পোঁটলা বেঁধে বগলে নিয়ে কপাহী ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডালিমের ঘাটের দিকে রওনা হল।

হতবুদ্ধি ও হতবাক্‌ হয়ে তরা কপাহীর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। মাসী চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পর নিজেকে বলল— "জানি না এ-সব কি হল—"

একা একা ঘরে বসে থাকতে তরার ভালো লাগছিল না। সে উঠোনে বেরিয়ে এল। কালো মেঘেতে আকাশ ছেয়ে পড়েছে। একটা থমথমে ভাব। জোর বৃষ্টি নামার আর বেশি বাকি নেই।

সে উঠোনের সামনে গাঁদাফুলের গাছ দুটোর কাছে এসে দাঁড়াল। গাছ দুটো পচে শুকিয়ে গেছে। শুকিয়ে কালো হয়ে আসা গুটিকয়েক ফুল বোঁটায় লেগে রয়েছে।

সে সূর্যমুখী গাছটার দিকে চাইল। ভোরবেলা একটা সূর্যমুখী ফুটেছিল। বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফুলটাও ঘুরে পশ্চিমমুখো হয়েছে। সূর্য মেঘের আড়ালে আছে বলে ফুলটা একটু ম্লান হয়ে পড়েছে। ফুলের পাপড়িগুলো কিন্তু সজীব।

কিছুক্ষণ ফুলটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ও ভেতরে চলে এল। একবার আকাশটার দিকে তাকাল— আকাশে প্রলয়ের পূর্বাভাষ।

গোরু-মোষগুলো নিয়ে গুলচ ওপারের গ্রামের অন্য প্রান্তে পৌঁছল। জরধদের বাড়ির দিকটা বেশ উঁচু, সেখানে কোনোদিন জল ওঠার ভয় নেই। নদীতে বান আসার খুবই সম্ভাবনা। অবশ্য ওদের বাড়ি পর্যন্ত না উঠতেও পারে। কিন্তু বন্যা এলে গোরু-মোষকে ভাসিয়ে নেয়ার ভয়, তা ছাড়া ওরা খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট পাবে। বন্যা যদি না হয় তবে দু-একদিনের মধ্যেই ফিরিয়ে আনবে।

গুলচ হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ চন্দ্রর সঙ্গে দেখা —সেও ব্যস্ত হয়ে আসছিল।

—"কোত্থেকে এলি চন্দ্র?" চন্দ্র দাঁড়াল।

—"এই তো এলাম টাউন থেকে। সেখানে খবর পেলাম ধনশিরিতে ফ্লাড হয়েছে। ওদিকটায় ওপরের দিকে বড়ো বন্যা হয়েছে, আমাদের এখানে না হওয়ার কথা নয়। রিলিফের ব্যবস্থা করতে হয়। তোরা ঠিকমত পৌঁছতে পেরেছিস তো?"

—"হুঁ, কোনো রকমে। আমরা গাঁয়ের সবাই মিলে একটা বাঁধ তৈরি করেছি, এ পর্যন্ত ঠিক আছে। তবে জোর বৃষ্টি নামলে আর রাখা যাবে না।"

—"আকাশটা দেখছিস না, আর বেশি বাকি নেই। তুই এদিকে কেন এসেছিলি?"

—"গোরু-মোষগুলোকে রেখে এলাম, বান এলে কে আর কাকে দেখবে—"

—"আচ্ছা, নো টাইম, কথা বলার সময় নেই। আমি টাউনে এস. ডি. ও-কে বলেছি রিলিফ পাঠাতে। এখানেও একটা রিলিফ কমিটি করতে হবে— অবশ্য যদি বান আসে। তোদের গোলায় ধান আছে তো?"

—"হুঁ, কিছুটা আছে—"

—"মানুষকে বাঁচাস— ধানগুলো রক্ষা করার ব্যবস্থা কর। বিপদ আসছে—ধন-ধান সবাইয়ের প্রয়োজনে লাগবে। আচ্ছা চিন্তা করিস না— আমি চললাম।"

—"এক্ষুনি আমাদের কিছু হচ্ছে না। তবু তুই খবর রাখিস" গুলচ বলল।

—"হ্যাঁ রাখব, রাখব। তোরা ধানটুকু মাচায় তুলে রাখ গে যা। আমি ঘাট থেকে বসিরতের নৌকো নিয়ে আসব—পারিস যদি রিলিফের কাজে বেরস্—"

বলতে বলতে চন্দ্র চলে গেল, ওর দাঁড়াবার সময় নেই, ধনশিরিতে বান এসেছে, আকাশে কালো মেঘ।

বানের জলে ভেসে গেলেও আমি বসিরতের নৌকোয় উঠব না—গুলচ নিজেকে বলল। আজ কপাহীকে সে যেমন ঘৃণা করে, বসিরতকেও তেমনই ঘৃণা করে।

ধীরে ধীরে গুলচ চলে এল।

উঠোনের সামনে এসে একটু দাঁড়াল। হঠাৎ সূর্যমুখীটার দিকে ওর নজর পড়ল। সমাগত অন্ধকারের ম্লানিমা লেগে ফুলটা আরো বিবর্ণ হয়েছে। একটুক্ষণ ফুলটার দিকে চেয়ে থেকে ও আবার নদীর পাড়ের দিকে চলে গেল।

তখন সন্ধে ঘনিয়ে এসেছিল। মেঘে ঢাকা আকাশটা আরো নিচে নেমে এসেছে। কী যেন একটা ভয়ে চারাধানগুলোও ঝিমিয়ে পড়েছে। সে গিয়ে নদীর পাড়ে পৌঁছল। পাগলের মতো নেচে নেচে আসা ধনশিরির উন্মাদ স্রোতের দিকে চেয়ে ওর চোখ দুটো বাষ্পাকুল হয়ে এল। করুণ ভাবে একবার সে তার জমিগুলোর দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ চেয়ে রইল— তারপর ধীরে ধীরে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

—"কপাহী পিসি না? কোথায় যাচ্ছিস?" চন্দ্র জিজ্ঞেস করল।

কপাহী মাথা তুলে তাকাল।

—"এই বিকেল বেলায় এদিকে কোথায় যাচ্ছিস ?"

—"তুই কোত্থেকে এলি ?"

—"টাউন থেকে— কোন্ দিকে যাচ্ছিস ?"

—"আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—"

—"তাড়িয়ে দিয়েছে ! কে তাড়াল রে ?"

—"গুলচ—"

—"ফাজলামো করিস না। প্রচণ্ড বৃষ্টি নামি নামি করছে, এই-সব কী তামসা করছিস ! সত্যি করে বল কি হয়েছে ?"

—"সত্যি কথাই বলছি। গোলাঘাট থেকে ফেরার পথে চেনি বোধহয় চুকলি করেছে। কাল থেকে কোনো কথাবার্তা বলে নি, আজ আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করা মাত্র পাচনবাড়িটা দিয়ে মেরে আমায় তাড়িয়ে দিল—"

—"কি ! গুলচ এত নিচে নেমেছে, চেনি আবার কি চুকলি করল ?"

এদিকে ওদিকে তাকিয়ে কপাহী বলল—"কথাটা বলতে গেলে অন্য কেউ জানত না, চেনি বোধকরি কোনোভাবে জানতে পেরেছে—"

—"কি কথা ?"

—"কি আবার কথা, বসিরতের কথা—"

—"বসিরতের কথা ? বসিরতের আবার কি কথা ?"

—"ওর জন্যই কি নাহর আমায় তাড়ায় নি ?"

—"তাতে কি হয়েছে ?" চন্দ্র একটু অধৈর্য হয়ে পড়েছিল।

—"বসিরতকে আবার আমাদের বাড়ি আসতে দেখেছে কিনা—"

"তাতে কি ?" চন্দ্র কপাহীর দিকে সোজাসুজি তাকাল। ঢোঁক গিলে অসহায়ভাবে কপাহী বলল—"কেউ বোধহয় কিছু বলেছে—"

—"বসিরত ? মানে এই বসিরত ?" চন্দ্র কপাহীর মুখের দিকে তাকাল। কপাহী মাথা হেঁট করল।

হঠাৎ চন্দ্রর চোখের সামনে যেন অনেক কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সে জিজ্ঞেস করল—"না হয় সে এল, কিন্তু তাতে হলটা কি ?"

—"কেউ সে কথা গুলচকে চুকলি করেছে। আগের সব কথা জানতে পেরে সে রাগে ফেটে পড়েছে— চেনিই বোধহয় তাকে বলেছে।"

চন্দ্র একবার আকাশটার দিকে তাকাল। তারপর শান্তভাবে বলল—"আমিও অনেকদিন থেকে তোকে একটা কথা বলব ভাবছিলাম—ডোণ্ট মাইণ্ড্। গুলচ প্রথম তরাকে বিয়ে করার কথাই ভেবেছিল, কিন্তু মাঝখানে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। যদি তুই কিছু মনে না করিস, তবে বসিরতের কাছে চলে যা। সে হয়তো তোর জন্যই বিয়ে-থা করে নি। গুলচরা থাকুক—"

বৃষ্টির বড়ো বড়ো ফোঁটা পড়তে শুরু করল। চন্দ্র ব্যস্ত হয়ে বলল—"আচ্ছা পরে যা করার করিস। এখন চলে আয়। বৃষ্টি নামলই। ঘাটে হয়তো বসিরতের নৌকো আছে, আমরা তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাই।"

যে পথটা ধরে হেঁটে এসেছিল সেটার দিকে একবার সতৃষ্ণনয়নে কপাহী ফিরে তাকাল। তারপর কোনো কথা না বলে তর তর করে চন্দ্রর পেছন পেছন ঘাটের দিকে চলতে শুরু করল।

চন্দ্র বলল—"নো এ্যফ্রেড, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

গুলচ তোকে মারল, আচ্ছা আই শ্যাল সী। তুই মন খারাপ করিস না। এভরিথিং অল রাইট্, সব ঠিক হয়ে যাবে—"

হুড় হুড় করে নামা বৃষ্টির শব্দে চন্দ্র আর যে কি বলল শোনা গেল না। দুজনে এগিয়ে চলল।

পঁয়ত্রিশ

গভীর রাত্রি।

অন্ধকার ভয়াল রাত্রি।

আকাশের বুক ফেটে এসেছে হাওয়ার অবিরাম হো-হো শব্দ, বজ্রপাতের বুক-কাঁপানো গর্জন আর মাঝে মাঝে চোখ ঝলসানো বিদ্যুতের চমকানি।

প্রলয় নেমেছে।

ধনশিরি পাড় ভাঙছে। বন্যার উন্মাদ স্রোত পাড় ভেঙে, বাঁধ ভেঙে সাপের মতো অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। নদীর স্রোতের ভয়াবহ সোঁ-সোঁ শব্দ বিপন্ন ধরিত্রীর কান্নার মতো আর্তনাদের সৃষ্টি করেছে। প্রচণ্ড দুর্বার গতিতে ধনশিরি পাগলিনীর মতো চুল মেলে আপনমনে একদিক থেকে সমস্ত কিছু তছনছ করে ভেঙে নিয়ে আসছে। দূরে বন্যজন্তুরা আর্তস্বরে চেঁচাচ্ছে, শীষ-আসা ধানক্ষেতগুলো হাউ হাউ করে কাঁদছে।

হুড়-হুড়, গড়-গড়, চি-চিঁ—শব্দ—পৃথিবীর ভয়ার্ত নিনাদ।

কারো কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না!

পিদিমটা জ্বালিয়ে রাখার অনেক চেষ্টা করেও তরা পারল না—নিবে যাচ্ছে। আকাশ-পৃথিবীজোড়া অন্ধকারের কালো অজগর সাপটা সব-কিছু গিলে ফেলেছে। নীরন্ধ্র অন্ধকার।

দুপুর রাত্রি।

বাইরে ধনশিরির উন্মাদ বন্যা।

বালিশে মাথা গুঁজে গুলচ শুয়ে ছিল। ওর অন্তরে হাজার দুর্বোধ্য চিন্তা।

ধীরে ধীরে তরা এসে ওর পাশে দাঁড়াল। বুঝতে পেরে গুলচ বিছানাটার এক পাশে সরে গেল।

"এত বৃষ্টি-বাদলের মধ্যে মাসী কোথায় কে জানে—" তরা বলল।

গুলচ চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ বাইরের বন্যা ও বৃষ্টির হো-হো শব্দের দিকে কান পেতে থেকে তরা আবার বলল— "আজ কী হয়েছিল, মাসীকে এত বকাবকি, এত মার-ধর করলে কেন?"

গুলচ তরার একটা হাত হাতড়ে নিয়ে নিজের হাতে রেখে আর্দ্রকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলল— "তুই কিছু জানিস না তরা, সে-সব অনেক পুরানো কথা—"

তরা আদর করে গুলচের গায়ে হাত বুলোতে শুরু করল।

—"কী কথা?"

—"একবার তোকে সফিয়তদের হাবাটার হাতে গছাতে চেয়েছিল, এবার তিখরকে গতানর ফন্দি আঁটছিল। তুই সে বিষয়ে কিছু জানিস না—"

তরা গুলচের আরো কাছে এসে ওর চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল— "তাতে কী হয়েছে? তা বলে কি মার-ধর করতে হয়?"

—"আমারও কষ্ট হচ্ছে। আজ ভীষণ চটে গিয়েছিলাম—কে জানে কেন। তুই রাগ করেছিস? তোকে ভালোবাসলে তোর মাসী আবার চলে আসবে, চিন্তা করিস না।"

তরা বিছানায় উঠে বসল।

সে কিছু বলল না।

দূরে বন্যা পাড় ভাঙছে। পৃথিবীর বুকে আকাশটা ফেটে পড়েছে। মাঝ-রাতের হাওয়াগুলো পাগলা হয়ে আর কোথাও উড়ে চলে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ সেদিকে কান পেতে থেকে গুলচ বলল— "ধনশিরি বাঁধ ভেঙে ঢুকে এসেছে শুনতে পাচ্ছিস?"

—"বানের জলে আমাদের মাঠগুলো ডুবে যাবে—" চিন্তিত ভাবে তরা বলল।

—"নদীতে যখন বান আসে, মানুষের সাধ্য নেই ধরে রাখে।" গুলচ বলল।

ঘরের চালে বৃষ্টির অবিশ্রান্ত ঝম ঝম শব্দ। দূরে বন্যার হো-হো, কোঁ-কোঁ শব্দ—

ধীরে ধীরে গুলচের বুকের কাছে এসে তরা শুয়ে পড়ল।

—"ভয় পাচ্ছিস?" ওকে কাছে টেনে এনে গুলচ জিজ্ঞেস করল।

কিছু না বলে সে গুলচের বুকের ভেতর মাথাটা গুঁজে দিল।

—"তোকে আমার বুকের ভেতর থেকে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না,"—তরাকে বুকে জড়িয়ে ধরে গুলচ বলল।

বন্যা যখন আসে কেউ বাধা দিতে পারে না। তরাকে বুকে নিয়ে গুলচ বলল—

"বান এসেছে, এবারের চাষ নষ্ট হয়ে গেল আর-কি। তোর মাসীও গেল, সব গেল। যাক্, তুই আছিস—"

তরা নিবিড়ভাবে গুলচকে জড়িয়ে ধরল। ওর নিঃশঙ্ক নিশ্বাসে ভিজে রাতটা গরম হয়ে উঠেছিল।

গুলচ শান্তভাবে বলল—"তুই আছিস— তুই-ই আমার সব কিছু—"

এত বড়ো মহাসত্য আমি কখনো কাউকে বলি নি—গুলচ ভাবল।

নতুন আবাদী জমির ওপর বন্যা নেমে এসেছে। ধনশিরির স্রোতের উত্তাল গতি।

নদীর স্রোত থেমে থাকে না— নদী গতিশীল।

রাতে সূর্যমুখী আলোর অন্বেষণ করে। জীবন গতিশীল।

—"তরা!" —তরা উত্তর দেয় না।

তরাকে বুকের ভেতর নিয়ে গুলচ ভাবল: বান এলেও আমাদের ঘরটা ভেসে যাবে না। আমাদের বাড়ির ভিটেটা খুব উঁচু।

ঝর ঝর, ঝম ঝম বৃষ্টির গভীর শব্দ। এই শব্দের ওপারে কোনো পৃথিবী নেই।

আরো গভীর, আরো নিবিড়ভাবে তরা গুলচকে ওর বুকের কাছে টেনে নিয়ে গেল।

—তুই-ই আমার ঘরবাড়ি, আমার শস্যের ক্ষেত, আমার সবকিছু—

পৃথিবীর তপ্ত বুকে সিক্ত আকাশ নেমে এসেছে—ধনশিরির

পাড় ভেঙে যাচ্ছে। নতুন আবাদী জমিতে ভাদ্রমাসের বন্যা নতুন পলি বয়ে এনেছে।

তখন চন্দ্র হয়তো রিলিফের কথা চিন্তা করছিল— কোনোখানে রাত জেগে। হয়তো কেউ কপাহীকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল : বর্ষাকালে বান এসেছে, চলে যাবে, ভয় কিসের……!

স্থানীয় শব্দের তালিকা

ককাইটি — ককাই, বড়োভাই বা দাদার সমার্থক শব্দ। সম্বোধন করার সময় অনেকে 'টি' যোগ করে।

চপনীয়া— কোনো মেয়েলোকের বিয়ে-না-করা স্বামী হিসেবে তারই বাড়িতে বসবাসকারী লোক।

চাপনী— বিয়ে না করেই যে মেয়েলোক স্ত্রীর মতো অন্যের সঙ্গে বাস করে।

ছকঠীয়া— একরকম কাপড়।

তাম্বুল— কাঁচা সুপারী। অসমীয়ারা শুকনো সুপারী খায় না।

খুড়ীয়া— একরকম কানের অলংকার।

দদাইটি— দদাই কাকার সমার্থক শব্দ।

দেওধনি— ভূতে-পাওয়া অথবা ভাবে-পাওয়া লোকের অঙ্গচালনা।

দোন — শস্য মাপার জন্য বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরি পাঁচসেরী পাত্র।

নবৌ— বৌদি।

নামঘর — আসামে বৈষ্ণবপন্থী লোকের উপাসনা-গৃহ।

পাম— বাড়ি থেকে অনেক দূরে নতুন আবাদী ক্ষেত খামার।

পেঁপা— বাঁশের ছোটো নল লাগানো মোষের শিঙের বাঁশি।

পুরা (পুরা)— ওপর আসামে তিন, কামরূপে চার দোন শস্যের মাপ ; চার বিঘে জমি।

বরগীত— মহাপুরুষীয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মমূলক সংগীত, বিশেষত শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমাধবদেব রচিত সংগীত সমূহ।

বরদৈচিলা— চৈত্র সংক্রান্তির (বহাগবিহু) কিছু আগে এবং/অথবা পরে হওয়া প্রচণ্ড ঝড়। কথিত যে বরদৈচিলা দেবী বাপের বাড়িতে বিহু উপলক্ষে আসা ও ফিরে যাওয়ার সময় তার পাখার ঝাপটায় এই ঝড় ওঠে।

বনগীত— আসামের লোকসংগীত বিশেষ।

বরপাই (বরবোপাই) জ্যাঠা।

বাইটি— বাই— দিদি।

বিরিণা— ঘাস জাতীয় গাছ।

বিহু— চৈত্র ও পৌষ সংক্রান্তি। চৈত্র সংক্রান্তি (বহাগ বিহু) ও পৌষ সংক্রান্তি (মাঘ বিহু) আসামের জাতীয় উৎসব। চৈত্র সংক্রান্তি থেকে সাতদিন ধরে এই জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাকে সাত বিহুও বলা হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে ফসলকাটার পর মাঘবিহু অনুষ্ঠিত হয়।